মস্কো থেকে মাদ্রিদ

এই লেখকের

জাতীয়তার বানী মূর্তি হার্ডার (১৯৪৬)

Political and Social Writings of Benoy Sarkar (১৯৪৯)

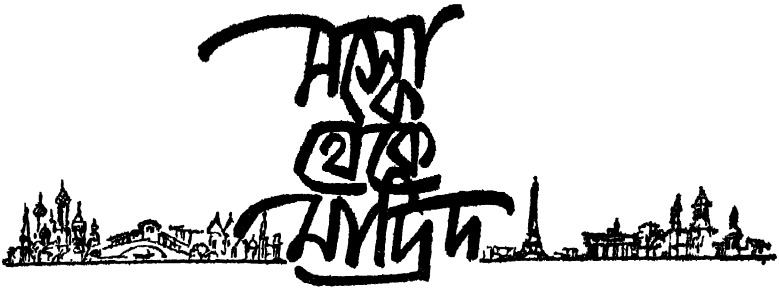
অচেনা দার্শনিক বিনোদ চক্রবর্তী [শ্রীশিশির ভট্টাচার্যের সহযোগে]
(১৯৫১)

নেপোলিয়নের দেশে (১৯৫৮)

রহস্যময়ী প্যারিস (১৯৬৪).

দুই জার্মানী (১৯৬৫)

মস্কো থেকে মাদ্রিদ



ডক্টর দিলীপ মালাকার

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র, ১৩৭২

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
পশুপতি দে
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
রবীন দত্ত

যাঁরা দেশ-বিদেশ দেখতে ভালবাসেন

—তাঁদের জন্য

এটা ঠিক 'জর্নাল' বা ডায়েরী নয়। মস্কো থেকে মাদ্রিদের পথে ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্ত আমাকে নিয়মিত ভাবে ঘুরে বেড়াতে হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে ইউরোপকে দেখেছি। দেখেছি পরিবর্তনশীল ইউরোপ। এই বই-এ তারই প্রতিচ্ছবি দেখাবার চেষ্টা করছি।

মস্কো থেকে মাদ্রিদ বই-এর বিভিন্ন পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। অধিকাংশ 'যুগান্তর' পত্রিকায়।

বিদেশে বসে ছাপার কাজ দেখা সম্ভব হয় নি। হয়তো ছাপার ভুল রয়ে গেছে। এই ত্রুটির জন্য আগে থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখছি। ছাপার ব্যাপারে শ্রীগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম।

দিলীপ মালাকার

ক্রুশ্চেভের পর সোভিয়েত রাশিয়া

প্যারিস থেকে মস্কো পর্যন্ত গেলাম ট্রেনে। প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টার পথ। অনেকগুলো দেশের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। মাঝে মাঝে থেমেছি একদিনের জন্যে। পোল্যাণ্ড থেকে মস্কো যাবার পথে পোল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চল, বেলোরাশিয়া ও রাশিয়ার গ্রামাঞ্চল দেখার সুযোগ হয়েছিল। বেলোরাশিয়ার ব্রেস্ট শহর থেকে মস্কো পর্যন্ত রেলপথে সময় লাগে বিশ ঘণ্টা। সোভিয়েত ইউনিয়নের আয়তন এ থেকে কিছুটা বোঝা যাবে। তবে প্রায় পাঁচ ছয় ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়েছে সোস্যালিষ্ট দেশের বিভিন্ন সীমান্তে পুলিশ ও কাস্টমস-এর হয়রানিতে। এখনও চলে এইসব দেশে দেশে অতি মাত্রায় এবং অনর্থক হয়রানি। এক পশ্চিম বার্লিনের 'জু' রেল স্টেশন থেকে পুর্ব বার্লিনের 'বান হোফ' রেল স্টেশনে পৌঁছতে লেগেছে পুরা এক ঘণ্টা। যার দূরত্ব এক মাইল মাত্র। আবার সেখান থেকে পুর্ব-জার্মানীর সীমানায় ফাঙ্কফুর্ট আম্ ওডার পৌঁছবার আগেই যাত্রীদের মালপত্র ও টাকা পয়সার হিসেব দিতে হয়েছে তিন-চারবার। তারপর পোল্যাণ্ডে পৌঁছে আরেকবার নরক যন্ত্রণা ভোগ। এদের হয়রানিকেও ম্লান করেছে রুশ-পুলিশ ও কাস্টমস। রাত বারটায় ব্রেস্টে ট্রেন পৌঁছলে ঝাড়া দু ঘণ্টা ধরে ট্রেন থামিয়ে প্রতিটি কামরা তন্ন তন্ন করে দেখেছে রুশ-পুলিশ কোনও গুপ্তচর ট্রেনের কামরায় লুকিয়ে আছে কি না।

বেলোরাশিয়া ও রাশিয়ার মধ্য দিয়ে যাবার সময় গ্রামাঞ্চলের হাল দেখে বুলগারিয়ার গ্রামের কথা মনে পড়ল। ইউক্রেনিয়ার ভিন্ন অংশ দেখেছি। সেখানেও একই ধরণের গ্রামের বাড়ি-ঘর। অর্থাৎ কাঠের বাড়ি। উত্তর-ভারতের পাহাড় অঞ্চলের অনেক

বাড়ি-ঘরের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। দালান-কোঠার সংখ্যা কম। অবশ্য শহরের কথা বাদ দিচ্ছি। মিনস্ক ও স্মোলনেস্ক শহর প্রাচীন। তাদের দালান-কোঠায় রুশ-স্থপতিদের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বেলোরাশিয়া ও ইউক্রেন প্রদেশ রাশিয়া থেকে কৃষি উৎপাদনে অনেক গুণ ওপরে। এই প্রদেশের মাঝখান দিয়ে যাবার সময়ে দেখেছি ক্ষেতে প্রচুর ফসল। রাশিয়ার ভিতর দিয়ে যাবার সময়ে সে রকম ফসল চোখে পড়ে নি। কৃষিতে রাশিয়া এদের চেয়ে অনেক দরিদ্র। এর জন্য দায়ী তার আবহাওয়া। তবে কল-কারখানায় চিমনির ধোঁয়া দেখা যাবে। সোভিয়েত-ইউনিয়নের এশীয় প্রদেশ বা স্টেটগুলো আরও সম্পদশালী। সেখানে কৃষিজদ্রব্য যেমন প্রচুর, তেমনি খনিজদ্রব্য। তাই এইসব প্রদেশের লোকেরা রুশদের চেয়ে বেশী এবং ভাল খায়দায়।

ব্রেস্ট থেকে মস্কো পর্যন্ত কোথাও ক্রুশ্চেভের একটি ছবিও দেখলাম না। যে নেতা ছিলেন এত জনপ্রিয়, যাঁর প্রতাপে একদিন সমগ্র সোভিয়েত-ইউনিয়ন চলত, সেই নেতার একটা ছবিও মস্কোতে না দেখতে পেয়ে আমি একটু আশ্চর্য হয়েছিলাম। রুশ-রাজনীতির এটাই বৈশিষ্ট্য। যখন যিনি ক্ষমতায় আসেন তখন তাঁর পুজো চলে। আবার তিনি ক্ষমতাচ্যুত হলেই নরকে যান। তাঁর পাত্তা পাওয়া মুশকিল।

মস্কোর ওয়াকেবহাল মহল আমায় জানান, রুশ-রাজনীতি থেকে ক্রুশ্চেভের অন্তর্ধানের পর পররাষ্ট্রনীতিতে বিশেষ পরিবর্তন হয় নি, তবে আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। একজন সোভিয়েত চিত্র-শিল্পী আমায় জানালেন, ক্রুশ্চেভ চলে যাওয়ায় আর্ট বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে খুব বেশী পরিবর্তন হয় নি। তবে যতবারই "সম্রাট" পরিবর্তন হয়েছে ততবারই ব্যক্তিস্বাধীনতা এসেছে আরও বেশী। সুতরাং ক্রুশ্চেভের পরে আরও ব্যক্তিস্বাধীনতা আসতে বাধ্য।

ক্রুশ্চেভ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অনেক রুশ-সাংবাদিক ও জনসাধারণ আমায় বলেছেন, স্তালিনের পর সোভিয়েত-ইউনিয়নে ক্রুশ্চেভ এনেছিলেন উদারনৈতিক মতবাদ ও নীতি। কিন্তু ক্রুশ্চেভ আস্তে আস্তে সব ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নিচ্ছিলেন। যেমনটি করেছিলেন স্তালিন। একনায়কত্বের প্রতি রুশদের এখন আর তেমন আস্থা নেই। তাই কম্যুনিস্ট দলের নেতৃবৃন্দ তাঁদের দলের ও সরকারের নেতৃত্ব বণ্টন করে দিয়েছে কয়েকজন নেতার হাতে। ফলে কোনও ব্যক্তিবিশেষের একনায়ক হওয়ার সুযোগ থাকবে না। বিলাসদ্রব্যের দাম সাংঘাতিক। প্রায় পঞ্চাশ বছর কম্যুনিস্ট রাজত্ব চলার পর এখন সোভিয়েত রাশিয়ায় স্বর্গরাজ্য হওয়া উচিত ছিল। তার বদলে মস্কোব রাস্তায় জনসাধারণের পোশাক, বাস-ট্রেনের অবস্থা খুব ভাল নয়। এরা যে খায়দায় প্রচুর সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু খাদ্যে বিলাসিতা কম। তাজা ফল মস্কোর বাজারে পাওয়া দুষ্কর। যা পাওয়া যায় সব টিনে।

শিল্প-উৎপাদনে রাশিয়া বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী। এসব পড়ে-শুনে এ-দেশে এলে একটু ঘাবড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। তবে খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, এদের শিল্প-উৎপাদনের অনেকখানি ব্যয় হয় সামরিক খাতে। তার ওপর রয়েছে স্পুটনিক ও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে এদের এখন বিদেশী রাষ্ট্রদের আর্থিক সাহায্য দিতে হচ্ছে।

পূর্ব-জার্মানী, চেকোস্লোভাকিয়া ও হাঙ্গারির জনসাধারণকে আমি রুশদের চেয়ে বেশী পণ্যদব্য বা বিলাসদ্রব্য ভোগ করতে দেখেছি। পূর্ব বার্লিন, প্রাগ বা বুদাপেস্তে এলে বোঝা যাবে মস্কোর সঙ্গে পার্থক্য কোথায়। প্যারিস-লণ্ডনের জৌলুস নেই এই সব শহরে। কিন্তু এই তিনটি শহরে পাওয়া যাবে প্যারিস বা লণ্ডনের ছোঁয়াচ যা মোটেই নেই মস্কো শহরে। পূর্ব-বার্লিন, প্রাগ বা

বুদাপেস্তে যত কাফে রেস্তোরাঁ, নাচের ঘর, ক্যাবারে দেখা যাবে তার এক-চতুর্থাংশ দেখা যাবে না মস্কোয়। মস্কো শহরে এককাপ চা বা এককাপ কফি পেতে হলে মাইল-খানেক হাঁটতে হবে। পূর্ব-জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গারির নেই রাশিয়ার মতন সামরিক ব্যয়। তাই তারা সে অর্থ বাঁচিয়ে ভোগ্য বা বিলাসদ্রব্যের ওপর ব্যয় করতে সক্ষম। রাশিয়ায় জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে না, বরং কমতির দিকে। সৌখিন জিনিস-পত্রের দামও কমছে। অনেক বছর ধরে মস্কোয় যেসব বিদেশী বাস করছেন, তাঁদের অনেকেই আমায় বলেছেন যে, গত দু' বছর যাবৎ এখানে জিনিস-পত্রের দাম কমের দিকে। আগের মতন তেমন কড়া-কড়ি আর নেই। তার মানে এই নয় যে, শাসকরা সব বৈষ্ণব বনে গেছেন। সমস্ত সোভিয়েত-'ইউনিয়নে খাদ্য-দ্রব্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, বই-পত্র, সিনেমা-থিয়েটার ও গ্রামোফোন রেকর্ডের দাম এত সস্তা যে আমাদের দেশে বা পশ্চিম ইউরোপে যা কল্পনা করা যায় না; বাসস্থানের স্বল্পতা এখনও আছে। প্রতিদিন এরা বড় বড় ফ্ল্যাট-বাড়ি নির্মাণ করে চলেছে। আড়াই-খানা ঘরের ফ্ল্যাট-বাড়ির মাসিক ভাড়া কলকাতার তুলনায় অর্ধেকেরও কম। পশ্চিম ইউরোপে এটা অকল্পনীয়।

বিগত কয়েক বছর ধরে সোভিয়েত-সরকার 'ভড্‌কা' পান বিরোধী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে রেস্তোরাঁ-কাফেতে ভড্‌কার দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে চতুর্গুণ। বাইরের দোকানেও দাম বেশী। তা সত্ত্বেও আমি দিনে-দুপুরে বেলা এগারটার সময়ে রেড স্কোয়ারে লেনিনের সমাধির সামনেই এক যুবককে দেখেছি 'ভড্‌কা' খেয়ে পড়ে থাকতে। রাত দশটার পর এবং এগারটা-বারটার মধ্যে আমি গোর্কি স্ট্রীটে দেখেছি টলটলায়মান বহু মস্কোবাসীকে চলাফেরা করতে।

কম্যুনিস্ট সরকারের এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও আমি মস্কো ফিল্ম-

ফেস্টিভ্যালে নতুন ছবি দেখার জন্যে দর্শকদের কালোবাজারে টিকিট কিনতে দেখেছি। সবচেয়ে আশ্চর্য করেছে ট্যাক্সি ড্রাইভাররা। মনে হবে যেন আমি হাওড়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি। বেলোরাশিয়া স্টেশনের সামনে ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছি। আমার গন্তব্যস্থান দূরে নয় বলে ট্যাক্সি ড্রাইভার আমায় সামনের সিটে বসিয়ে অন্য খদ্দের খুঁজছিল। এদিকে মিটার উঠে চলেছে। ট্যাক্সির জন্যে বিশেষ পুলিশ বা কন্ট্রোলার আছে। তারা এসে দেখে আমি বসে সামনে আর ড্রাইভার দাঁড়িয়ে। অমনি হুমকি দেয় কন্ট্রোলার। স্টেশন থেকে কাছেই গিয়েছিলাম। মিটারে বেশী ওঠে নি। কিন্তু ড্রাইভার আমার কাছ থেকে বেশী নিয়ে নেয়। বিদেশীর প্রতি ব্যবহার সর্বত্র একই রকমের। সাম্যবাদী বা পুঁজি-পতি দেশে কোন ফারাক নেই। মস্কোয় ট্যাক্সি ব্যবসায়ে গোলমাল হয় বলেই বড় বড় রাস্তার মোড়ে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে প্রায়ই দেখা যায় পুলিশ বা কনট্রোলার।

কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের পীঠস্থান মস্কো শহরে এখন কড়াকড়ি কমেছে। তার নিদর্শন দেখলাম কয়েকটি বড় রাস্তার ধারে। সাধারণ দোকানপাট ছাড়াও ফুটপাতের ধারে আজকাল শাক-সব্জী, ডিম, ফলমূল বিক্রী হচ্ছে। শনিবার ও রবিবারে গ্রাম থেকে অনেকে আসে মস্কোর রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফলমূল বেচতে। ফলমূলের মতোই চাহিদা আছে রাস্তার ধারে নতুন বই ও সাময়িক পত্রিকার। নতুন বই প্রকাশ হবার পরেই আমি রাস্তার ধারে ন্যায্য মূল্যে বিক্রি হতে দেখেছি। এবং দেখেছি এক ঘণ্টার মধ্যে সব বিক্রি হয়েছে। নতুন সাময়িক পত্রিকা নতুন বই ও নতুন গানের রেকর্ড কোন দোকানে অবিক্রীত হয়ে পড়ে থাকে না। সোভিয়েত জনসাধারণ এদিক দিয়ে অনেকখানি এগিয়ে আছে। বাসে-ট্রামে ও মেট্রোতে আমি প্রচুর সংখ্যক যাত্রীদের দেখেছি মনোযোগ সহকারে বই পড়তে।

মস্কোর কাছেই ত্রিশ কিলোমিটার দূরে এক যৌথখামার দেখতে

গিয়েছিলাম। এটি শোভখোজ বা স্টেট ফার্ম। এই যৌথখামারের মালিক সরকার। অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের মতোই সুযোগ-সুবিধে পেয়ে থাকে এখানকার শোভখোজের কর্মচারীরা। এই যৌথখামার ৩১৫ একর জমিতে চাষ করে। তাদের পঁচিশটি ট্রাকটর রয়েছে। শ্রমিকদের জন্যে রয়েছে পাকা দালানবাড়ি। শিশুদের জন্যে বিশেষ বাসস্থান। কারণ, মায়েরা এখানে তাদের শিশু-সন্তানদের রেখে কাজে যায়। লাইব্রেরী সিনেমা থিয়েটার তো রয়েছেই। আর রয়েছে পুকুর। সেখানে দেখলাম বালখিল্যের দল জলে ও ওপরে সারাদিন দৌড়ঝাঁপ দিচ্ছে।

এই যৌথখামারে গম বা ধানের চাষ হয় না। রাশিয়ার আবহাওয়া এমনই যে, গ্রীষ্মকালেও কাঁচের ঢাকনি দেওয়া জমিতে শাকসব্জীর চাষ হয়। খোলা জমির কথা ভাবাই যায় না। হাজার হাজার শূকর রয়েছে এখানে। শাকসব্জী ও শূকরের মাংস এখান থেকে চালান দেওয়া হয় মস্কো শহরে। এই যৌথখামারের শ্রমিকদের মাসিক রোজগার ১৫০ রুবল বা সাতশত টাকা। এর থেকে এরা খানিকটা দেয় সমাজ বীমায়।

মস্কোর কাছেই অসংখ্য কলকারখানা। 'মস্কোভিচ' নামে ছোট মোটরগাড়ির কারখানা এখানেই। এখানকার কারখানা দেখে মনে হল যেন কলকাতার আশেপাশে কলকারখানার কাছ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বৃটিশ বা জার্মান কারখানার মতন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সবচেয়ে বেশী যা চোখে পড়বে তা হল শিশুর দল। সোভিয়েত ইউনিয়নে শিশুর চেহারা সত্যিই দেখার মতো। সবাই স্বাস্থ্যবান। দেখতে হোঁৎকা। সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য ও চিকিৎসা ওরা লাভ করে থাকে। শিশুদের স্বাস্থ্য ও মনোরঞ্জনের জন্য সব রকমের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করে রেখেছে সোভিয়েত সরকার.

রুশ-পররাষ্ট্রনীতিতে এসেছে সামান্য পরিবর্তন। পূর্ব জার্মানীর

প্রতি এদের পররাষ্ট্রনীতির বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। পশ্চিম জার্মানীর প্রতি রুশদের এখন দৃষ্টি অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছে। তাদের প্রতি রুশরা এখন নরম। তাকে রাশিয়া এখন হাতে রাখতে চায়।

ভারত, পাকিস্তান

ভারতের প্রতি রুশ-পররাষ্ট্রনীতি এখন দুমুখো। একদিকে রুশসরকার ভারতের প্রতি যেমন মিত্রভাবাপন্ন তেমনি পাকিস্তানের প্রতিও। ক্রুশ্চেভের আমলে এটা ছিল না। তবে ভারতের মনোভাব রুশ জনসাধারণের প্রতি একরকমই আছে। অর্থাৎ মিত্রভাবাপন্ন। চীনের সঙ্গে সোভিয়েত-ইউনিয়নের সম্পর্ক দিন দিন শিথিল হচ্ছে। মস্কো হতে চীনের ছাত্ররা চলে যাচ্ছে। চীনাদের প্রতি রুশদের মনোভাব ভাল নয়। সেদিক দিয়ে বিচার করলে পশ্চিম ইউরোপীয়দের প্রতি রুশ-মনোভাব অনেক ভাল। একালের রুশরা খুব বেশি করে ঝুঁকেছে ফ্রান্স ও ইতালির দিকে। দ্যগল-সরকারের সঙ্গে এখন রুশ-সরকারের গলায় গলায় ভাব। ১৪ জুলাই ছিল ফরাসীদের জাতীয় উৎসব যার নাম ফরাসী বিপ্লবদিবস। এই দিন আমি মস্কো রেডিওতে সমস্ত দিন ফরাসী সঙ্গীত শুনতে পেলাম।

মস্কো বনাম লেনিনগ্রাদ

মস্কো গেলেই আমার নয়াদিল্লীর কথা মনে পড়ে। শহর হিসেবে মস্কো বিরাট। স্থাপত্য ও সৌন্দর্যের দিক দিয়ে মস্কো স্থূল। এখানে সূক্ষ্ম কারুকার্যের সন্ধান মেলা ভার। লেনিনগ্রাদ সেদিক দিয়ে মস্কোর তুলনায় স্বর্গ। ল্যাটভিয়া ও এস্তোনিয়ার রাজধানী রিগা ও তালিন, ইউক্রেনিয়ার কিয়েভ শহর মস্কোর তুলনায় বহু পরিমাণে সুন্দর। জীবনধারাও ভিন্ন রকমের। লেনিনগ্রাদ বা সেকালের সেণ্ট পিটাসবুর্গ হল রাশিয়ার ভেনিস। অর্থাৎ ভাসমান শহর। ভেনিসের মত সূক্ষ্ম কারুকার্য বা স্থাপত্য-সৌন্দর্য লেনিনগ্রাদে নেই। তবে তার প্রচেষ্টা করেছে রুশ-স্থপতি ও আগের আমলের রাজা মহারাজার দল। গত আড়াই শ' বছরে রুশ মহারাজের দল লেনিনগ্রাদকে সবদিক দিয়ে সাজাবার চেষ্টা করেছিল। তারই নিদর্শন মিলবে একালের লেনিনগ্রাদে। লেনিনগ্রাদে রয়েছে অসংখ্য প্রাসাদ, প্রায় তিন শ'-ছোট বড় সাঁকো ও খাল। লেনিনগ্রাদ সমুদ্রের কাছেই, তার মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে নেভা নদী। গ্রীষ্মকালে লেনিনগ্রাদে রাত্রি নেই বললেই চলে। রাত সাড়ে বারোটা-একটায় দেখেছি সন্ধ্যার আলো। গ্রীষ্মকালে লেনিনগ্রাদের আবহাওয়া কবিত্বময় বলেই ওখানে আগে রুশ সাহিত্যিকদের আড্ডা বসত। শিল্পীদের আড্ডা এখনও চলছে। অবশ্য লেনিনগ্রাদের অধিবাসীরা তাদের শহরের গর্বে গর্বিত।

মস্কোবাসীরা যতই আস্ফালন করুক না কেন লেনিনগ্রাদবাসীর সামনে তারা চুপ করে যায়। অনেক রুশবন্ধু আমাকে বলেছেন, মেধাবী ছাত্র, শিল্পী-সাহিত্যিকের অধিকাংশ আসে লেনিনগ্রাদ থেকে। মস্কোর সঙ্গে আর লণ্ডন প্যারিসের তুলনা করা চলে না; কিন্তু লেনিনগ্রাদের সঙ্গে চলে। লেনিনগ্রাদের সামনে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে 'পিটারহফ' প্রাসাদে গিয়েছিলাম। এটি ফোয়ারার প্রাসাদ।

রোমের টিভলি প্রাসাদের নকল। পিটার্সহফ এককালে ছিল জারদের গ্রীষ্মকালীন আবাস। লেনিনগ্রাদের অনেকগুলো মিউজিয়ামের মধ্যে হারমিটেজ মিউজিয়াম যা এককালে ছিল প্রাসাদ, পৃথিবীর যে কোন বৃহৎ মিউজিয়ামের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। এর সংগ্রহশালায় রয়েছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের অমর অবদান। মস্কো শহরের স্থাপত্য তিনভাগে ভাগ করা উচিত। রুশ-বিপ্লবের আগের যুগের মস্কো শহরের স্থাপত্য। সেকালের পুরনো বাড়ি এখনও দেখা যায়। লেনিন-স্তালিন আমলের স্থাপত্য আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বাড়িঘরের স্থাপত্য এক নয়। মস্কো শহরের নির্মাণকাজ ও পরিধি বেড়েই চলেছে। মস্কোয় ট্রাম-বাস ও মেট্রোর টিকিট কেনার হাঙ্গামা নেই। বাক্সে নির্ধারিত পয়সা ফেলতে হয়। তাই টিকিট বিক্রেতা ও পারিদর্শকের বালাই নেই। যাত্রীরা সব সময়ে সজাগ. কেউ পয়সা না দিলে যাত্রীরা তাকে তিরস্কার করে পয়সা আদায় করে দেয়

মস্কো বিরাট শহর। কিন্তু শহরের লোকসংখ্যার তুলনায় কাফে রেস্তোরাঁ তেমন নেই বলে রাত্রিবেলা দেখেছি দলে দলে নরনারী বেড়াতে বেরিয়েছে। মস্কো শহরের এটাই বড় দুর্বলতা। একথা স্বীকার মস্কোবাসীরা করেছে। মস্কোয় অসংখ্য গীর্জা আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ তালা বন্ধ। সোকোলনিকি পার্কের কাছে একটি পুরনো গীর্জার সামনে দেখলাম প্রচুর বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দল মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করছে। একজন পুরোহিত মন্ত্র পড়ছে। এই গীর্জায় আমি একজন তরুণ-তরুণীও দেখলাম না। আজকাল রুশ-সরকার উদার মতবাদ গ্রহণ করায় উৎসব-পার্বণে গীর্জায় গীর্জায় চলে উপাসনা। তবে অধিকাংশই বৃদ্ধার দল। গীর্জা দেখাশোনা করে সরকারী কর্মচারী। পুরনো অর্থডক্স গীর্জার ভেতরে ভাস্কর্য ও চিত্রপটগুলো মনোমুগ্ধকর। সত্যিই দেখার মতো।

রুশদের সঙ্গে অন্য প্রদেশের লোকদের ভাল বনিবনা নেই।

তার দৃষ্টান্ত দিতে গেলে পৃষ্ঠা ভরে যাবে। দু-একটি দিচ্ছি: একদিন ট্যাক্সি চেপে ট্যাক্সি চালককে আমাদের গন্তব্যস্থানের ঠিকানা দেখিয়েছি। ঠিকানা দেখামাত্র ট্যাক্সিচালক আমাদের বলে, তোরা কি ভারতবাসী? আমরা বললাম, হ্যাঁ। সাম্যবাদের ঠ্যালায় রুশ-ভাষায় এখন আর 'আপনি' 'তুমি' ব্যবহার বেশী হয় না। সবাই সবাইকে 'তুই' বলে সম্বোধন করে। ট্যাক্সিচালক আমাদের জানায় সে জর্জিয়ান। সে যে রুশ নয় একথাটা আমাদের বার বার বলে দিল। আরও জানায় জর্জিয়ানারা ভারতবাসীর বন্ধু। স্তালিনের ছবি সোভিয়েত ইউনিয়নের সব জায়গা থেকেই সরানো হয়েছে, কিন্তু জর্জিয়া থেকে সরাতে সাহস পায় নি সরকার। ইউক্রেনিয়ার এক বন্ধু আমায় বলে যে, ভাল খেতে পরতে হলে ইউক্রেনিয়ায় যাওয়া উচিত। রাশিয়ানরা খেতে-পরতে জানে না। এ ছাড়া আমি দেখেছি যে, উজবেকিস্তান, দাখিস্থান বা আর্মেনিয়ানদের মধ্যে রুশ-বিদ্বেষ। খোলাখুলিভাবে না থাকলেও সেটা বোঝা যায়। মস্কোর এক ছোট পার্কের খোলা কাফেতে বসে একদিন কফি পান করছি, এমন সময় দেখি দুই জিপসী মহিলা এসে আমায় বললে, তুই তো সাদা চামড়ার রুশ বা ইউরোপীয় নস। তোর হাত দেখে সব বলে দেব। তুই তো আমাদের জাতের অর্থাৎ জিপসী। এই সময় একজন রুশ-কর্মচারি এসে ওদের ভাগিযে দেয়। রাশিয়াষ জিপসীদের আয়ত্তে আনতে রুশ-সরকার হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। তবে মস্কোয় রয়েছে বিশ্বের একমাত্র জিপসী থিয়েটার। ওখানে হয় জিপসী নাচ, গান ও নাটক চর্চা হয়।

৫০তম সোভিয়েত বিপ্লব বার্ষিকীর বছরে যা দেখেছি

রুশ-বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সোস্যালিস্ট সরকার ও সমাজের অর্ধ শতাব্দী পূর্ণ হল। সোভিয়েত ইউনিয়ন লুক্সেমবুর্গ বা নেপালের মতন ক্ষুদ্র রাষ্ট্র নয়। আয়তনে ভারতের চার-পাঁচ গুণ বড়। এ যাত্রায় তার সামান্য অঞ্চল ঘুরে দেখার সৌভাগ্য হয়। আমি বরাবর ট্রেনযাত্রী। পোল্যাণ্ড ও বেলোরাশিয়ার সীমান্ত 'ব্রেস্ট' রেল স্টেশন থেকে আরম্ভ করে মস্কো পর্যন্ত জনপদগুলো কিছু কিছু দেখেছি। আর দেখেছি মস্কো থেকে লেনিনগ্রাদ যাওয়ার পথে। ব্রেস্টএ ট্রেন আসে আড়াই ঘণ্টা করে। দুই খেপে যে সময় পেয়েছি তার মধ্যে স্টেশনের আশেপাশে চোখ মেলে দেখেছি। আর একবার নেমেছিলাম স্মোলনেস্কএ। এই জনপদ নগর-নগরীর চারধারে পোস্টার, দেয়ালের গায়ে লেখা দেখেছি রুশ-বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর পূর্তির জয়গান। সোস্যালিজমের অর্ধ শতাব্দী। নভেম্বরে উৎসব। তারই প্রস্তুতি চলেছে সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়ন জুড়ে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে অনেক বিদেশী আজকাল দশ বিশ বছর ধরে বাস করছেন। সোস্যালিজম কতদূর এগুলো তার খতিয়ান করতে ব্যস্ত অনেকেই। সব'র মুখে একই প্রশ্ন, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রবাদ কতদূর এগিয়েছে। কম্যুনিজম আরও কতদূর?

সোভিয়েত ইউনিয়নে গত পঞ্চাশ বছরে সোস্যালিস্ট রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির কয়েকবার অদলবদল হয়েছে। পররাষ্ট্রনীতির অদল-বদল গত পঁচিশ বছরে অনেকবার হয়েছে। ভবিষ্যতে হয়ত আরও হবে। স্তালিনবাদের সমাপ্তি হয়েছে স্তালিনের মৃত্যুতে। ক্রুশ্চেভের শান্তিপূর্ণ অবস্থান নীতিও অবসান হয় নি ক্রুশ্চেভের বিদায়ে। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতির সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ভারতের

দৃষ্টান্ত দেখান যায়। স্তালিন-দুহিতা স্বেৎলানার ব্যাপারে সোভিয়েত ভারত সম্পর্ক কিছুটা জখম হয়েছে। রুশ রাষ্ট্রদুত মিঃ বেনেডিক্টভ বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। সবচেয়ে বড় ঘটনা হল স্বেৎলানা ঘটনার জন্যে সোভিয়েত সরকারের গুপ্তচরবিভাগের বড়কর্তাদের বড় রকমের অদল-বদল হয়েছে।

তার চেযেও বড় হল ইস্রায়েল আরব-যুদ্ধের পর সোভিয়েত নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন। রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল ব্রেজনেভ, কোসিগিন, পদগোর্নি ও শেলেপিনের মধ্যে। আরব ইস্রায়েল যুদ্ধে আরবদের পরাজয় হয়েছে। রুশরা যুদ্ধে না নামায় আরবরা অসন্তুষ্ট হয়। বাইরেব লোকেরা এর জন্যে কোসিগিনকে হয়ত দোষারোপ করবে, কিন্তু আসলে লড়াইয়ের সব দায়িত্ব নেয় উপরোক্ত নেতারা। রাষ্ট্রপতি পদগোর্নি ভূমিকার অন্তরালে ছিলেন। তিনি নিজের প্রচেষ্টায় চলে যান কাইরোতে নাসেরকে ভরসা দিতে। কোসিগিন যান নিউইয়র্কে। কোসিগিনের ক্ষমতা কমছে। ব্রেজনেভ ক্ষমতা বেশী লাভ করেছেন। ইনি পার্টির প্রধান সম্পাদক। রাষ্ট্রপতি পদগোর্নিও ক্ষমতার অংশ নিজের হাতে নিতে চান। তরুণ নেতাদের মুখপাত্র শেলেপিনেব ক্ষমতাও কিছুটা কমেছে। তবে সোভিয়েত রাজনীতির অভ্যন্তরে মাঝে মাঝেই অদল-বদল হয়।

সোভিয়েত রাজনীতির চেয়েও বড রকমের পরিবর্তন আসছে অর্থনীতিতে। ইতিমধ্যে সমাজজীবনে বহু পরিবর্তন এসেছে। সমাজতন্ত্রবাদের মূলমন্ত্র সর্বত্রই ঘটেছে। সবার সমান অধিকার। শিক্ষা, খাদ্য, চিকিৎসা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক জীবনে সবার জন্যে এক ব্যবস্থা। সেখানে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু পণ্যদ্রব্যের গুণাগুণ বিচার করলেই মহা ফ্যাসাদ। কোয়ানটিটি ও কোয়ালিটির ব্যাপারেই যত গণ্ডগোল। তাই সোভিয়েত সরকার নতুন অর্থনীতির দিকে ঝুঁকছে। অধ্যাপক লিবারম্যানের লাভ-লোকসান নীতি সমানভাবে চালু করা হয়েছে। যদিও সবই সরকারের মালিকানা, তা

সত্ত্বেও বিভিন্ন কলকারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে 'স্বায়ত্ত শাসন' গোছের ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। এবং নিজেরা লাভ-লোকসান বুঝবে।

সোভিয়েত সরকার ও জনগণ লড়াই চায় না দুটো কারণে। বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ করার মতন পর্যাপ্ত সামরিক রসদ এদের সংগ্রহে আছে। সেদিক দিয়ে এরা প্রস্তুত। পরের ওপর নির্ভর করতে হয় না এদের। লড়াই করে উৎপাদন কমিয়ে লাভ নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের করাল ছায়া এখনও সবটা মিলিয়ে যায় নি। গৃহ-সমস্যা এখনও প্রকট। মস্কো নগরীর লোকসংখ্যা অনুপাতে বাড়িঘর তেমন নির্মিত হয় নি।

সেদিকে বর্তমান সরকার বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। নতুন নতুন দেশলাই বাক্সের প্যাটার্নে বাড়ি নির্মিত হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে কাঠের বাড়ি, টিনের চাল দেওয়া একতলা গৃহের দৃশ্য সর্বত্রই দেখা যাবে। গ্রামবাসীরা সন্তুষ্ট নয়। সেদিকে খুব বেশী পরিবর্তন হয় নি। গ্রামের সমস্যা সমাধিত হয় নি বলেই ক্রুশ্চেভকে বিদায় নিতে হয়েছে। তাই বর্তমান নেতারা যেনতেনপ্রকারেণ ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ফাঁপিয়ে তুলতে চান। তাঁরা চান অধিক উৎপাদন ও বিদেশের বাজারে বেচে আরও বিদেশী মুদ্রার্জন। বিশেষ করে তাঁরা চান ডলার। বিদেশী টুরিস্টদের প্রলুব্ধ করা হচ্ছে এই একই কারণে। তাঁদের এক কথা ব্যবসা কর। তাহলে অর্থনৈতিক উন্নতি হবে আরও দ্রুতগতিতে।

অনুন্নত রাষ্ট্রের প্রতি এঁরা সাহায্য কমিয়ে দিয়ে আরও ব্যবসা চালাতে চান। ভারতও তার বাইরে নয়। কিছু দিন আগে ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায় যে, পূর্ব ইউরোপের সোস্যালিস্ট দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য কমাতে বাধ্য এই কারণে যে, তারা ভারত থেকে কাঁচামাল কিনে পশ্চিমী দেশে বেচে ডলার অর্জন করেছে। ভারত-সরকার সরাসরি পশ্চিমী দেশে ওই সব কাঁচামাল বেচে ডলার অর্জন করতে চান।

সোভিয়েত-সরকারের পশ্চিমী অর্থ ও ডলার অর্জনের অনেক

উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মস্কোর প্রতিটি বড় বড় হোটেলে এবং 'বিরিওজকা শপ' নামে বিদেশীদের জন্যে বহু দোকান খোলা হয়েছে। ক্যামেরা, ঘড়ি, মাদকদ্রব্য, কাভিয়ার ও অনেক জিনিস জলের দরে বেচা হয়। অবশ্য ডলার বা পশ্চিমী টাকার বিনিময়ে। সোস্যালিস্ট রাষ্ট্রগুলো কিন্তু নিজেদের মধ্যে যখন ব্যবসা করে তখন সোস্যালিজমের দোহাই দিয়ে ঠকান বন্ধ করে না। বরং সোস্যালিজমের নামে ঠকবাজী করে থাকে।

গত বছর ইতালির সঙ্গে সোভিয়েত-সরকারের চুক্তি হয় যে, ইতালির ফিয়াট কোম্পানী মস্কোর কাছে একটি কারখানা নির্মাণ করবে। তারা ফিয়াটের ছোট গাড়ি সস্তা দরে বেচবে। ফ্রান্সের রেনো কোম্পানীর সঙ্গেও অনুরূপ চুক্তি হয়। তবে ফরাসী গাড়ি পরে নির্মিত হবে। এদিকে সোভিয়েত-সরকার তাদের 'পোবেদা' গাড়ির পুরনো কারখানা বেচেছে বুলগারিয়াকে। ইতালির ফিয়াট কোম্পানীর নতুন গাড়ি নির্মিত হবে মস্কোয় আর বুলগারিয়ায় নির্মিত হবে পোবেদার পুরোনো গাড়ি। বুলগারিয়ার সরকার এই ব্যাপারে বেশ খাপ্পা হয়ে আছে। তারা জানিয়েছে যে, আগে জানলে তারাও ফিয়াট, রেনো বা জার্মানীর ফোকসভাগন গাড়ির কারখানা কিনতে পারত। রুশদের কারখানা কিনে তারা ঠকেছে। এই ধরনের প্রচুর ব্যবসা-বাণিজ্য চলেছে সোস্যালিস্ট রাষ্ট্রের মধ্যে। সোভিয়েত-সরকারের নতুন ধুয়ো আরও ব্যবসা-বাণিজ্য করো। বিদেশীর কাছে সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন আর লৌহ-যবনিকার অন্তরালে নয়। বাণিজ্যের খাতিরে সেখানে অনেক পরিবর্তন এসেছে।

মস্কো বা অন্যান্য শহরে একটি জিনিসের আমি কোনো পরিবর্তন দেখি নি। আমি কেন যাঁরা দশ-বিশ বছর ধরে মস্কোয় বাস করছেন তাঁদেরও ওই এক অভিযোগ। দু বছর আগেও আমি দেখেছি কাফে-রেস্তোরাঁর সামনে অপেক্ষমান জনতার লাইন।

রুটির দোকানে লাইন। সব দোকানেই লাইন। সকাল সাতটায় খবরের কাগজের দোকানের সামনে বিরাট লাইন। কোনো ভাল বই বা কোনো ভাল জিনিস দোকানে দেখা দিলেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ হয়ে যায়। সোভিয়েত জনগণের যে পরিমাণ পয়সা আছে সে পরিমাণে বা পর্যাপ্ত পরিমাণে দোকানে জিনিস নেই। এখানে এটা বড় সমস্যা। সোস্যালিজমের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ায় সালতামামি করার সময়ে এসেছে। তাই বিদেশীদের প্রশ্ন, এখনও কেন রেস্তোর*ায় দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডে কেন ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হয়। সব কিছুতে ঢিলেমি কেন? একি সোস্যালিজমের দোষ? না সোভিয়েত-সরকারের কার্য-প্রণালীর দোষ। না জনগণের মজির দোষ। এর জন্যে দায়ী কে? এ বিষয়ে সোভিয়েত নেতারাও আজকাল মাথা ঘামাচ্ছেন। বিদেশী সোস্যালিস্টরাও এ বিষয়ে চিন্তিত। প্রশ্নটা উড়িয়ে দেবার মতন নয়। ভারতেও সে প্রশ্নের উদয় হবে ভবিষ্যতে। আমার মনে হয় সোস্যালিজম এক জিনিস আর 'বুরোক্রেসী' বা লালফিতের সরকারী যন্ত্রপাতি আর এক জিনিস। সোস্যালিজমকে দোষারোপ না করে 'বুরোক্রেসী'কেই বরং দায়ী করা উচিত। অনেক দেশে সোস্যালিজম নেই, কিন্তু বুরোক্রেসী আছে। এই দুয়ের সমস্যা সমাধান করা কতখানি শক্ত ব্যাপার সেটা ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝবেন।

সোভিয়েত সরকারের পররাষ্ট্রনীতিতে অনেকবার অনেক পরিবর্তন এসেছে। ভবিষ্যতে হয়তো আরও হবে। কিন্তু সোভিয়েত জনগণের ভারতের প্রতি মনোভাব একটুও বদলায় নি। ভারতের প্রতি সোভিয়েত জনগণের সত্যিকারের ভালবাসা ও শুভেচ্ছা এখনও অটুট রয়েছে। একদল লোকের অবশ্য ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান, সাপ-বাঘে-জঙ্গলে ঘেরা দেশ। কিন্তু অধিকাংশ জনগণের বিশেষ করে এশিয়া অঞ্চলের রাজ্যগুলোর প্রীতিমূলক মনোভাব অটুট আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এর সূত্রপাত হয় নেহরু-ক্রুশ্চেভ আমলে।

লালবাহাদুরের আমলে সেটা আরও বাড়ে। ভবিষ্যতে দুই রাষ্ট্রের প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় হবে বলেই আমরা মনে করি।

বেলোরাশিয়া, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড ও জার্মানীর গ্রামাঞ্চল

কিছুকাল আগে জার্মানী, পোল্যাণ্ড, বেলোরাশিয়া ও রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলের মধ্য দিয়ে কয়েকবার যাতায়াত করেছি। এই চার দেশের গ্রামাঞ্চল ও এই চার দেশের মধ্যে পার্থক্য কোথায় তাও চোখে পড়েছে। পশ্চিম থেকে যতই পুবে গেছি ওর পার্থক্য ততই প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে।

ফ্রান্সের গ্রাম থেকে অনেকখানি উন্নত পশ্চিম জার্মানীর গ্রামগুলো। বৃটেন ফ্রান্স বা পশ্চিম জার্মানীর গ্রামে এলে চাষের জমি বাদে কৃষক বা শ্রমিকরা যেখানে বাস করে সেখানকার রাস্তা-ঘাট, দোকান-পাট ও কৃষকদের বাড়ি-ঘর সবই পাকা। শহরের সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ গ্রামগুলো আর গ্রাম নেই সেগুলো শহর হয়ে গেছে। বৃটেন ও পশ্চিম জার্মানীর গ্রামগুলো আরও শহুরে। রাস্তাঘাট ঝকঝকে। মোটরগাড়ির ছড়াছড়ি। চাষ-আবাদ হয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে। এদের উৎপাদন আশাতীত বেড়ে চলেছে। উৎপাদন বাড়ছে কিন্তু চাহিদা কম। তাই কমন মার্কেটে চলেছে এখন অতি কৃষিজ উৎপাদনের সঙ্কট। আর আমাদের দেশে ঠিক তার উলটো।

পশ্চিম জার্মানী পেরিয়ে যেই পূর্ব জার্মানীতে পৌঁছেছি তখনই দেখেছি পার্থক্য। এখনও পূর্ব জার্মানীর জমিতে কৃষকের ও শ্রমিকের অভাব। গ্রামগুলো তেমন উন্নত নয় যেমন পশ্চিম জার্মানীতে। পূর্ব জার্মানীর কম্যুনিস্ট সরকার সব জমি যৌথখামার ও সরকারি-খামারের আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করছে। সর্বত্র অবশ্য কৃতকার্য হয় নি। যৌথখামারে দেখেছি শ্রমিকদের জন্য দালানকোঠা, ক্লাব,

ইস্কুল ইত্যাদি। তবে অনেক কৃষক তার নিজের ই
চলেছে। সেসব কৃষকদের বাড়ি-ঘর কাঠের, দালান
পূর্ব জার্মানী ছিল পুরো কৃষিজ। এখন প্রতি বছরে পূর্ব জার্মানীতে
হচ্ছে শিল্পোন্নয়ন। সুতরাং গ্রামের পরিবর্তে দেখা দিচ্ছে শহর।
চারধারে উঁচু উঁচু বাড়ি নির্মিত হচ্ছে সেখানে। পূর্ব জার্মানীর গ্রামের
চেহারা বদলে যাচ্ছে নিয়মিত ভাবে। পূর্ব জার্মানী ফ্রাঙ্কফুর্ট সাম
ওডাব শহর যেখানে শেষ হয়েছে তার কিছু পরেই সুরু পোল্যাণ্ড
সীমা। পোল্যাণ্ডের এই সীমা থেকে পোজনান শহর পর্যন্ত সমস্ত
গ্রামাঞ্চলগুলোর হাব-ভাব, বাড়ি-ঘরের প্যাটার্ন পূর্ব-জার্মানীর
মতন। এই অঞ্চলের বাড়ি-ঘর সবই পাকা নয়, অনেক কাঠের।
গ্রামাঞ্চলগুলো একেবারে অজ পাড়াগাঁ নয়। পোজনান পর্যন্ত
পোল্যাণ্ডের এই অংশে আগে বাস করত জার্মান ভাষীর দল। তাই
জার্মান প্রভাব পাওয়া যাবে এই সব অঞ্চলে। পোজনানের পর থেকে
বেলোরাশিয়ার সীমানা পর্যন্ত পোল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চল দেখে বিস্মিত
হয়েছি। মনে হয়েছে উত্তর-ভারতের পাহাড় অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছি।
পূর্ব-পোল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলে এখনও দেখতে পাওয়া যাবে খড়ের চাল
দেওয়া ঘরবাড়ি। ...হই প্রায় একতলা বাড়ি। কৃষকদের পোশাক-
আশাকে কোন বিলাসিতা নেই। যেমন আছে পশ্চিম জার্মানী বা
বৃটেনে। পোল্যাণ্ডে নতুন যৌথখামার ও সরকারি খামারে নির্মিত
হচ্ছে দালান কোঠা। পোলিশ-সরকার এখনও সব গ্রামাঞ্চলকে
যৌথখামারের আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয় নি। স্বাধীনভাবে বহু
কৃষক চাষবাস করে চলেছে। তাই তাদের গ্রামের বা বাড়ি-ঘরের
চেহারা ফেরে নি। পোল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের অবস্থা যেমন
খুব ভাল নয় তেমনি সেখানে দেখতে পাওয়া যাবে গীর্জা ও গীর্জার
পুরোহিত। যা নেই রাশিয়ায়। এমনকি আমি বড় বড় শহরে
দেখেছি রোমান ক্যাথলিক গীর্জার পুরুতরা বেশ কায়েমি হয়ে বসে
আছে। তারা বিনা বাধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে দৃশ্য দেখা যাবে

ল'

না রাশিয়ায়, বুলগারিয়ায় বা পূর্ব-জার্মানীতে। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে অন্যান্য সোস্যালিস্ট দেশের এখানেই তফাত। পোল্যাণ্ডের অর্ধেক গ্রামাঞ্চলে এখনও পাকা রাস্তা যায় নি। দালান-কোঠা এখনও কাঠের ও চাল খড়ের। অবশ্য বিদ্যুতের আলো সর্বত্রই আছে। আর আছে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়। জার্মানী ফ্রান্সের তুলনায় পোল্যাণ্ডের গ্রামগুলি এখনও বেশ দরিদ্র। পোল সরকার কৃষিতে যেমন সুবিধে করতে পারে নি তেমনি তারা সব কলকারখানা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান সরকারি আওতায় এনেছে। সেদিক দিয়ে পোল্যাণ্ড এগিয়ে যাচ্ছে। কৃষির দিকে ততটা নয়।

পোল্যাণ্ড ছেড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বেলোরাশিয়ায় পোঁছে গ্রামাঞ্চল দেখে আরও বিস্মিত হয়েছি। বেলোরাশিয়ার গ্রামাঞ্চল খুব বেশী উন্নত নয় এখনও। প্রথমতঃ, বেলোরাশিয়া কৃষি-প্রধান দেশ। রাশিয়ার মতন কলকারখানার ছড়াছড়ি সেখানে নেই তবে কৃষিজাতদ্রব্যে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। যেমন ইউক্রেনিয়া, উজবেকিস্তান, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, কাজাকস্তান ইত্যাদি। রাশিয়ায় জমির উর্বরতা কম। আবহাওয়া কঠোর। চাষ-আবাদ আগেও বেশী হত না, এখনও হয় না। গ্রীষ্মকালে যৌথখামারে দেখেছি কাঁচের ঢাকা ঘরে শাক্-সজির চাষ হচ্ছে। এর থেকে বোঝা যাবে শীতকালে রাশিয়ার জমিতে কিসের চাষ হয়। সে দিক দিয়ে বেলোরাশিয়া, ইউক্রেনিয়া বা উজবেকিস্তানে চাষের বহর দেখলে বিস্মিত হতে হয়। সেখানে কৃষিজ-উৎপাদন বেড়েই চলেছে। কিন্তু বেলোরাশিয়ার গ্রামে বাড়ি ঘরের চেহারা দেখলে মনে হবে ভারতবর্ষ থেকে খুব দূরে নেই। এখনও অনেক বাড়ি ঘরে খড়ের আটচালা দেখা যাবে। গ্রামের রাস্তায় নেই কোন বাতি। পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে এখানেও এদের তফাত।

বেলোরাশিয়া হতে রাশিয়ার ভেতর দিয়ে মস্কো পর্যন্ত এবং

যাবার পথে রাশিয়ার গ্রামাঞ্চল দেখে আশ্চর্য

হই নি। রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে বাড়ি-ঘরের চেহারা বেলোরাশিয়ার চেয়ে কিছুটা ভাল। তবে অধিকাংশ বাড়ি-ঘর কাঠের। দালান-কোঠার সংখ্যা কম। রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের পোশাক ও বেলোরাশিয়ায় কৃষকদের পোশাকের বিশেষ পার্থক্য নেই। কারণ সেখানে নেই কোনো বিলাসিতা। রাশিয়ার যৌথ-খামারের সংখ্যা বেশী। যেখানেই যৌথখামার সেখানেই পাকা বাড়ি-ঘর। তার সঙ্গে থাকে যন্ত্রপাতি, যানবাহন, বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়। তবে রাশিয়ার সর্বত্র যেমন কলকারখানার চিমনি দেখা যাবে তেমন নেই বেলোরাশিয়ায়। রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলের পথঘাট বেলোরাশিয়ার চেয়ে ভাল তবে সেসব পথঘাটের তুলনা করা চলে না বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী বা ফ্রান্সের সঙ্গে

রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের এখন অনেক বেশী স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, ফলে তারা নিজের অল্প জমিতে ফলমূল চাষ করে যা পায় তার অনেকখানি আজকাল তারা সামনের শহরে গিয়ে বেচে আসে। এমন অনেক কৃষকদের আমি মস্কো শহরের বড় বড় রাস্তার ধারে ফলমূল শাক্-সব্জি বিক্রি করতে দেখেছি। তারা সাধারণতঃ শনি, রবি বা ছুটির দিনে আসে গ্রাম হতে শহরে। শহরে পয়সা কামিয়ে সেখানে জিনিসপত্র কিনে, সিনেমা-থিয়েটার দেখে গ্রামে ফেরে।

মস্কো-লেনিনগ্রাদের পথে যা দেখেছি

সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে বিদেশীদের কৌতূহলের সীমা নেই। মস্কো থেকে ফেরা মানে উত্তর বা দক্ষিণ মেরু দেখে ফেরার মতন। সবার একই কৌতূহল। কেন এই কৌতূহল? পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর বছরের পর বছর সোভিয়েত বিরোধী প্রচারকার্যের ফলে এইসব রাষ্ট্রে জনগণের মনে

সর্বদাই কিম্ভূতকিমাকার কৌতূহল। আরেক দল আছেন যাঁরা রাজনীতিতে আদর্শবাদ বিশ্বাস করেন বা পছন্দ করেন। সোস্যালিজম এখনও তাঁদের কাছে আদর্শবাদ। সোভিয়েত ইউনিয়নে সোস্যালিজম কতখানি সার্থক হয়েছে সে সম্বন্ধে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে এই দল।

দু' বছর পরে মস্কো বা লেনিনগ্রাদে খুব বেশী পরিবর্তন দেখি নি। সোভিয়েত ইউনিয়নে তথাকথিত "লৌহ-যবনিকার" অবসান যে ঘটছে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। বিদেশী ট্যুরিস্টের সংখ্যা প্রতি বছরেই বাড়ছে। 'লৌহ-যবনিকা' সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর অপপ্রচার ছাড়া আর কিছু নয়। নতুন যেসব অট্টালিকা নির্মিত হচ্ছে মস্কোয় সেগুলোর প্যাটার্ন একালের প্যারিস-লণ্ডনের নতুন বাড়িগুলোর মতনই। অর্থাৎ দেশলাইয়ের বাক্স বা অতি আধুনিক প্যাটার্নের বাড়ি। ইউরোপ-আমেরিকার বুর্জোয়া সংস্কৃতি এখন আর নিষিদ্ধ নয়। বুর্জোয়া সংস্কৃতির স্বাক্ষর মিনি স্কার্ট লম্বা চুলওয়ালা বিট্‌লস-পন্থী রুশ তরুণদের রাস্তায় উপস্থিতি। পার্কে পার্কে টুইস্ট গাইয়ে ও নাচিয়েদের ভিড় দেখেছি। রাত দুটোর সময় ব্রেস্ট রেল স্টেশনে পৌঁছে ঘণ্টা দুই ওখানে অপেক্ষা করতে হয়। রেল স্টেশনে অপেক্ষারত চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে আঁটসাঁট পোশাকে টুইস্ট নাচের মহড়া দিচ্ছিল। দেখে মনে হল এরাও পিছিয়ে নেই।

ক্রুশ্চেভের আগে হয়ত এসব সম্ভব ছিল না। ক্রুশ্চেভের পর সোভিয়েত সরকার অনেক দিক দিয়ে আরও উদারনীতি অবলম্বন করেছেন। বিদেশীদের সঙ্গে খুব বেশী মাখামাখি পছন্দ করত না আগের সরকার। এখন সে বিষয়ে কড়াকড়ি কমেছে।

রুশরাও রক্তমাংসের মানুষ। দোষত্রুটি সব দেশেই আছে। তাই বলে সোস্যালিজমকে অপরাধী সাব্যস্ত করা ঠিক হবে না। উদাহরণ স্বরূপ মস্কোর ট্যাক্সির কথা বলা যেতে পারে। লোকসংখ্যার তুলনায় ট্যাক্সির সংখ্যা বেশ কম। কখনো কখনো

আধ থেকে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় ট্যাক্সির জন্যে। নাকের সামনে দিয়ে খালি ট্যাক্সির দল চলে যাবে। তাদের ডাকলে উত্তর দেবে গ্যারেজে যাচ্ছে। একদিন সন্ধ্যায় কুলচুরনি পার্কের পাশে ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডে এক বন্ধুর সঙ্গে ট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা করছি। খালি ট্যাক্সি চলে যাচ্ছে "গ্যারেজে"। অনেকেই অপেক্ষমান। একটি প্রাইভেট গাড়ি এসে থামল। বলল, মিটার নেই বটে তবে ট্যাক্সির মতন কাজ করে। হোটেলে পৌঁছে ভাড়া দিয়ে দিলাম। পরের দিন স্থানীয় অধিবাসীদের জিজ্ঞাসা করলাম বেআইনী ট্যাক্সি সম্বন্ধে। তারা বলল যে, আজকাল লোকের পয়সা বাড়ছে কিন্তু ট্যাক্সির সংখ্যা কম। অনেক বড় বড় রাজকর্মচারীর গাড়ির ড্রাইভার অফিসের পর কর্তার গাড়ি নিয়ে বেরোয় এবং বেআইনীভাবে ট্যাক্সি চালিয়ে কিছু উপরি রোজগার করে। এ-ঘটনা কলকাতায়ও দেখেছি। এবিষয়ে আমাদের সঙ্গে খুব বেশী তফাত নেই।

মস্কো ও লেনিনগ্রাদের মধ্যে তফাত বিস্তর। মস্কো নগরী বিরাট-বিশাল। নগরীর শেষ সীমানা নেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মস্কোর ওপর লড়াই হয়েছে অনেকবার। বিপ্লব ও যুদ্ধ মিলিয়ে মস্কো নগরীর অনেক পরিবর্তন এনেছে গত পঞ্চাশ বছরে। সেদিক থেকে লেনিনগ্রাদের খুব বেশী পরিবর্তন হয় নি। রুশ বনেদি সমাজের আভিজাত্যের ছাপ দেখা যাবে এখনও লেনিনগ্রাদে। নগরীর প্রভাবে নগরবাসীর মনোভাবও গড়ে উঠেছে অন্যভাবে। মস্কোবাসীদের সঙ্গে এদের এখানেও ফারাক। মস্কোর ট্রাম-বাসে-মেট্রোয় সর্বত্র ঠেলাঠেলি। লেনিনগ্রাদে তেমন নেই। লেনিনগ্রাদ-বাসীরা মস্কোর তুলনায় অনেক শান্ত ও মার্জিত। লেনিনগ্রাদ পুরোপুরি রুশশহর। মস্কো তা নয়। সমস্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ভাষী ও জাতির দল মস্কোয় ভিড় করেছে।

একালের রুশ সমাজে পারিবারিক বন্ধন অনেকখানি শিথিল হয়েছে। সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতা অত্যন্ত প্রখর। ফলে বিয়ে হয়

যেশ অল্প বয়সে এবং বিবাহ-বিচ্ছেদও হয় খুব তাড়াতাড়ি। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নে অনাথ বালক-বালিকার সঙ্গে বিদেশী বুর্জোয়া সমাজের অনাথদের তুলনা করা চলে না। বিদেশী বুর্জোয়া সমাজে অনাথরা সারা জীবন অনাথই রয়ে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে সবার সমান অধিকার। 'মেরিট' অনুযায়ী সমাজে বা কর্মস্থলে তার আধিপত্য। সেখানে অনাথ বা অন্যদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

সোভিয়েত সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতা বাড়ছে মূলতঃ একটি কারণে ছেলেমেয়ে, বুড়ো-বুড়ী সবাই খাটছে। রোজগার করছে। বেকারি, অভাব-অনটন, দুর্ভিক্ষ বা বিনা চিকিৎসায় মারা যাবার চিন্তা নেই। শিক্ষার সব দ্বার সবার জন্যে খোলা। কেউ অন্যের ওপর নির্ভর করে না, ফলে সুখ সম্ভোগের মাত্রা বেড়েই চলেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র যত পরিবর্তনই আনুক না কেন জনসাধারণের অতিথিপরায়ণতা বদলাতে পারে নি। রুশরা খেতে ও পান করতে ভালবাসে এবং তারা অন্যদের খাওয়াতে ও পান করাতে ভালবাসে। কোনো একটা উপলক্ষ হলেই হল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এদের আমি খেতে ও পান করতে দেখেছি। এ ব্যাপারে জর্জিয়ানরা সবার ওপরে। জর্জিয়া ছোট রাজ্য, কিন্তু কৃষি-উৎপাদনে সবার ওপরে গ্রীষ্মকালের শেষে শরৎকালে যখন মস্কোয় শাকসবজি কমে যায় ফলটল প্রায় বাজার থেকে হয় উধাও, তখন কোনো কোনো জর্জিয়ান এইসব জিনিস নিয়ে সোজা চলে আসে বিমানযোগে মস্কোয়। মস্কোয় নেমে চড়া দামে বেচে বেশ কিছু পয়সা রোজগার করে এবং রেস্তোরাঁয় খানা-পিনা সেরে কয়েকদিন স্ফূর্তি করে দেশে ফেরে।

সেদিক দিয়ে আর্মেনিয়ানরা চৌকশ। আর্মেনিয়া অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশ। কিন্তু আর্মেনিয়ানরা ভীষণ চতুর। সোভিয়েত আকাডেমিতে আর্মেনিয়ান সভ্য সংখ্যা বিস্তর। বিজ্ঞানী ও

আবিষ্কারকদের মধ্যে আর্মেনিয়ানদের সংখ্যা যেমন প্রচুর তেমনি সংস্কৃতি জগতে। সঙ্গীত মহলেও এদের প্রাধান্য কম নয়।

সোভিয়েত এশিয়ার উজবেক, কাজাক, আজারবাইজান, তুর্কমেনস্তানের অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপ করে সব সময় মনে হয়েছে যেন উত্তর-ভারতের লোকজনের সঙ্গে আলাপ করছি। ভারতীয় মনোভাব পাওয়া যাবে এদের মধ্যে। মনে হবে না বিদেশীর সঙ্গে আলাপ করছি। অতিথি সেবায় এদের জুড়ি নেই। ভাষা না জানা থাকায় যা মুশকিল। এদের কেউ কেউ অল্প ইংরেজী বা ফরাসী জানে। তাই নিয়ে মহা হৈচৈ। একদিন মস্কোর উজবেক রেস্তোরাঁয় আলাপ এক উজবেক শিল্পীর সঙ্গে। তিনি ভারতে গিয়েছিলেন। ব্যাস আর কি। খানা-পিনার পর্ব শুরু হয়ে গেল। যেন কতকালের আত্মীয়তা। তিনি আরেক উজবেক যুবককে পাকড়াও করে নিয়ে এলেন ছেলেটি মাস দেড়েক হল ভারত থেকে ফিরেছে। হায়দরাবাদে হিন্দী উর্দু শিখেছে। ব্যাস, হিন্দী উর্দুতে কথা আর পাঞ্জাবী-কাশ্মীরের খানা আরও জোরে চলতে লাগল রেস্তোরাঁর ফটক বন্ধ না হলে আমরা বোধ হয় সারা রাত ওখানেই থেকে যেতাম। তারা আমায় নেমন্তন্ন করল তাসখন্দে যাবার জন্যে যেন কতকালের আত্মীয়তা। সোভিয়েত এশিয়ার জনগণ ভারতকে সত্যি ভালবাসে। মনে হবে যেন আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। তাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধন আরও দৃঢ় হওয়া উচিত।

বুলগারিয়া

বুলগারিয়া পূর্ব ইউরোপের এক প্রান্তর, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি যেন ভারতবর্ষের কোন এক অংশে বিচরণ করছি। বিশেষ করে পাঞ্জাব বা কাশ্মীরের হাব-ভাব আচার-ব্যবহার, খাদ্য এমন কি গান পর্যন্ত একই ধরণের মনে হচ্ছে। একটি মাত্র তফাত, বুলগারিয়ানরা ইউরোপীয় পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর পাঞ্জাবী বা কাশ্মীরী খাদ্য ইউরোপীয় কায়দায় পরিবেশন করছে। এই যা তফাত। এ যেন ভারতবর্ষের মাসি-বাড়ি। রেডিওতে গান শুনছি, যেন উত্তর-ভারতের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। অপেরার লোকসঙ্গীত যেন কাশ্মীরের লোকসঙ্গীত। আর খাদ্য' উত্তর ভারতের বিশেষ করে পাঞ্জাব অঞ্চলের কোফ্‌তা, কোর্মা, কাবাব ও সবজী পরিবেশিত হচ্ছে রেস্তোরাঁয় ইউরোপীয় কায়দায়।

জনসাধারণের হাবভাবও ভারতীয়। বিশেষ করে মেয়েদের। উত্তর-ভারতের সঙ্গে এদের সাংস্কৃতিক ঐক্যের কারণ তুর্কীদের রাজত্বকাল। উত্তর-ভারতে যেমন তুর্কী রাজত্বেরও আধিপত্যের ফলে মোগলাই খানার সূত্রপাত হয়েছে তেমনি বুলগারিয়াযও। বুলগারিযায় তুর্কীরা পাঁচশ বছর রাজত্ব চালিযেছে। মাত্র পঞ্চাশ ষাট বছর আগে তার পেযেছে মুক্তি তুর্কীদের হাত থেকে। বুলগারিয়া ছোট্ট দেশ। লোকসংখ্যা মাত্র সত্তর লক্ষ। বৃহত্তর কলকাতার লোকসংখ্যা থেকে একটু বেশী। তার মধ্যে শতকরা ৮০ জন হল স্লাভ বংশোদ্ভূত। স্লাভরা রাশিয়ানদের সমগোষ্ঠী। বুলগারিয়ার ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম রুশদের মতন। বিশেষ পার্থক্য নেই। বাকি শতকরা বিশজন হয় তুর্কী নয় গ্রীক, নয়তো জিপ্‌সি। বিগত শতাব্দীর শেষভাগে রুশ-সম্রাট আলেকজাণ্ডার বুলগারিয়াকে তুর্কী-শাসন থেকে মুক্ত করেন। এই কারণেই বুলগারিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন হিটলার প্রায় সমস্ত ইউরোপ দখল করে তখন বুলগারিয়াও যায় নি বাদ। জার্মান অধিকৃত বুলগারিয়াকে মুক্ত করে সোভিয়েত সামরিক-বাহিনী। এই কারণেই রুশ বুলগারিয়া মৈত্রী আরও দৃঢ় হয়। তাই সোফিয়ার রাস্তায় রাস্তায় দেখা যাবে রুশ-সেনানায়কের মূর্তি। বুলগারিয়ার আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা রাশিয়ার প্রাক বিপ্লব-যুগের চেয়েও খারাপ। গত পনেরো বছরে অবশ্য এদেশের অনেক উন্নতি হয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ায় যে ভাবে আর্থিক উন্নয়ন হয়েছে ঠিক সেই পথ অনুসরণ করেছে বুলগারিয়া।

বুলগারিয়া কৃষিপ্রধান দেশ তাই কম্যুনিস্ট সরকার কৃষি-উন্নয়নে সর্বপ্রকার শক্তি নিয়োগ করেছে এবং সেই সঙ্গে তারা বাঁধ, জলসেচ, ইলেকট্রিক ও ভারী যন্ত্র তৈরীর কারখানা স্থাপন করেছে যন্ত্র শিল্পের উন্নতি হচ্ছে আস্তে আস্তে। বুলগারিয়া প্রাকৃতিক সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ এর ভূগহ্বরে রয়েছে কয়লা, লোহা, পেট্রল ও আরও অনেক খনিজদ্রব্য। কৃষিজদ্রব্য এদের এত অধিক উৎপন্ন হয় যে, প্রায় সারা পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে এরা ফলমূল ও তামাক চালান দেয়। যৌথখামারই কৃষিজ দ্রব্যাদি কেনাবেচা করে

সোভিয়েত রাশিয়ার মতন বুলগারিয়ানরা স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী কেউই নয় শুধু গ্রামে ছাড়া অস্থাবর সম্পত্তি, যেমন জামা কাপড়, আসবাব দ্রব্যাদি সবই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। দোকান-পাট, হোটেল, সবই সরকারের সম্পত্তি।

বুলগারিয়ার ইতিহাসে পরিবর্তন এসেছে শতাব্দীতে শতাব্দীতে। বিদেশী আক্রমণ ও শাসন চলেছে এখানে খ্রীষ্টপূর্ব যুগ থেকে। হাজার তিনেক বছর আগে পারস্য থেকে থ্রাসিয়ানরা পত্তন করে তাদের সাম্রাজ্য। তার চিহ্ন পাওয়া যাবে প্লবদিব শহরের আশেপাশে। এখনও সেখানে দেখা যাবে ছোট ছোট স্তূপ। ওই সব স্তূপের নিচে

আছে থ্রাসিয়াদের কবর। তারপর পত্তন হল গ্রীক সাম্রাজ্যের। বুলগারিয়ার দ্বিতীয় বৃহৎ শহর হল প্লবদিব। এই প্লবদিবেই প্রথম গ্রীকসাম্রাজ্যের রাজধানী নির্মিত হয় ছোট তিনটি টিলার ওপর। আর এই সাম্রাজ্যের পত্তন করেন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আলেকজাণ্ডারের পুত্র ফিলিপ। গ্রীকসাম্রাজ্যের ভাঙন ধরলে আসে রোমানরা। কিন্তু তাদেরও অবস্থা হয় গ্রীকদের মতনই। তাহলেও বুলগারিয়ার মধ্যপ্রদেশ ও দক্ষিণাঞ্চলে এখনও দেখতে পাওয়া যাবে গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ। এর পর আসে বৈজান্টিন। বৈজান্টিন সংস্কৃতি যখন চরম শিখরে তখন তারা বুলগারিয়ায় অমন সুন্দর বৈজান্টিন সংস্কৃতি ধ্বংস করে প্রবেশ করে তুর্কীরা। তুর্কীরা শুধু শাসন ও লুঠতরাজই করেছে সাংস্কৃতিক চিহ্ন তারা রেখে যেতে পারে নি, একমাত্র খাদ্য ছাড়া।

বুলগারিয়ায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কৌতূহল যেন সমারোহ। তার প্রধান কারণ বুলগারিয়ায় লেখাপড়া জানার সংখ্যা প্রায় শতকরা নব্বই। তার ওপর ভারতীয় মনোভাব পাওয়া যাবে এদের মধ্যে। এমন কি কোনো কোনো অঞ্চলের পোশাকে পর্যন্ত বলদ-মহিষ ঘোড়ার সাহায্যে চাষ এখনও হচ্ছে দেখে এলাম। খাদ্যের কথা তো আগেই বলেছি। অবশ্য সেখানে দারিদ্র্য নেই বা বললাম

ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক শিক্ষিত লোক পড়াশোনা তো করছেই উপরন্তু অনেক খোঁজখবরও রাখেন। সাধারণ পশ্চিম ইউরোপে পশ্চিম ইউরোপে শিক্ষিত ব্যক্তিদের চোখে ভারতবর্ষ জংলি দেশ ছাড়া আর কিছু নয় কিন্তু বুলগারিয়ায় দেখেছি অন্য রকম। শিক্ষিতদের অনেকেই রবীন্দ্রসাহিত্যে অনুরাগী। রবীন্দ্রনাথের প্রচুর লেখা অনূদিত হয়েছে। তা ছাড়া যেসব ভারতীয় সাহিত্য রুশভাষায় অনূদিত হয়েছে তার সবটাই বুলগারিয়ান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় সাহিত্য এদের পড়ার জো নেই। কারণ তৃতীয় শ্রেণীর যেসব ভারতীয় লেখকরা ইংরেজী

ভাষায় লেখেন তাঁদের বই বুলগারিয়ান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সেসব বই দেখলাম ছোট বড় শহরের গ্রন্থাগারে। তুই ভারতীয় সাহিত্যিকের মধ্যে মুলকরাজ আনন্দ ও ভবানী ভট্টাচার্য অন্যতম। একটি বুলগারিয়ান গ্রন্থে দেখলাম মাত্র তুইজন ভারতীয় সাহিত্যিকের ছবি ছাপা হয়েছে পাশাপাশি, রবীন্দ্রনাথ ও মুলকরাজ আনন্দ।

বুলগারিয়ায় দেখছি ভারতীয় সংস্কৃতির জয়-জয়কার। আমি এমন একটি লোক দেখলাম না যে, সে ভারতীয় সিনেমা দেখে নি। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত ভারতীয় ফিল্মের গান তু-এক লাইন গাইতে পারে। বর্তমানে সেখানে ভারতের সবচেয়ে তুজন অতি জনপ্রিয় লোকের একজন শ্রীজওহরলাল নেহরু, আর দ্বিতীয় জন হলেন সিনেমা অভিনেতা রাজকাপুর। রাজকাপুর ও নার্গিসের ছবি বিক্রি হচ্ছে খবরের কাগজের দোকানে। বোম্বাই ছবির জনপ্রিয়তা লাভ করেছে যতখানি বুলগারিয়ায় ততখানি নয় পশ্চিম ইউরোপে।

বুলগারিয়ান সঙ্গীতের সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যাবে। তাই বুলগারিয়ানরা ভালবাসে ভারতীয় সঙ্গীত। সেদিন সোফিয়ার বড় রেস্তোরাঁয় শুনলাম কয়েকটি ভারতীয় ফিল্ম সঙ্গীত। প্যারিস লণ্ডনের বড় রেস্তোরাঁয় ভারতীয় সঙ্গীতের পরিবেশন অভাবনীয়। তিরনোভার মতন ছোট মফস্বল শহরেও শুনলাম একটি রেস্তোরাঁয় ভারতীয় ফিল্ম সঙ্গীত শুধুই কি বাজনা, একটি বুলগারিয়ান গায়ক গাইল সেই ফিল্ম সঙ্গীত।

বুলগারিয়ার পথে পথে

বুলগারিয়ায় প্রকৃতি দেবী যেন তার সব প্রাকৃতিক সম্পদ অকৃপণ হস্তে ঢেলে দিয়েছে। বুলগারিয়ার চারদিকেই ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর দেখছি ফসল আর ফসল। ফলে ফুলে ভরে আছে মাঠ-ঘাট। বুলগারিয়ার নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার দরুণ এখানে নানান ধরণের ফল-ফুলের সম্ভার যা পশ্চিমে বা উত্তর ইউরোপে একেবারেই বিরল। শস্যের মধ্যে গম হয় প্রচুর। দক্ষিণাঞ্চলে সামান্য ধানের চাষও হয়। খাদ্যের ব্যাপারে এরা স্বয়ংসম্পূর্ণ তো বটেই, উপরন্তু এরা রপ্তানি করে বিদেশে। এদেশে সব চেয়ে লাভজনক ব্যবসা হল তামাক পাতা, আঙ্গুর, মদ আর গোলাপ ফুলের এসেন্স। বিদেশে এরা এই জিনিসগুলো খুব বেশী পরিমাণে চালান দেয়। সেদিন দেখলাম একটা বিরাট বিমানে সোফিয়া হতে চলেছে কেবল চেরি ও চেরি ফল। গন্তব্যস্থান মস্কো। বুলগারিয়া পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীতে সব চেয়ে বেশী পরিমাণে বেচে তার কৃষিজাত দ্রব্য। বুলগারিয়া কৃষিপ্রধান দেশ, তাই কৃষিজ উৎপাদনের পরিবর্তে তাকে কিনতে হয় শিল্পজাত দ্রব্যাদি। এগুলো আসে জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া ও রাশিয়া থেকে।

একটা জিনিস বারে বারে চোখে পড়ছে শহরে ও গ্রামে। বিলাসিতার চিহ্ন যেন নেই এমন কি সোফিয়ার মতন রাজধানীতেও জনসাধারণের পোশাকে বিলাসিতার গন্ধ পর্যন্ত নেই। দোকান-গুলোতে নেই বিলাস দ্রব্যাদি। দোকান-পাট, কর্মচারী, জিনিসপত্র সবই সরকারী। সুতরাং তার দরও বাঁধেন সরকার। সরকারী দর সবই কৃত্রিম। শুধুমাত্র নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি ছাড়া সব জিনিসই অগ্নিমূল্য। বড় শহরে অনেকের পোশাকে হয়ত দেখা যাবে কিছু পরিমাণে দারিদ্র্যের ছাপ। গ্রামে তো বটেই। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্যণীয়। একজনও এখানে অভুক্ত থাকে না; একটিও ভিখারী

নেই। হয়ত কিছু অল্প সংখ্যক বেকার আছে। তাহলেও তাদের জন্য সরকারী ব্যবস্থা আছে। সকলের চেহারায়ই পুষ্টির ছাপ পাওয়া যাবে।

দেশটা প্রাচুর্যের। তাই গ্রামাঞ্চলে দেখছি সবাই সারাদিন একটা-না একটা কিছু চিবুচ্ছেই। শহরে ততটা নয়। দুবেলা এরা রাজসিক আহার করে। ছেলেপুলেদের স্বাস্থ্য অন্যদের চেয়ে অনেক ভাল। কারণ ছেলেপুলেদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সরকার বিশেষ তৎপর। শিশুদের জন্যে এখানে অনেক রকমের ব্যবস্থাই রয়েছে।

গ্রামের পথ দিয়ে যাচ্ছি। দু'ধারে দেখছি শুধু নতুন নতুন বাড়ি। এই কিছুদিন আগেও চাষী পরিবারগুলো বাস করতো আটচালায়। এখন তারা বাস করছে পাকা একতলা দালানে। প্রতি গ্রামেই দেখেছি নতুন নতুন বাড়ি তৈরী হচ্ছে। গ্রামে সব চেয়ে বড় বাড়ি যেটি, সেটি হল স্কুলবাড়ি। অনেক স্কুলবাড়ি প্রাসাদের মতন দেখতে। কিন্তু রাস্তাঘাট সবই পাকা নয়। প্রচুর কাঁচা রাস্তা রয়েছে। তার ওপর দিয়ে চলেছে ঘোড়ার গাড়ি বা গোরুর গাড়ি। এমনি মেঠো পথ দেখেছি যুগোশ্লাভিয়ায়, জাগ্রেব শহরের পাশেই। বুলগারিয়ার মতন যুগোশ্লাভিয়ায়ও এখনও বলদ বা ঘোড়ার সাহায্যে চাষাবাদ হচ্ছে। অবশ্য ট্রাক্টর তো আছেই। সেকেলে লাঙলের সাহায্যে বলদসহ চাষ বুলগারিয়ার অনেক গ্রামেই দেখা যাবে। ট্রাক্টরও মাঝে মাঝে সাহায্য করে।

এখন স্কুলে গ্রীষ্মের লম্বা ছুটি। তাই দেখছি স্কুলের পোশাকে ছাত্র-ছাত্রীরা সাহায্য করছে তাদের গ্রামে ফসল তোলার কাজে। কোন কোন গ্রামে দেখছি সমস্ত চাষী-পরিবারই ফসল তোলার কাজে লেগেছে। স্কুলের ছেলে-মেয়েরা বেশ আনন্দের সঙ্গে কাজ করছে। তারা দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে এসেছে কাজ করতে, সেই সঙ্গে ভ্রমণ।

বুলগারিয়ায় দেখেছি প্রচুর পেশাদার শিল্পী। হয় গায়ক নয়তো বাদক। এরা সবাই সরকারী কর্মচারী। সরকারী কর্মচারীদের মতন বিভিন্ন স্থানে এরা বদলী হচ্ছে। তবে শিল্পীদের মাইনে অন্যদের চেয়ে একটু বেশী। লেখক-সাংবাদিকদের রোজগার শুনলে বিস্মিত হতে হয়। আমাদের দেশে উচ্চপদস্থ ভারত সরকারের কর্মচারীরাও তত রোজগার করেন না। বৈজ্ঞানিকদের অবস্থাও তাই।

বুলগারিয়া কম্যুনিস্ট শাসিত দেশ। সুতরাং তার উৎপাদন, যোগান ও বিক্রয় সবই সরকারী পরিকল্পনানুযায়ী। কোন্ জমিতে ধান ফলাবে না তামাকপাতা ফলাবে তার পরিকল্পনা করেন সরকার। চাষীরা মালিক নয়। সরকারী খামারে চাষীরাও মাইনে করা কর্মচারী। শুধু যৌথখামারে তারা অংশীদার। তবে দেখা গেছে যে, সরকারী খামারে উৎপন্ন দ্রব্যাদি যৌথখামারের চেয়ে দামে সস্তা। কারণ, যৌথখামারে চাষীরা নিজেরাই মালিক। তারা লাভটা একটু বেশী করেন। তাই তারা নতুন নতুন বাড়ি করছেন।

একটা বড় যৌথ খামারের উদাহরণ দিচ্ছি। মধ্য বুলগারিয়ার 'নোভা জাগোরা' নামে ছোট্ট শহরে গেছি। শহরটি ছোট্ট কিন্তু তার আশে-পাশে গ্রামই হল তার প্রাণ। গ্রামগুলোকে নিয়েই সে বেঁচে আছে। ওর আশে-পাশে সব কটা গ্রামই যৌথখামারের অধীনে। নোভা জাগোরা শহরটি হল বুলগারিয়ার ওই জেলার শাসনকেন্দ্র। নোভা জাগোরা শহরের জন্যে রয়েছে পৌরসভা। এর কার্যকলাপ নোভা জাগোরা শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ওই শহরেই রয়েছে পিপলস কাউন্সিল বা লোকসভা। লোকসভার কাজ হল ওই জেলার শাসনকার্য পরিচালনা করা। নোভা জাগোরা শহরের 'পিপলস কাউনসিল' বা লোকসভার অধীনে রয়েছে ৪২টি গ্রাম ও ছোট্ট শহর। এই লোকসভার কর্মপরিচালনায় চালিত হয় ওই

জেলার সমস্ত অর্থনৈতিক কলকব্জা, চাষ-বাস ও যৌথখামার। উপরোক্ত লোকসভার অধীনে পরিচালিত হয় ১২টি যৌথখামার ও ২টি সরকারী খামার। সবকটা খামারেই কাজ করে ৪৫ হাজার চাষী। ২৫ হাজার কাজ করে বিভিন্ন জেলায়। কিন্তু ওই সংখ্যার মধ্যে দুটো 'স্টেট ফার্ম'এ কাজ করে মাত্র ৭০০ কর্মচারী। সরকারী খামারে কর্মচারীর সংখ্যা কম এই জন্যে যে, ওখানে ব্যবহৃত হয় বেশী পরিমাণে যন্ত্রপাতি। সরকারী খামারে উৎপাদনও বেশী। সরকারী খামারে চাষীরা কর্মচারী। তারা মাস গেলে রোজগার করে ৯০০ লেভা, প্রায় পাঁচ শ' টাকা।

বুলগারিয়ায় চাষীরা বেশ বিত্তবান। এদের আয় এখন দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। আগে এদের একমাত্র অভাব ছিল জলের। কম্যুনিস্ট সরকার দেশের নানা দিকে জলাধার ও সেচের ব্যবস্থা করে তাদের সে অভাব মিটিয়েছেন। নোভা জাগোরা এলাকায় দেখলাম, ক্ষেতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে নলকূপ বসিয়ে।

বুলগারিয়ায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলেছি মেঠো পথ দিয়ে। বাহন রাশিয়ায় তৈরী 'মসকোভিচ্' নামে ছোট গাড়ি। বুলগারিয়া আমাদের মতন সমতল দেশ নয়, পাহাড়ে। যেমন কাশ্মীর বা পাঞ্জাব। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে হলে অনেক চড়াই-উতরাই ডিঙোতে হয়। কিন্তু যেখানে জমি, সেখানে মেঠো পথ। অবশ্য বড় বড় সড়কগুলো সবই বাঁধানো। বুলগারিয়া ইউরোপের একটি দেশ হলে হবে কি, আমাদের দেশেরই গ্রামের আবহাওয়া। এ-দিকে সে-দিকে হাঁক-ডাক। আদর-আপ্যায়নের কথা পরে বলব।

গ্রামাঞ্চলে বেড়ানোর সময় যা সবচেয়ে বেশী চোখে পড়েছে, তা হল পথ-ঘাট। পথ-ঘাট সবই অবশ্য উৎকৃষ্ট নয়, তাহলেও ওখানকার সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে নতুন নতুন পথ তৈরি করতে। ব্ল্যাক

সী-র বড় বন্দর বুর্গাস। বুর্গাস শুধু বন্দর নয়, বড় কারখানা-শহরও। বুর্গাস থেকে স্তারাজাগোড়া শহরের দিকে চলেছি। পথের ধারে দেখছি সৈনিকদের দল। সৈনিকের দল দেখে ঘাবড়ে গেলাম। কী ব্যাপার, লড়াই শুরু হল নাকি! না তো, সৈনিকদের হাতে যে হাতিয়ার হিসেবে দেখছি শুধু কোদাল, শাবল ইত্যাদি। বন্দুক-টন্দুক দেখছি নাতো! কী ব্যাপার! তাই জিজ্ঞাসা করি মিঃ মসকভ্‌কে, কী ব্যাপার মশাই!' মিঃ মসকভ্‌ আমায় এই অঞ্চল ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন, তাঁর ডাকনাম বরিস। বরিস বললেন, ঘাবড়াবেন না। এরা সৈনিক বটে, কিন্তু হাতে বন্দুকের বদলে কোদাল-শাবল। এই নিয়ে এরা লড়ছে। অবশ্য এদের লড়াই ভাঙাচোরা পথের বিরুদ্ধে। এরা আসলে যুদ্ধের সৈনিক নয়। সবে সামরিক বাহিনীতে ঢুকেছে। এক বছর সামরিক বাহিনীতে কুচকাওয়াজ করার পর এদের এই কাজে লাগিয়েছে সামরিক বাহিনী। এখন তো আর যুদ্ধ-বিগ্রহ নেই যে, লড়াই-এর মাঠে লড়তে হবে। নেই কাজ বলে তো আর খই ভাজা ওদের কাজ হতে পারে না। তাই আমাদের সরকার এই সব সৈনিককে রাস্তা তৈরীর কাজে লাগিয়েছে।

মাইলের পর মাইল দেখছি বুলগারিয়ান সৈনিকরা পথ নির্মাণ করে চলেছে। এই পথ নির্মাণের ফলে গ্রাম থেকে শহরে বা গ্রামে গমনাগমন হয়েছে অতি সহজ। এর ফলে গ্রামগুলো আর দুর্গম হয়ে থাকছে না, গ্রামগুলো হয়ে পড়ছে ছোট ছোট শহরের মতন।

বুর্গাস থেকে স্তারাজাগোড়ার পথে যাচ্ছি আর দু দিকে তাকিয়ে দেখছি। দেখছি সব ক্ষেতেই প্রচুর ফসল। গমের ক্ষেতে বাতাসের ধাক্কায় হেলছে দুলছে পাকা সোনার মত গমের গাছগুলো। অন্য ক্ষেতে দেখছি সবুজের মধ্যে লাল লাল ফল। ওগুলো হয় টোমাটো নয়তো স্ট্রবেরি। সবাই ফসল কেটে ঘরে তুলছে। অবশ্য বুলগারিয়ার ঘরে তোলার জো নেই। সবই তুলতে হবে যৌথখামারে, সে কথা পরে বলছি।

হাঁ করে তাকিয়ে কী দেখছেন মশাই !

আমি বলি, দেখছি আপনার দেশের গমের ক্ষেত। তা ওই বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো কী করছে ওখানে ? ইস্কুলে যায় না ওরা ? পড়াশুনোর বালাই নেই নাকি ?

বন্ধু বরিস উত্তরে জানালেন, ইস্কুলে ওরা ঠিকই যায়। পড়াশুনোয় ফাঁকি দেওয়ার জো-টি নেই। কিন্তু এখন যে ছুটির সময়। গ্রীষ্মের ছুটি। ছেলেমেয়েগুলো এই গ্রামের বা অন্য কোন শহরের হবে হয়ত। এরা এখানে এসেছে দল বেঁধে বেড়াতে। এরা যে ক'দিন থাকবে, ততদিন এরা চাষীদের সাহায্য করবে, ফসল তোলার কাজে, নয়তো ফল তোলার কাজে। তার পরিবর্তে এরা খাওয়া-শোওয়ার সব সুবিধে পাবে। চাই কি নগদ পয়সাও। একাধারে ছুটি কে-ছুটি অপর দিকে কিছু আয়, মন্দ কী। আমাদের সময় এসব ছিল না, আমরা হয় খাটতামই নয়তো ইস্কুলেই থাকতাম। ইস্কুলে পড়ার সংস্থান তখন সবার ছিল না। এখন তো যে কেউ পাঠাতে পারে তার ছেলেমেয়েকে ইস্কুলে। কোনো খরচই লাগে না।

খানিকক্ষণ চুপচাপ ছিলাম। দেখছিলাম গ্রামে গ্রামে নতুন পাকা বাড়ি। কুঁড়ে ঘর কোথাও দেখছি না। আটচালার বদলে বুলগারিয়ান চাষীরা একতলা বাড়ি নির্মাণ করে চলেছে। সবই নতুন। আমি ভাবছি কী করে হল সম্ভবপর। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বরিস বলতে শুরু করেন—ভাবছেন বুঝি ওই নতুন নতুন বাড়ি গুলোর কথা। আগে এমনি পাকা বাড়ি ছিল না বুলগারিয়ার গ্রামে। তখন সবই ছিল আটচালার। অনেকটা আপনাদের দেশের মতন। এখন বুলগারিয়ান চাষীরা নিজেদের ভাগ্য ফিরিয়েছে। প্রশ্ন করতে পারেন, কী করে সম্ভব হল ? অবশ্য আমাদের দেশের চাষীরা কোনো অলৌকিকতার পরিচয় দেয় নি। কোনো ম্যাজিকও নয়।

বুলগারিয়া আপনার দেশের মতই কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষির উন্নতিতেই বুলগারিয়ার উন্নতি সম্ভব হয়েছে। সে উন্নতির পথ—সমবায় প্রথায় চাষ। যৌথখামার। দেশের শতকরা ১০০ ভাগ জমিই যৌথ প্রথায় চাষ হচ্ছে। এর ওপর আছে সরকারী খামার। তবে শতকরা ৯৫জন চাষীই এখন যৌথখামারের অধীনে কাজকর্ম করছে। এছাড়া প্রত্যেক চাষীর রয়েছে নিজস্ব বলতে একখণ্ড জমি।

বুলগারিয়ার গ্রামে এক-তৃতীয়াংশ বাড়িই নতুন। তার কারণ, এগুলো নির্মিত হয়েছে গত পাঁচ বছরে। এই সমস্ত বাড়ি নির্মাণে কিন্তু সরকার এক পয়সা খরচ করে নি। সবই কৃষকের খরচে নির্মিত। জিজ্ঞাসা করতে পারেন—কৃষক এত টাকা পেল কোথা থেকে। বাড়িগুলো সবই একতলা। এক-একটি বাড়িতে আছে চার থেকে ছ'খানা করে ঘর। দেখতেই তো পাচ্ছেন ইটের তৈরী। আটচালা নয়। একটি এমনি বাড়ি তৈরীর খরচ, একটি চাষীর দেড় বছরের খাটুনির পারিশ্রমিকের সমান। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল এদের মধ্যে ঐক্য। একটি বাড়ি তৈরী করতে যা যা প্রয়োজন তার সবটাই প্রায় এরা নিজেরা তৈরী করে। বাকি যা না কিনলে চলে না—যেমন পেরেক, রঙ, সিমেন্ট ইত্যাদি এরা কেনে। বাকি মাল-মসলা নিজেরাই প্রস্তুত করে গ্রামে। তারপর রাজমিস্ত্রি বা মজুর সমস্যা? সে তারাই। অর্থাৎ একটি চাষীর বাড়ি নির্মাণে সেই গ্রামের অন্য চাষী বন্ধুরা এসে হাজির হয় তার বাড়ি নির্মাণে সহায়তা করতে।

একটা গ্রামে দেখলাম কয়েকটা বাড়ি অর্ধেক নির্মিত হয়েছে, কিন্তু তার মাথায় বাঁশ বেঁধে জামাকাপড় ঝোলান রয়েছে। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় ওই গ্রামের চাষীরা জবাব দিল যে, এ হচ্ছে আমাদের দেশের রীতি। গ্রামে কারুর নতুন বাড়ি তৈরী হতে থাকলে প্রত্যেক গ্রামবাসী তার সাধ্য মতন জামা-কাপড়, আসবাবপত্র

দিতে থাকে উপহারস্বরূপ ওই নতুন বাড়ির পরিবারকে। কারণ নতুন বাড়ি তৈরী হলে গৃহপ্রবেশের উপহার হিসেবে ওগুলো ব্যবহৃত হবে। নতুন বাড়ি তৈরী হলে পরিবারের চাই পোশাক ও আসবাবপত্র। সেগুলোর একাংশ এসে থাকে গ্রামবাসীর উপহার থেকে। শুধুই কি তাই। যেদিন বাড়ির কাজ সম্পূর্ণ হবে সেদিন গ্রামে হবে উৎসব। সবাই মিলে ভোজে-পানে হবে মুখর। চলবে একদিন ধরে নাচ গান। সে উৎসব গ্রামের উৎসব। আমি হেসে বললাম, তাহলে আমি কি এখানে বাড়ি তৈরী শুরু করব নাকি? বললে তারা, মশাই, আজই শুরু করুন। আমরা সব রকমের সাহায্যই করব।

হাঙ্গেরি

হাঙ্গেরি বলতেই ভেসে আসে আমাদের স্মৃতিপটে ইতিহাস বিজড়িত ঘটনা। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের অনেক দেশেই শোনা যাবে, হাঙ্গেরি-ভ্রমণ মেরুপ্রদেশ ভ্রমণের মতনই রোমাঞ্চকর। তাদের মতে হাঙ্গেরি লৌহযবনিকার অন্তরালে। হয়ত পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো লৌহযবনিকার অন্তরালে, কিন্তু দেশগুলো আর দেশের মানুষগুলো নিশ্চয়ই লৌহনির্মিত নয়। দেশগুলো মাটিরই, মানুষগুলো মাটির মানুষই। তাই বলে কি হাঙ্গেরি পৃথক? নিশ্চয়ই নয়। হাঙ্গেরি দেশটাও মাটির, মানুষগুলো মাটির মানুষই। তাদের দেশের সরকার যে মতাবলম্বীই হোক না কেন, দেশের জনসাধারণ অন্য দেশের মতনই।

সেই মাটির দেশ হাঙ্গেরি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালিনী। প্রাকৃতিক সম্পদে দেশের নরনারীর সৌন্দর্য-শোভা যেন উপচে পড়ছে। সুন্দর দেশ হাঙ্গেরির নারীরাও সুন্দরী।

প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালিনী হাঙ্গেরির সরকার হয়ত

লৌহযবনিকার অন্তরালে, কিন্তু তাঁরা সম্পদ বৃদ্ধির কর্মপ্রচেষ্টা করে চলেছেন বিগত বিশ বছর ধরে। তার ফলে আর্থিক ও যন্ত্রশিল্পের উন্নতি হয়েছে অভূতপূর্ব। আর্থিক ও যন্ত্রশিল্পের উন্নতি নিজের চক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হবার উপায় নেই। শুধুই যন্ত্রশিল্পের • কৃষির উন্নতি হয়েছে অভাবনীয়। সে প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে যৌথখামারের প্রচেষ্টায়। হাঙ্গেরিতে সেই সেকেলে বনেদি ধনী সম্প্রদায় কিন্তু কৃষক, কলকারখানার শ্রমিকরা পেয়েছে জীবনধারণের সহজ পন্থা। দেশ হিসেবে হাঙ্গেরি পূর্বেও ছিল সম্পদশালী। দরিদ্রের সংখ্যা ছিল নগণ্য। কিন্তু বর্তমানে আর্থিক ভাগ-বাঁটোয়ারার ফলে দরিদ্ররা হয়েছে উন্নত, সে যুগের দরিদ্ররা পাচ্ছে নানান ধরণের সুখ-সুবিধে। হাঙ্গেরিয়ানরা এই ক'বছরেই কম্যুনিস্ট শাসিত আমলেই ভদ্র ও শিক্ষিত হয় নি। হাঙ্গেরি দেশটি ছোট্ট হলে হবে কি, বর্তমান সভ্যতায় এদের দান অনেক। এদের দান রয়েছে বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, আর্টে ও সঙ্গীতে। সত্যি কথা বলতে কি, হাঙ্গেরিতে আর যাই হোক, অর্থনীতিতে, যন্ত্রশিল্পে ও কৃষিতে এসেছে নতুন আলোড়ন।

হাঙ্গেরি সরকার কম্যুনিস্ট হলেও এখনও পর্যন্ত এদেশে রয়েছে সরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সমবায় প্রতিষ্ঠান ও কিছু ব্যক্তিগত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই সরকারের নয়। তেমনি কৃষিতে রয়েছে এখনও অনেক চাষীর নিজস্ব জমি। কিন্তু আস্তে আস্তে ব্যক্তি মালিকানার চাষীরা যৌথখামারে যোগদান করছে। কারণ যৌথ-খামারের জমিতে ফলন হয় বেশী। কৃষকের নিজস্ব ঝুঁকি কম। ব্যক্তিগত মালিকানা জমিতে কৃষককে খাটতে হয় বেশী ও ঝুঁকিও বেশী। যৌথখামারে পাওয়া যায় সরকারী ঋণ, যন্ত্রপাতির ঋণ ও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ।

বুদাপেস্ত থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে গিয়েছিলাম একটা যৌথখামার পরিদর্শন করতে। সল্ট নামে ছোট মফস্বল শহরকে

ঘিরে যে কটা গ্রাম, তাদের যৌথখামারের নাম শিক্রা। এই যৌথ-খামারের অধীনে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার একর জমি কর্ষিত হয়। যৌথখামারের সভ্য সংখ্যা হল ১৪০ জন। যৌথখামারের আয় অনুযায়ী একটি চাষীর মাসে রোজগার গড়পড়তা দুশো থেকে চারশো টাকা। ফসল তোলা বা রোপণের সময় কোনো কোনো চাষী প্রতিদিনে রোজগার করে ২৫ থেকে ৩০ টাকা। এই যৌথ-খামারে নিজস্ব সম্পত্তি হল দুটো ট্রাক্টর ও দুটো লরি। ফসল তোলার সময়ে বা অতিরিক্ত কাজের জন্যে আসে সরকারী ট্রাক্টর। জমিতে ঋতু অনুযায়ী চাষ হয় গমের, ভুট্টার, যব ও আলুর। যৌথ-খামারের জমিতে দেখলাম বড় বড় ভুট্টার গাছ। তারই পাশে দেখলাম ব্যক্তিগত মালিকানার জমির চাষ। সেখানে চাষী নিজে একলাই চাষ করছে। তার জমির ভুট্টার গাছ যৌথখামারের তুলনায় মলিন। এখনও হাঙ্গেরির সব জমিই যৌথখামারের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। এখনও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে সেকেলে ব্যক্তি মালিকানার জমি। প্রথমে ১৯৫১ সালে যখন এই যৌথখামারের প্রতিষ্ঠা হয় তখন তার সভ্য সংখ্যা ছিল মাত্র ২১ জন। আস্তে আস্তে চাষীরা যখন পেল নতুন আস্বাদ তখন তারা দলে দলে যোগ দিতে থাকে এই যৌথখামারে। হাঙ্গেরি কৃষিপ্রধান নয়, শিল্পপ্রধান দেশ। যন্ত্রশিল্পের উন্নতি এরা গত দশ বছরে যা করেছে তা সত্যি অভাবনীয়। এদের দেশে সব রকমের কাঁচামাল না থাকা সত্ত্বেও জাপানীদের মতন সব কিছুরই কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছে। ভারী যন্ত্রশিল্পে এরা ওস্তাদ। ভারতবর্ষের বাজারে হাঙ্গেরি ভারী যন্ত্র ছাড়া বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও বেচছে। যে সময়ে পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকায় চলছে আর্থিক দুরবস্থা, সে সময়ে হাঙ্গেরিতে দেখছি কারখানায় কারখানায় পুরোদমে কাজ। পশ্চিম ইউরোপের অনেক দেশেই বড় বড় কারখানায় কাজের অভাবে

বেকারি দেখা দিয়েছে, কিন্তু হাঙ্গেরিতে উল্টো, এরা কাজ শেষ করে উঠতে পারছে না।

হাঙ্গেরি যখন কম্যুনিস্ট শাসিত দেশ তখন তার সমাজ-বীমা ব্যবস্থাও ওই ধরণের। কিন্তু তা সত্ত্বেও ডাক্তাররা স্বাধীনভাবেও ব্যবসা করতে পারে। হাঙ্গেরির এক কোটি লোক সংখ্যার মধ্যে ষাট লক্ষই সমাজ-বীমার অধীনে। এখানে সমাজ-বীমা ব্যবস্থা করে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান, সরকার নয়। তাদের অধীনে আছে বাঁধা ডাক্তার। কোনো শ্রমিক ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন নিয়ে ওষুধের দোকানে ঔষধের যা দাম তার ১০% দাম দিয়ে ওষুধ কিনতে পারেন। রুগী ইচ্ছে করলে যে-কোনো বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে পারেন, তবে তাঁকে ফি দিতে হবে। এছাড়া রয়েছে প্রতিটি বড় বড় কারখানায় নিজস্ব বিশ্রামাগার। পাহাড়ের ওপরে বা হ্রদের ধারে আছে স্বাস্থ্যনিবাস। বালাতন হ্রদের ধারে দেখলাম সাংবাদিকদের জন্যে দুটো স্বাস্থ্যনিবাস। এখানে নামমাত্র খরচ দিয়ে সপ্তাহ বা মাসখানেক অবকাশ যাপন করা যায়। বলা বাহুল্য, ওই স্বাস্থ্য-নিবাস প্রতিষ্ঠা করেছে সাংবাদিক সংঘ। এমনি ধরণের স্বাস্থ্যনিবাস রয়েছে প্রতিটি সরকারী দপ্তরের—সেই সব দপ্তরের কর্মচারীরা যখন খুশী তাদের পরিবার নিয়ে ছুটি কাটাতে পারেন।

হাঙ্গেরিতে যা সমস্যা তা হল বাসস্থানের। বিশেষ করে বুদাপেস্ত শহরে তবে সরকার নতুন নতুন বাসস্থান নির্মাণ করে চলেছে।

সামাজিক সমস্যার মধ্যে সব চেয়ে বড় সমস্যা হল বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বিশেষ করে ১৯৪৯ সালের পর দেশে যখন নতুন নতুন শিল্প গড়ে ওঠে তখন অল্পবয়সে বিবাহের সংখ্যা বাড়তে থাকে। শিল্প ও কাজ বৃদ্ধি পাওয়াতে মেয়েরাও দলে দলে যোগ দেয় কাজে। সুতরাং ছেলেমেয়ে সবারই আছে পয়সা। আর্থিক দুশ্চিন্তা না থাকায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে

মনোমালিন্য বৃদ্ধি পেলে তারা অতি সহজে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে। তার ফলে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা অনেক বেশী। আর একটি সমস্যা হল পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা, কারণ, প্রথমতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দরুণ পুরুষ মরেছে বেশী ও দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক কারণে প্রচুর সংখ্যায় যুবকরা দেশ ত্যাগ করে চলে গেছে বিদেশে। সেই অনুপাতে মেয়েরা সংখ্যাধিক্য হাঙ্গেরিতে।

ভারতবর্ষে ছোট বড় শহরের সংখ্যা অগণ্য, কিন্তু ক'টা শহরে রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি দেখতে পাওয়া যাবে? হাঙ্গেরী ভারতবর্ষ হতে অনেক দূরে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা ও সম্মান সেখানে অতি উচ্চে। তার নিদর্শন স্বরূপ দেখতে পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি হাঙ্গেরির এক প্রান্তে বালাতন হ্রদের ধারে। ১৯২৬ সালে যখন কবিগুরু হাঙ্গেরী পরিদর্শনে এসেছিলেন তখন তিনি ক'দিন ছুটি কাটান বালাতন হ্রদের ধারে বালাতন ফুরাদ নামে ছোট্ট একটি গ্রামে। ওখানে তিনি তখন রোপণ করেন একটি চারাগাছ। সেই চারাগাছ এখন বিরাটকায় বৃক্ষ। ওই চারাগাছ রোপণকালে তিনি লিখেছিলেন যে, আমি হয়তো কিছুকাল পরে এই পৃথিবী হতে চলে যাব, কিন্তু আজ যে চারাগাছ এখানে রোপণ করলাম তা ভবিষ্যতে হবে পূর্ণ বৃক্ষ। এর আয়ু অনেকদিন। এই কটি কথা লেখা আছে ওই গাছের পাশেই। এখন ওই গাছটির তলায় স্থাপন করেছে হাঙ্গেরীর জনসাধারণ রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি। দেখে এলাম সেই চারাগাছ। আর তার ধার দিয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের নামে 'ট্যাগোর আলে' অর্থাৎ রবীন্দ্র রোড।

রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা দেখলাম হাঙ্গেরীর সর্বত্র।

বুদাপেস্ত

বুদাপেস্ত শহরের নামকরণ হয়েছে দু'টো উঁচু টিলার নাম থেকে। এ-দুটোকে পাহাড় না বলে বরং টিলা বলাই ভাল। সর্বোচ্চ টিলার নাম বুদা, অপরটি পেস্ত। এই বুদা ও পেস্তের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে দানিউব নদী। হাঙ্গারিয়ানরা বলে দুনা। বুদাপেস্ত শহরটিতে পাওয়া যাবে ভিয়েনার প্রতিচ্ছবি, কখনও মনে হবে যেন বসে আছি প্যারিসেই। পূর্ব ইউরোপীয় শহরগুলোর মধ্যে বুদাপেস্তই সবচেয়ে বেশী কলমুখর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ছিল রূপসী নগরী। কিন্তু এখন সেই রূপসী নগরী বুদাপেস্তের দেহের দিকে তাকালে শুধুই দেখা যাবে ক্ষতচিহ্ন। অত সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, কারুকার্যময় অট্টালিকাগুলো ক্ষতচিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কোন রকমে। অনেক প্রাসাদ তো এখনও ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে। বুদাপেস্তের বুকে যারা ক্ষতচিহ্নের দাগ কেটেছে তারা হল জার্মান ও রাশিয়ান সামরিক বাহিনী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে যখন রাশিয়ান সামরিক বাহিনী এসে দাঁড়ায় দানিউবের অপর পারে বুদা শহরে, তখন জার্মানরা দানিউবের অপর পারে দাঁড়িয়ে চালায় অবিরাম গোলাবারুদ। জার্মান ও রাশিয়ানদের লড়াইয়ে লাল হয়েছিল দানিউবের নীল জল। ধ্বংস হয়েছে বুদা ও পেস্তের সুন্দর সুন্দর বাড়িগুলো। আর অকারণে প্রাণ দিয়েছে হাঙ্গারিয়ানরা।

বুদাপেস্তকে ঘিরে রাজনৈতিক দলাদলির সৃষ্টি। এখানেই উত্থান ও পতন বিভিন্ন সরকারের। দেশ হিসেবে হাঙ্গেরি অতি ছোট্ট দেশ। তাই তাকে সইতে হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিদেশী সাম্রাজ্যের আক্রমণ ও শাসন। এদের ওপর আক্রমণ হয়েছে হুণ-তার্তারদের। তুর্কিরা এখানে শাসন করে দেড়শ বছর ধরে, তারপর অস্ট্রিয়া দুশো বছর ধরে। স্বাধীন হাঙ্গেরি-সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম মহাযুদ্ধের পর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত হয়

কোয়ালিশন সরকার। তারপর ১৯৪৮ সাল থেকে কম্যুনিস্ট সরকার। সেই থেকে হাঙ্গেরি হয়েছে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোর কাছে সমালোচনার বস্তু।

আপনারা হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন যে, ১৯৫৬ সালের অক্টোবর-নভেম্বর-এর রাজনৈতিক আন্দোলনের কোন স্মৃতিচিহ্ন আমি দেখেছি কিনা? ১৯৫৬ সালের বিপ্লব বা বিদ্রোহ যা হয়েছিল তা হয় সশস্ত্র। হাঙ্গারিয়ানদের রক্তপাতে দানিউবের নদীর নীল জল হয় লাল। চৌদ্দ-পনর বছরের ছেলে মেয়েরাও নেয় হাতিয়ার। সে ইতিহাস কেউ ভোলে নি। প্রথমে বুদা টিলার ওপরেই আরম্ভ হয় খণ্ড যুদ্ধ, তার সমগ্র শহরে ও তার শহরতলিতে ওই খণ্ড যুদ্ধে অনেক বাড়ি-ঘরই হয় ক্ষত বিক্ষত। কিন্তু ১৯৫৬ সালের স্মৃতি-চিহ্ন যাতে জনসাধারণের মন থেকে মুছে যায় তার জন্যে হাঙ্গেরিয়ান-সরকার অনেক প্রচেষ্টাই করেছেন। ওইসব বাড়ি-ঘর রাস্তাঘাট মেরামত করা হয় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই। সে দৃশ্য বাইরে থেকে দেখা যাবে না। কিন্তু এখনও অনেক বাড়ির ভেতরে পাওয়া যাবে তার স্মৃতিচিহ্ন। গোলাবারুদের আহত চিহ্ন বয়ে চলেছে এখনও অনেক বাড়ি-ঘরের আসবাবপত্র।

হাঙ্গারিয়ান-সরকারের মুখপাত্র মিঃ ইয়ারোশোভ-এর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে, ১৯৫৬ সালে যে ঘটনা ঘটে তা কি আন্তর্বিপ্লব না বিদ্রোহ? তিনি বলেন যে ওটা হল "কাউন্টার রিভ্যুলিশন" অর্থাৎ বিপ্লববিরোধী বিপ্লব। তিনি আরও বলেন ওই বিপ্লব ঘটে বিদেশী পুঁজিপতিদের প্রেরণায়। সুতরাং বিপ্লব-বিরোধী বিপ্লব দমন করতেই তাঁরা সোভিয়েত-বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানায়। তারপরেই সোভিয়েত-বাহিনীর সঙ্গে ঘটে সাক্ষাৎ লড়াই। তার বিনিময়ে দিতে হয় হাজার হাজার হাঙ্গারিয়ানদের প্রাণ, হাজার হাজার হাঙ্গারিয়ান হয় বিদেশে উদ্বাস্তু।

কিন্তু হাঙ্গারিয়ান জনসাধারণের মতে তারা লড়েছে রুশদের বিরুদ্ধে। তারা কম্যুনিজম-এর বিরোধী নয়। তাঁরা হচ্ছেন সোভিয়েত রাশিয়ার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। সোভিয়েত রাশিয়া তাদের নিজস্ব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুক এ তাঁরা চান না। এখানেই তাঁদের বিরোধ। এ-ছাড়া আরও অনেক কারণ আছে।

হাঙ্গেরি দেশটা ছোট্ট হলেও কিন্তু সাংঘাতিকভাবে উন্নত। বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পে হাঙ্গেরি অতি উন্নত দেশ। হাঙ্গেরি অন্য পূর্ব-ইউরোপীয় দেশ যেমন, বুলগারিয়া বা রুমানিয়ার মতন অনুন্নত নয়। হাঙ্গেরির জনসংখ্যা এক কোটি, কিন্তু তার এক কোটি জনসংখ্যার প্রায় পনর লক্ষই বসবাস করে বুদাপেস্ত শহরে। বিশ্বসাহিত্য, বিজ্ঞান ও আর্টে রয়েছে হাঙ্গারিয়ানদের প্রচুর দান। এ-অবদান ভুলবার নয়। এহেন একটি দেশকে অন্য দেশের মতন দাবিয়ে রাখা যায় না। কম্যুনিস্ট পন্থায় পূর্ব ইউরোপের সব দেশেই এনেছে অভূতপূর্ব আর্থিক উন্নতি। সে-বিষয়ে সবাই একমত। হাঙ্গেরির বেলাও তাই। হাঙ্গেরিতে এখন প্রচুর নতুন নতুন যন্ত্র-শিল্প স্থাপিত হয়েছে। সাধারণ লোকের আর্থিক অভাব নেই। কিন্তু যে জিনিসটির অভাব তা হল ব্যক্তি-স্বাধীনতার। কম্যুনিস্ট-নীতিতে সব কিছুই হতে হবে কম্যুনিস্টপন্থী। শিল্প, সাহিত্য, সংগীত সবই হবে কম্যুনিস্টপন্থী। এখানেই হয়েছে গোল। আগেই বলেছি হাঙ্গেরি দেশটি ছোট্ট হলে কি হবে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, সংগীতে বিশেষ উন্নত। কিন্তু বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও শিল্পী কোন বাঁধাধরা বা এক চিন্তায় বা পন্থায় চলতে নারাজ। হাঙ্গারিয়ান শিল্পী-সাহিত্যিক-বিজ্ঞানীরাও এই কম্যুনিস্টপন্থী একবগ্‌গা চিন্তাধারার বিরুদ্ধে তাঁরা চান ব্যক্তি স্বাধীনতা। এখানেই তাঁদের সঙ্গে সরকারের বিরোধ। এবং তাঁরাই জনসাধারণকে উৎপ্রেরণা দিয়েছেন এ-বিষয়ে। এ অতি স্বাভাবিক। জনসাধারণ সন্তুষ্ট তাঁদের দৈনিক জীবিকা নির্বাহে। তাঁরা তা পান অতি সহজে। সে-দিকে সরকারের নেই কোনই

কার্পণ্য। কিন্তু খাওয়া ও শোয়াই নয় মানুষের জীবনে মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহলে পশুর সঙ্গে মানুষের তফাত কোথায়। আজ যে সমস্যা দেখা দিয়েছে হাঙ্গেরিতে কাল তা দেখা দেবে কম্যুনিস্টপন্থী অন্য দেশে। কারণ, যখনই আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে তখনই দেখা দেবে সূক্ষ্ম অনুভূতির চাহিদা এবং তা হল স্বাধীন শিল্প ও সাহিত্য।

হাঙ্গেরিতে দেখছি ভারতবর্ষের নামে জাদুমন্ত্র আছে। যে কোনো হাঙ্গারিয়ান জনসাধারণই ভারতবর্ষের প্রতি আস্থাশীল। এরা সত্যিই ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধা করে বিভিন্ন কারণে। প্রথমে হল রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিতীয় গান্ধী। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্য বলতে এঁরা জানেন ভারতীয় দর্শন ও রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী।

ইদানীং কালে যিনি বিশেষ সম্মানলাভ করেছেন তিনি হলেন প্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী কে, পি, এস, মেনন। শ্রী কে, পি, এস, মেনন মস্কোস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত, তিনি হাঙ্গেরিরও। শ্রী কে, পি, এস, মেনন ও ভারত-সরকারের প্রতি হাঙ্গারিয়ানরা কৃতজ্ঞ এই জন্যে যে, ১৯৫৬ সালের ঘটনার সময়ে আমাদের রাষ্ট্রদূত শ্রী কে, পি, এস, মেনন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অনেক বালক বালিকার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। শ্রী কে, পি, এস, মেননের বুদ্ধিমত্তায় ও হৃদয়বত্তার জন্যে অনেক হাঙ্গারিয়ান রক্তপাত থেকে বেঁচেছেন। তার জন্যে প্রচুর সংখ্যক হাঙ্গারিয়ান শ্রী কে, পি, এস, মেনন ও ভারত-সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। এতে হাঙ্গেরিতে ভারতবর্ষের সম্মান অনেক উঁচুতে উঠেছে।

আগেই বলেছি হাঙ্গারিয়ানরা শিক্ষিতের জাত। সাংস্কৃতিক ছাপ পাওয়া যাবে দৈনিক জীবনের লালনক্ষেত্রে। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ওরা জানতে অতি আগ্রহশীল। কিন্তু তাঁদের হাতে পৌঁছে দেবার মতন নেই কোনো প্রতিষ্ঠান। এখানকার সবচেয়ে বড় দৈনিক সংবাদপত্র 'নেবসাবজাগ' আমাকে অনুরোধ জানায় আমাদের পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনা সম্বন্ধে লিখতে। আমি একটি ছোট্ট প্রবন্ধ

তাদের দিই এবং ওটা ছাপা হয়েছে "পরিবর্তনের মুখে ভারতীয় অর্থনীতি" এই নামে। এর পরেও ওই সংবাদপত্র আমায় আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে লিখতে ও মাল-মশলা পাঠাতে অনুরোধ করে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে-দেশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত ভালবাসা ও উচ্চ ধারণা সে দেশেই নেই ভারত-সরকারের দূতাবাস। যা আছে তা হল লিগেশান। লিগেশানে মাত্র দু জন ভারতীয় কর্মচারী। যে-দেশের সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতা তিক্ততাপূর্ণ, যেমন— বৃটেন, সেই দেশে ভারতীয় দূতাবাসে রয়েছে হাজার হাজার কর্মচারী. কিন্তু যে-দেশে ভারতের সম্মান অনেক উচ্চে. সে দেশে কর্মচারির সংখ্যা মাত্র দু'জন। হাঙ্গেরীর সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক যোগাযোগে আমরা দুই দেশই লাভবান হব। এ-বিষয়ে ভারতীয় নেতারা একবার ভেবে দেখতে পারেন।

চেকোশ্লোভাকিয়া

সুন্দরী প্রাগ : ইউরোপে যে কটা নগরীর সৌন্দর্য খ্যাতি আছে প্রাগ তাদের মধ্যে একটি। ভিয়েনা, বুদাপেস্ত আর প্রাগ—এই তিন নগরীর স্থপতি-সৌন্দর্য একসূত্রে গাঁথা। এই তিন নগরী দুই কি তিন শতক ধরে একই সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। অস্ট্রো-হাঙ্গারিয়ান সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল প্রাগ। তাই বারোক্ শিল্পকলার নিদর্শন দেখা যাবে প্রাগের অসংখ্য অট্টালিকার গায়ে। পুরোনো প্রাগের 'মালাস্ত্রানুহা', 'রাজহানি' বা যে-কোনো পুরোনো পাড়ার বাড়িঘরের বাইরের অসংখ্য দেয়াল-চিত্র, ভাস্কর্য দেখে মুগ্ধ হয়।

প্রাগ শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে ব্লাতাভা-নদী। তার বাঁ ধার দিয়ে টিলার ওপর 'রাহাজখানি' পাড়া। 'রাহাজখানি' পাড়ায়

এককালে ছিল রাজদরবার। তাই সেখানে প্রাসাদের ছড়াছড়ি। তারই একটি 'চেরনেস্কি' প্রাসাদে পররাষ্ট্র-দপ্তর। পররাষ্ট্র দপ্তরের ডাঃ নেৎরেডাল বলছেন, হোটেলে যাবার পথে এখান দিয়ে পায়ে হেঁটে যান। যানবাহন নেবেন না। তাঁর কথামতন পায়ে হেঁটে রওনা হলাম। অলিগলি যত দেখি ততই মুগ্ধ হই পুরোনো প্রাগের স্থপতিশিল্প ও ভাস্কর্য দেখে। চেকোশ্লোভাকিয়ার সংস্কৃতিজীবন সত্যি উন্নত। এদের সঙ্গীত, আর্ট ও সাহিত্য সর্বজনবিদিত। তারই ছাপ মিলবে প্রাগ শহরের বুকে। চেকোশ্লোভাকিয়া দুই ভাষীর দেশ। চেক্ ও শ্লোভাক ভাষীর। চেক ভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের প্রধান নগর ও রাজধানী প্রাগ শ্লোভাকবাসীরা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ, তাদের প্রধান নগর ও রাজধানী ব্রাতিস্লাভা। তবে অনেক টুরিস্টের কাছে প্রাগের চেয়ে ব্রাতিস্লাভা বেশী পছন্দ। কারণ শ্লোভাক লোকগুলো চেকদের চেয়ে বেশি মিশুকে।

একই মাসে দুবার প্রাগ বিমানবন্দরে ওঠানামা করতে হল। লাইপজিগের পথে প্রথমে দুইদিন, আবার বার্লিন থেকে প্যারিস ফেরার পথে এক সপ্তাহ। প্রথমবার যখন প্রাগে পৌঁছলাম তখন চারধারে বরফের পুরু আস্তরণ। বিমানবন্দরের আশেপাশের গ্রাম থেকে ছেলে-বুড়োর দল স্কী করে রাস্তাঘাট পার হচ্ছে। খাস প্রাগ শহরের বুকে মাঠেঘাটে দেখেছি ছেলে-মেয়ের দল বরফের ওপর খেলছে 'আইসহকি', 'স্কেটিং' নয়তো চালাচ্ছে স্লেজ। আর প্রাগ শহরের নদী ব্লাতাভা তখন জমে বরফ। দ্বিতীয়বার যখন প্রাগে এলাম তখন ব্লাতাভা নদীর বরফ গলেছে বটে কিন্তু তুষারপাত কমে নি। একে তুষারপাত তার ওপর বৃষ্টি! প্রাগ শহরের বুকে এমনিতেই যেমন ঝাঁট পড়ে না তার ওপর আসে তার আশপাশ থেকে কলকারখানার ধুলো। বর্ষাকালে কলকাতার রাস্তায় যে অবস্থা, ঠিক তেমনি প্রাগে। কাদা আর কাদা। এই ঠাণ্ডায় প্রাগ শহরে বাড়িঘর গরম করার আয়োজন ব্যর্থ হয়। কয়লার অভাব।

তাই বড় রাস্তার ধারে চারটে আলোর জায়গায় জ্বলতে দেখেছি একটা আলো। আমার হোটেলে সমস্ত দিনের মধ্যে মাত্র দু ঘণ্টা ঘর গরম করা হত। কারণ কয়লা নেই। শিল্পোন্নত চেকোশ্লোভাকিয়ার কী দুর্দশা। এরা বাইরে যত ধনী বলে পরিচিত, নিজেদের দেশে কিন্তু ততটা নয়। চেকোশ্লোভাকিয়ার বাইরে চেক্ প্রকাশিত বই ও পত্র-পত্রিকাগুলোর ছাপা সুন্দর ছাপা। চেক্‌বাসীদের জন্যে পত্র-পত্রিকা অতি হালকা। প্রধান সংবাদপত্র 'রুডেপ্রাভো' মাত্র চার পৃষ্ঠার পত্রিকা। অন্যান্য খ্যাতনামা সাপ্তাহিক যেমন, 'কুলচুরনি স্তাবারবা', 'লিতেরারনি নভিনি' এবং অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক 'হোস্-বোদারস্কে নভিনি' পত্রিকা দশ থেকে ষোল পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ। দৈনিক 'রুডেপ্রাভো' পত্রিকা একে চার পৃষ্ঠা তার ওপর রসকশহীন। খালি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংবাদে ভরপুর। সেই পত্রিকা বাজারে বেলা দশটার পর পাওয়া যায় না। সান্ধ্য পত্রিকাটা আয়তনে আরও ছোট। সেটা প্রকাশিত হয় বিকেল সাড়ে চারটা-পাঁচটার সময়। প্রাগে অফিস-আদালত বসে সকাল আটটা-সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত। তাই অফিস-ফেরত গৃহাভিমুখী চেক্‌বাবুর দল সান্ধ্য-পত্রিকা চিলের মতন ছোঁ মেরে নিয়ে যায় দেখেছি। এক ঘণ্টার মধ্যে সান্ধ্য-পত্রিকা আর রাস্তার ধারের কিয়স্কে দেখা যায় না।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় সাংবাদিক বৃত্তি এবং লেখকবৃত্তি শুধু সম্মানিত নয় বেশ অর্থকরীও। পররাষ্ট্র দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, রাষ্ট্রদূতের দল সরকারী চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে এখন সাংবাদিকতা করছেন দেখে এলাম।

কম্যুনিস্ট শাসিত প্রতিটি ইউরোপীয় রাষ্ট্র আমি দেখেছি। ওই সব রাষ্ট্রের অফিস-আদালতে প্রবেশ করতে হলে পরিচয়পত্র এবং আরও অনেক কিছু দেখাতে হয়। সব জায়গায় কড়াকড়ি। কিন্তু প্রাগের দৈনিক 'রুডেপ্রাভো' পত্রিকা-অফিস তাদের হার মানিয়েছে।

"রুডেপ্রাভো" পত্রিকা-অফিসের প্রবেশদ্বারে দুই মহিলা প্রহরী পিস্তল কোমরে বেঁধে পাহারা দিচ্ছে। তারা দুইজনেই "পিপলস্ মিলিশিয়ার" কর্মচারী। অফিসে প্রবেশ করতে আর বেরুতে হলে দুবার করে কার্ড দেখাতে হয়। যাই হোক রুডেপ্রাভোর কাজ সেরে 'চেৎকা' সংবাদ প্রতিষ্ঠানে গেছি। সেখানে এক চেক সাংবাদিক বন্ধু আমায় নির্দেশ দেয় প্রাগের আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সংস্থা অফিস পরিদর্শনে। বন্ধুবর যে ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন সেই ঠিকানা রাস্তার অনেককে দেখালাম। কেউ রাস্তা বাৎলাতে পারে না। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমায় ইংরাজীতে বললেন, আরে রাম রাম, এই নামে রাস্তা বেশি কেউ জানে না। তিনি মুচকি হেসে কানে কানে বললেন, স্তালিন বেঁচে থাকতে এই রাস্তার নাম ছিল 'স্তালিনরাদস্কা', এখন নাম হয়েছে 'ভিনোরাদস্কা'। একালের ছেলেছোকরারা নতুন রাস্তার নাম জানে না। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে রাস্তাঘাটেরও নাম বদলায় বৈকি। এখন চলছে চেকোশ্লোভাকিয়ায় স্তালিনের শ্রাদ্ধ আর ক্রুশ্চেভের দিগ্-বিজয়। ক্রুশ্চেভের পর আবার পট পরিবর্তন! কমুনিস্ট রাজনীতির এখানেই বিশেষত্ব।

চেক্ সরকারকে নতুন রোগে ধরেছে। যেখানেই গেছি সেখানে বড় বড় অক্ষরে লেখা "কুরেনি জাকাজানো" অর্থাৎ ধূমপান নিষেধ। এক রেস্তোরাঁয় খেয়েদেয়ে সবে সিগারেট ধরিয়েছি, অমনি পরিচারিকা কটমট করে আমার দিকে তাকিয়েছে। আমার টেবিলের খদ্দের বললেন, আরে রেখে দাও সরকারী নীতি, সিগারেটটা টেবিলের নিচে হাতে রাখ আর মাঝে মাঝে টান দাও। চেক্-সরকার খুব প্রচার চালিয়েছে ধূমপানের বিরুদ্ধে। ধূমপানে নাকি ক্যান্সার হয়।

এক চেক্ সাংবাদিক বন্ধু আমাকে প্রাগ ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। তার সঙ্গে আলাপ হয় প্যারিসে। এখন তিনি পররাষ্ট্র দপ্তরের

কর্মচারী। তিনি কথায় কথায় বলেই ফেললেন, কেমন দেখছ আমাদের মেয়েদের? লৌকিকতার বালাই ছেড়ে বললাম, চেক্ মেয়েদের সৌন্দর্য ইউরোপবিদিত। চেক্‌রা জাতে স্লাভ এবং তাদের সঙ্গে জার্মান রক্তের সংমিশ্রণে চেকদের সৌন্দর্য আরও খুলেছে।

প্রাগের একটা স্কুল পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। ওখানে বিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য কোন বেতন দিতে হয় না। এমন কি স্কুলের ছেলে-মেয়েরা নামমাত্র মূল্যে দুপুরের খাবার, পায় শিক্ষকদের মাইনে পাঁচশ থেকে হাজার। বিজ্ঞান, অঙ্ক, ভূগোল ও ইতিহাসের বইগুলো এতই রঙচঙে ও সচিত্র যে ছোট ছেলে-মেয়েরা নিজেরাই আগ্রহে লেখাপড়া শেখে। বইগুলো সত্যিই লোভনীয়। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের বইগুলো যেন কাঠ-খোট্টা, নীরস।

আরেকদিন দেখি ইরিএঙ্কার পুতুল নাচের স্টুডিও। সে এক বিরাট ব্যাপার। প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় ওরিয়েন্টাল ইনস্টিট্যুটের বাংলা বিভাগ দেখলাম। সেখানে আলাপ হল বাংলা ভাষার অধ্যাপক মিঃ দুসানজাভাতিলির সঙ্গে। তাঁর দুই ছাত্রীর সঙ্গে বাংলায় কথা বলে আনন্দ পেলাম। এরা বাংলা মন্দ বলে না।

✱ চীনের ভারত আক্রমণের পর থেকে কম্যুনিস্ট শিবিরে একটু পরিবর্তন এসেছে। সেটা দেখলাম পূর্ব-জার্মানী ও চেকোশ্লো-ভাকিয়াতে। প্রথমবার যেদিন প্রাগ ছেড়ে লাইজিগের পথে রওনা হই সেদিন প্রাগ-বিমানবন্দরে একদল চীনা রাজকর্মচারীর সঙ্গে দেখা। তারা আমার পরিচয় জেনে আমাকে মারতে আসে এমনিভাব তাদের চোখে। চীনের ভারত আক্রমণ সম্পর্কে এক চেক্ পদস্থ-কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাদের কী মতামত। তিনি বলেন যে, চীনের সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ার সম্পর্ক

নাকি বছর দুই ধরে ভাল যাচ্ছে না। কারণ প্রধানমন্ত্রী নভৎনি আসার আগে চেকোশ্লোভাকিয়া ছিল স্তালিন মাও সে-তুংপন্থী। এখন ক্রুশ্চেভের চাপে পড়ে চেকোশ্লোভাকিয়া তাদের ভোল পাল্টাতে বাধ্য হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নভৎনি হলেন ক্রুশ্চেভপন্থী। তাই আজ চেকোশ্লোভাকিয়া চীনপন্থী নয়। কিন্তু চেক্‌রা ব্যবসায়ীর জাত। আগে চেকোশ্লোভাকিয়া চীন ও ভারতকে প্রচুর মাল বেচত। তবে চীনকে বেচত অস্ত্রশস্ত্র আর ভারতকে যন্ত্রপাতি। চীনের ভারত আক্রমণে তাদের ব্যবসায় একটু ভাঁটা পড়েছে বলে দেখলাম ওরা ভারত ও চীনের প্রতি অসন্তুষ্ট। চেকোশ্লোভাকিয়া যা উৎপাদন করে তার ৩০% ভাগ যায় রাশিয়ায়, ৩০% ভাগ অন্যান্য কম্যুনিস্ট দেশে (চীন শুদ্ধ) আর বাকি ৪% ভাগ ওরা বেচে ভারতের মতন নিরপেক্ষ অন্যান্য দেশে। চেকোশ্লোভাকিয়া যন্ত্রশিল্পে বেশ উন্নত। কম্যুনিস্ট দেশে ওদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে পূর্ব-জার্মানীর সঙ্গে। তবে চেক্ যন্ত্রশিল্প থেকে ভারতের অনেক কিছু শেখার আছে।

চেক্‌দের সঙ্গে ফরাসীদের অনেক মিল আছে দেখলাম। ফরাসীদের মতন ওরাও বেশ স্বার্থকেন্দ্রিক। অন্যান্য স্লাভ দেশের মতন অত অতিথিপরায়ণ নয়। সামনে বলে এক কথা পেছনে আর এক কথা। তবে ওরা ব্যবসা ভাল বোঝে। কম্যুনিস্ট দেশে চেক্‌রাই ব্যবসায়ী। ওদের মনের কথা হল এই, "ফেল কড়ি মাখ তেল—আমি কি তোমার পর।"

পূর্ব ইউরোপের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক জোট

পশ্চিম ইউরোপে যখন ছয় ও সাতের মধ্যে চলেছে বাণিজ্যিক লড়াই তখন পূর্ব ইউরোপে কম্যুনিস্ট দেশগুলো নিয়ে গঠিত হয়েছে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক জোট। এদের মধ্যে অবশ্য ছয় ও সাতের লড়াই নেই। পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলোর যেমন 'ওয়ারশ প্যাক্টে' সামাজিক চুক্তিতে গ্রথিত হয়েছে তেমনি এরা এক অর্থনৈতিক সংস্থাও গড়ে তুলেছে। এই অর্থনৈতিক দলের সভ্যরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রধানতঃ এদের সভ্য দেশের মধ্যে।

ধনতান্ত্রিক বা চিরাচরিত প্রথায় দেশের অর্থনীতি এবং কম্যুনিস্ট দেশের অর্থনীতি এক নয়। বরং উল্টো ধনতান্ত্রিক বা চিরাচরিত প্রথায় দেশে চলে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের স্বাধীন ব্যবসা। কম্যুনিস্ট শাসিত দেশে রাষ্ট্রই হল ব্যবসা-বাণিজ্যের শিল্পের মালিক। ধনতান্ত্রিক দেশে শিল্প-বাণিজ্যের মালিকরাই সাধারণতঃ ব্যবসার নীতি নির্ধারণ করে। কম্যুনিস্ট শাসিত দেশে করে রাষ্ট্র। এখানে ব্যবসায়ীর ইচ্ছে মতন বা সুবিধে মতন কলকারখানা বা বাণিজ্য করা চলে না। রাষ্ট্র সবই পরিকল্পনা করে। সে হল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। কারুর ইচ্ছায় নয়। সে পরিকল্পনা রচিত হয় রাষ্ট্র কর্তৃক।

পশ্চিম ইউরোপে 'অর্গানিজেশন ফর ইউরোপীয়ান ইকনমিক কো-অপারেশন' সংগঠিত হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। আসলে এর নাম ছিল 'মার্শাল প্ল্যান'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'মার্শাল প্ল্যানে'র নামে আর্থিক সাহায্য দিয়েছে পশ্চিম ইউরোপের শিল্পপ্রধান দেশগুলিকে। তাদের মধ্যে অন্যতম বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইতালি প্রভৃতি। সেই মার্শাল প্ল্যানই পরে 'অর্গানিজেশন ফর ইউরোপীয়ান ইকনমিক কো-অপারেশন' নামে পরিচিত হয়। এই আর্থিক সংস্থার কাজ হল পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক একতা গড়ে

তোলা। ঠিক এমনি একটি আর্থিক সংস্থা গড়ে ওঠে পূর্ব ইউরোপের সোভিয়েত ইউনিয়নের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৪৯ সালে ২৫শে জানুয়ারি। এই সংস্থার সংক্ষেপ নাম 'কোমেকন'।

'কোমেকনে'র কাজ ছিল প্রথম প্রথম আর্থিক সাহায্য দান। তারপর ১৯৫৩ সাল থেকে এই সংস্থা পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট দেশগুলোর মধ্যে গড়ে তোলে অর্থনৈতিক ঐক্য। ১৯৫৪ সাল থেকে এই সংস্থাই নির্ধারণ করে আসছে কোন সভ্য দেশের পক্ষে কী ধরণের কারিগরী সাহায্য দেওয়া উচিত বা কোন দেশ অন্য সভ্য দেশকে কিভাবে সাহায্য করতে পারে। এই সংস্থাই এখন বাতলে দেয় কোন দেশের পক্ষে কোন ধরণের শিল্প সুরু করা উচিত। কারণ কম্যুনিস্ট অর্থনীতির মতে এক এক দেশের পরিকল্পনা অনুসারে অর্থনীতি গড়ে ওঠা উচিত; এবং তা নির্ধারণ করে এই কোমেকন। কোমেকন সংস্থার ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তার বিভিন্ন সভ্য দেশকে প্রায় নয় হাজার পরিকল্পনা কয়েক হাজার টেকনিসিয়ান জুগিয়েছে একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন। তারপর স্থান পেয়েছে চেকোশ্লোভাকিয়া ও পূর্ব জার্মানী। কোমেকন আর্থিক সংস্থার সভ্য দেশগুলো পরিকল্পিতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করে। একটি দেশ অন্য সভ্য দেশের ওপর নির্ভরশীল। যাতে এদের স্বার্থে সংঘাত না হয় তার জন্যে এক-একটি দেশের পক্ষে শিল্পজাত উৎপাদনের হার ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এই সব দেশগুলোর মধ্যে যাতে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক পরস্পর নির্ভরতার ভিতর দিয়ে রাজনৈতিক মৈত্রী আরও ঘনীভূত হয় সেই দিকে সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। কোমেকন শুধু আর্থিক বা বাণিজ্যিক সংস্থা নয়, এর প্রধান কাজ হল আর্থিক ও যান্ত্রিক সহযোগিতা। ওরা মনে করে যে, অর্থনৈতিক ও যান্ত্রিক সহযোগিতার মধ্য দিয়েই কম্যুনিস্ট দেশগুলো তার শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি করবে দ্বিগুণ। এরা আরও মনে করে যে, পূর্ব ইউরোপের কোমেকন

দল সমগ্র বিশ্বের শিল্প উৎপানের অর্ধেক উৎপাদন করতে সমর্থ হবে। তার ফলে এদের আয়ও বাড়বে এখনকার তুলনায় দ্বিগুণ।

কোমেকন সংস্থা এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কোন্ দেশ কোন্ কোন্ শিল্পে আত্মনিয়োগ করবে তার বিবরণ দেওয়া গেল।

জাহাজ নির্মাণ: পোল্যাণ্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বুলগারিয়া, রুমানিয়া। রেলের যন্ত্রপাতি: পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানী, বুলগারিয়া। কাঠ কাটার যন্ত্রপাতি: চেকোশ্লোভাকিয়া ও পূর্ব জার্মানী। ইস্পাত কারখানার যন্ত্রপাতি: পূর্ব জার্মানী। ডিজেল মোটর: পূর্ব জার্মানী ও চেকোশ্লোভাকিয়া। ইলেকট্রিক মোটর: পূর্ব জার্মানী, বুলগারিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ড। পেট্রোল কারখানার যন্ত্রপাতি: সোভিয়েত ইউনিয়ন ও রুমানিয়া। হাল্কা কারখানার যন্ত্রপাতি: পূর্ব জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ড। ছাপাখানার যন্ত্রপাতি: পূর্ব জার্মানী। লরী: সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গারি। মোটর গাড়ি: হাঙ্গারি, চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানী ও পোল্যাণ্ড। বাস: হাঙ্গারি, চেকোশ্লোভাকিয়া। মোটর সাইকেল: চেকোশ্লোভাকিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব জার্মানী, হাঙ্গারি, পোল্যাণ্ড। চাষের যন্ত্রপাতি: সোভিয়েত ইউনিয়ন, হাঙ্গারি, বুলগারিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া। ট্রাকটর: সোভিয়েত ইউনিয়ন, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গারি।

ছয় ও সাতের লড়াই

রাজনৈতিক পটভূমিকায় ইউরোপ দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব ও পশ্চিম। পূর্ব ইউরোপ বলতে বোঝায় কম্যুনিস্ট ইউরোপ। পশ্চিম-বলতে তথাকথিত গণতান্ত্রিক ইউরোপ বোঝায়। কম্যুনিস্ট ইউরোপ আর অকম্যুনিস্ট ইউরোপের ঠাণ্ডা লড়াই সুরু হয়েছে ৯৪৭ সালের পর থেকে। এর মধ্যে পশ্চিম ইউরোপে আবার বিভাগ।

পশ্চিম ইউরোপের ছয়ের দলকে বলা হয় কমন মার্কেট দল। এই দলে আছে পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, লুকসেমবুর্গ ও হল্যাণ্ড। ছয়ের দলের জন্ম হয়েছে ১৯৫৭ সালের পঁচিশে মার্চ তারিখে রোম শহরে। একে রোম চুক্তির দলও বলা হয়। ছয়ের দলে ইচ্ছে করেই বৃটেনকে বাদ দেয় তাদের উন্মুক্ত বাজার থেকে। এতে নাকি ফ্রান্সের হাত ছিল। সেই থেকে সুরু হয় ফ্রান্স-জার্মানীর সঙ্গে বৃটেনের মনোমালিন্য। এবং ওই কারণেই বৃটেনও একটি অর্থনৈতিক দল গড়ে তোলে যার নাম সাতের দল। সাতের দল জন্ম নেয় ১৯৫৯ সালের বিশে নভেম্বর স্টকহোমে। সাতের দলে আছে অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, নরওয়ে, পর্তুগাল, বৃটেন, সুইডেন ও সুইৎজারল্যাণ্ড। ছয়ের দলের সঙ্গে সাতের দলের প্রধান পার্থক্য হল এই যে, ছয়ের দলে সব সভ্যই উত্তর আতলান্তিক চুক্তির সভ্য। কিন্তু সাতের দলে অস্ট্রিয়া সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ড উত্তর আতলান্তিক চুক্তির সভ্য নয়, তারা নিরপেক্ষ। আর এই সাত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা ও পার্থক্য অনেক। ছয়ের দলে ছয়টি রাষ্ট্রই এর তার গায়ে ঘেঁষা। সাতের বেলায় তা নয়—পর্তুগালের সঙ্গে সুইডেনের, বৃটেনের সঙ্গে অস্ট্রিয়ার দূরত্ব অনেকখানি। তাই তাদের প্রধান সমস্যা হল শুল্কের ব্যাপারে বাধা বিপত্তি। কারণ, এদের এই ছয়ের দলের শুল্ক সীমানা পার হতে হয়। সোজা যাবার জো নেই। এই ছয়ের দলের কাজ কর্ম সম্পর্কে কিছু বলি। প্রথমত

হল এই ছয় রাষ্ট্র একই হারে শুল্কনীতির প্রবর্তক। এদের দলে চলবে, ব্যবসা-বাণিজ্য, একই রাজনীতি। আস্তে আস্তে এরা. বাণিজ্যিক সম্বন্ধ করবে উন্মুক্ত। আগামীবার থেকে ১৫ বছরের মধ্যে ছয়ের দল এদের সভ্য দেশের মধ্যে শুল্ক একেবারে তুলে দেবে বলে স্থির করেছে। প্রথম ধাপে শুল্ক উন্মুক্ত হবে শতকরা তিরিশ ভাগ, পরের ধাপে চল্লিশ ভাগ আর ১৯৭ সালে একেবারেই শুল্ক তুলে দেওয়া হবে। এরা ঠিক করেছে যে প্রতি বছরে বাণিজ্যের বহর বাড়বে শতকরা কুড়ি ভাগ করে।

যাতে এই ছয় রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক রেষারেষি বা ডাম্পিং না হয় তার জন্যে সব সময়েই এই দলের রাষ্ট্রনেতারা মিলিত হবেন এবং নিয়মিত পরামর্শ করবেন। উপরন্তু এই ছয় দলের মধ্যে যাতে সহজভাবে শ্রমিকেরা যাতায়াত করতে পারে এবং কাজকর্মের সুবিধা ভোগ করতে পাবে তার ব্যবস্থা করবে এই দলের কার্য-নির্বাহক সমিতি। ছয়ের দলকে শক্তিশালী করার জন্য এরা প্রস্তাব করেছে যে, এদের মধ্যে যাতে সব সময়েই একই রাজনীতি বর্তমান থাকে, থাকে সদ্ভাব সে চেষ্টা করা। যদি কখনো এদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে সে বিরোধের নিষ্পত্তি করবে এদের নির্বাচিত সর্বোচ্চ আদালত। সাতের দলকে বলা হয় 'ফ্রি এক্সচেঞ্জ' দল। এদের নেতা বৃটেন, এ দলের সভাব ঠিক করেছে যে, আপাততঃ এদের সভ্যদেশ তাদের নিজেদের শুল্কনীতি বজায় রেখে চলবে। এদের মধ্যে রাজনৈতিক পার্থক্য থাকলেও বাণিজ্যিক নীতি হবে এক। সাতের দল এও স্থির করেছে যে, ১৯৭০ সালে তাদের সভ্য দেশের মধ্যে শুল্ক তুলে দেওয়া হবে। তবে শুল্ক প্রথা ধাপে ধাপে নামবে। ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে শতকরা বিশ ভাগ শুল্ক তুলে দেওয়া হয়, তারপর আটটা ধাপে দশ ভাগ করে শুল্ক তুলে দেওয়া হবে। ছয়ের দলের মতই এই দলেও প্রতি বছরে শতকরা বিশ ভাগ করে বাণিজ্যের বহর বাড়বে।

সাতের দলের কার্যনির্বাহক সমিতিও মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখবে যে, এদের মধ্যে কেউ একচেটে ব্যবসা করছে কিনা, কেউ দল বাঁধছে কিনা বা ডাম্পিং করছে কিনা। তাহলে সমিতি তাদের সাবধান করে দেবে। তবে সাতের দলে এখনও এমন কোনো ব্যবস্থা করা হয় নি যাতে এদের সভ্য দেশের শ্রমিকেরা এখনই কাজকর্মের জন্য স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারবে। এদের এখনও কোনো দলের কেন্দ্রীয় বা উন্নয়ন ব্যাঙ্ক সৃষ্টি হয় নি।

সাতের দলে এদের সরকারের মন্ত্রীরা নিয়মিত মিলিত হবে এবং তারাই কার্য-পদ্ধতির প্রস্তাব পেশ করবে এবং সেই প্রস্তাব গৃহীত হলে তা চালু করবে কার্যকরী সমিতি। এই দলে যদি কখনো মতান্তর বা বিপত্তি দেখা দেয় তা হলে যে-কোনো একটি সভ্য দেশ সভা ডেকে মিটমাট করবে বা ইচ্ছে করলে ছেড়ে চলে যেতে পারবে।

আপাতঃদৃষ্টিতে দেখা যায় যে, এই দুই দলের কার্যক্রমে কোনো বিশেষ পার্থক্য নেই। কিন্তু আজ তারা দুই দলে বিভক্ত। এই দুই দলের অর্থনৈতিক লড়াই ভবিষ্যতে হবে দেখবার মতন। আরও উল্লেখযোগ্য হবে এই দলের প্রগতি। কোন্ দল কিভাবে বাণিজ্যিক যুদ্ধে জিতবে এখন বলা শক্ত। তবে এদের দলগুলো অনেক কাল টিকবে কিনা সেটাই হল প্রশ্ন।

অস্ট্রিয়া

প্রাসাদনগরী ভিয়েনা ঃ ভিয়েনার বিরাট বিরাট প্রাসাদ আর অট্টালিকাগুলো দেখছি আর ভাবছি, অস্ট্রিয়ার মতন ছোট্ট দেশের পক্ষে কী করে সম্ভবপর হল এমনি সব বৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণ। প্রাসাদ তৈরী করতে হলে চাই ঐশ্বর্য। অস্ট্রিয়ার কি অমন ঐশ্বর্য ছিল, না আছে? অস্ট্রিয়া এমনি ছোট্ট দেশ যার আয়তন মাত্র বত্রিশ হাজার বর্গমাইল, লোক সংখ্যা সত্তর লক্ষ। ভিয়েনা শহরটা যেন রাজপ্রাসাদ দিয়েই ঘেরা। ইউরোপে একমাত্র লণ্ডন-প্যারিসের পরেই স্থান পেতে পারে ভিয়েনা। অবশ্য রোমকে বাদ দিচ্ছি না। ভিয়েনা শহর আয়তনে ছোট হলেও প্রাসাদের সংখ্যায় ছোট নয়। অস্ট্রিয়ার সমগ্র লোক সংখ্যার এক সপ্তমাংশ জনসংখ্যার বাস এই ভিয়েনায়। অর্থাৎ প্রায় বার লক্ষ লোক বাস করে ভিয়েনায়। লণ্ডন-প্যারিস যেমন আন্তর্জাতিক তেমনি ভিয়েনা। অবশ্য ভিয়েনাকে বলা চলতে পারে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের রাজধানী।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ভিয়েনার মতন শহরে অসংখ্য প্রাসাদ নির্মাণ। অস্ট্রিয়ার মতন ছোট্ট দেশের পক্ষে কি সম্ভব অমন সব রাজপ্রাসাদ নির্মাণ? ঠিক অমন প্রশ্ন জাগবে আমাদের মনে লণ্ডন ও প্যারিসের বেলায়। লণ্ডনের বিরাট বিরাট প্রাসাদসম অট্টালিকা প্যারিসের বিরাট বিরাট প্রাসাদগুলো কি শুধু ওই দেশের অর্থেই নির্মিত হয়েছে? ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের আর্থিক সম্পদে কি সম্ভব অমন বিরাট প্রাসাদ ও ঐশ্বর্য নির্মাণ? এর হদিস মিলবে কিছুটা কার্ল মার্ক্সের বুলির ভেতরে। কার্ল মার্ক্সের বুলি সত্য প্রমাণিত হয়েছে ইউরোপের বিরাট শহরগুলোতে। ইংলণ্ড ফ্রান্স বা অস্ট্রিয়ার এমন প্রাকৃতিক সম্পদ নেই বা আর্থিক সম্পদ নেই যার ফলে তারা অমন অসংখ্য প্রাসাদ নির্মাণ করতে পারে। ওরা অমন সব প্রাসাদ নির্মাণ করেছে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে।

এক কালে রোমানসাম্রাজ্য সমগ্র ইউরোপকে পদতলে রেখেছিল। সে অনেক দিনের কথা। কিন্তু এই চারশ বছর আগে যখন ইংরাজ ফরাসী ওলন্দাজরা ইউরোপের বাইরে এশিয়ায় আফ্রিকায় ঘোরাফেরা সুরু করে, তখন অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হতে থাকে মধ্য ইউরোপ থেকে পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত। অপর দিকে তার অধীনে আসে ইতালী বেলজিয়ামের কিয়দংশ, ফ্রান্সের একাংশ, এমন কি স্পেন পুর্তুগালে তার আধিপত্য। ইউরোপে এরা চালায় পাঁচশ বছর ধরে একাধিপত্য। পাঁচশ বছরের অস্ট্রো-হাঙ্গারিয়ান সাম্রাজ্য এখনও স্মৃতি রেখে চলেছে ইউরোপের ইতিহাসে। কিন্তু ১৯১৯ সালের মধ্যে তাকে হারাতে হয় সব উপনিবেশ। ইতালী হয় আগেই স্বাধীন, তারপর হাঙ্গারি, চেকোশ্লোভাকিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া পাঁচ কোটি লোকসংখ্যার অস্ট্রো-হাঙ্গারিয়ান সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হয়ে মাত্র ষাট লক্ষ লোকসংখ্যার অস্ট্রিয়ায় এসে ঠেকে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণতন্ত্র। তারপর অনেক ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে আবির্ভাব হয় হিটলারের হিটলার ঘটায় অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর মিলন। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও পরাজয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আবার প্রতিষ্ঠিত হয় অস্ট্রিয় সাধারণতন্ত্রের।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে জার্মানীর মতন অস্ট্রিয়াও দুই ভাগে বিভক্ত হয়, সোভিয়েত বাহিনী অধিকৃত অঞ্চল ও পশ্চিমী শক্তিবর্গ কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চল। এমন কি ভিয়েনা শহরও ছিল চার ভাগে বিভক্ত। শুধু ভিয়েনা শহরের মধ্য ভাগটি ছিল আন্তর্জাতিক কেন্দ্র। ১৯৪৫ সালের মে মাসে প্রথম গঠিত হয় অস্থায়ী সরকার এবং এই সরকার পরিচালনা করেন ডক্টর রেনার। ১৯৪৫ সালের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত হয় এক সাধারণ নির্বাচন। সেই থেকে কয়েকবার অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ নির্বাচন। অস্ট্রিয় রাজনীতির মজা হল এই যে, প্রতিবারেই এখানে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কারণ দুই

প্রধান রাজনৈতিক দল (১) ফোল্কস পার্টি (সংরক্ষণশীল দক্ষিণপন্থী দল) ও (২) সোস্যালিস্ট পার্টি (বামপন্থী দল) প্রতিবারেই প্রায় সমান সংখ্যক ভোট লাভ করে। তবে বেশীর ভাগই সংরক্ষণশীল দলই একটু বেশী ভোট পায়। কিছুদিন আগে অস্ট্রিয়ার সাধারণ নির্বাচন হল কিন্তু তারা মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারে না দুই দলের সমান সংখ্যক আসন লাভের দরুণ। সেবারও গঠিত হয় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা। প্রায় ছ' সপ্তাহ ধরে অস্ট্রিয়ার রাজনৈতিক দল অনেক চেষ্টা করেছে তাদের মন্ত্রিসভা গড়তে কিন্তু প্রতি দিনই ব্যর্থ হয়েছে। কারণ দুই দল তাদের কার্যক্রমের এক্তিয়ারের বাইরে যেতে পারল না। সোস্যালিস্টদের সঙ্গে রক্ষণশীল দলের নৈতিক বিরোধ হল অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে। সোস্যালিস্টরা চায় বড় বড় শিল্প কারখানাগুলোকে জাতীয়করণ করতে, রক্ষণশীলরা তার বিরুদ্ধে, তারা চায় গতানুগতিক ব্যবসা। এইখানেই বাধে দুই দলের বিরোধ এবং এই কারণেই দুই দলের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন হতে পারে নি।

যদিও ১৯৪৫ সাল থেকে অস্ট্রিয়ার স্বাধীন সরকার তাদের কাজ চালিয়ে আসছিল কিন্তু তাদের কার্যক্রম পরিচালিত হত চতুঃশক্তির হুকুমে। কেবলমাত্র ১৯৫৫ সালে ভিয়েনা চুক্তিতে অস্ট্রিয়া পায় তার পূর্ণ স্বাধীনতা। ওই চুক্তির বলে যেমন অস্ট্রিয়া পেয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা, তেমনি তাকে ত্যাগ করতে হয়েছে অনেকখানি। ওই চুক্তিবলেই আজ অস্ট্রিয়া নিরপেক্ষ থাকতে বাধ্য হয়েছে। সে কোন সামরিক চুক্তির আওতায় আসতে পারবে না এই হল মূল সর্ত। তাই সে নয় রুশ শক্তির জোটে, নয় মার্কিন শক্তির জোটে।

আগে বলেছি অস্ট্রিয় মহারাজাদের রাজত্বকালে যেমন বিরাট বিরাট প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল, তেমনি এখন এই সাধারণতন্ত্রের যুগে আর তেমন প্রাসাদ নির্মিত হয় না। কিন্তু অস্ট্রিয় সরকার মোটামুটি সমাজতন্ত্রবাদী। তাই তারা গত কয়েক বছরে প্রায়

এগার হাজার গৃহ নির্মাণ করেছে একমাত্র ভিয়েনা শহরে। এই সব বাড়িঘর সবই সরকারী এবং ভাড়া অত্যন্ত কম, মাসিক ভাড়া পঁচিশ-ত্রিশ টাকা। তা ছাড়া এই সব বাড়িতে দেখতে পাওয়া যাবে চিত্রকলার নিদর্শন। প্রতিটি বাড়ি নির্মাণে যে খরচ হয় তার এক শতাংশ খরচ করা হয় ওই বাড়িতে আর্টের জন্য। তার ফলে একাধারে চিত্রকররা পায় জীবিকা নির্বাহ ও জনসাধারণ পায় আর্টের স্বাদ। ভিয়েনা শহরে দেখলাম প্রচুর সরকারী বিদ্যালয় ও ছেলে-মেয়েদের জন্যে খেলার মাঠ ও সাঁতার কাটার ছোট্ট পুকুর। এগুলো সত্যি সুন্দর।

অস্ট্রিয়ানরা বস্ত্র শিল্পে বিশেষ উন্নত। অনেক বড় বড় কারখানা প্রায় আধা-সরকারী, অর্থাৎ আধাআধিভাবে তাদের জাতীয়করণ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে জল বিদ্যুৎ কারখানা। ভিয়েনার কাছে ইবস্-পারজেনবার্গ নামে গ্রামে দানিউব নদীর বাঁধে যে নতুন জল-বিদ্যুৎ কারখানা এই সবে উন্মুক্ত হয়েছে, সেই কারখানা থেকে সমগ্র ভিয়েনা শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। দানিউব নদীতে বাঁধ বেঁধে অনেকগুলো জল-বিদ্যুৎ কারখানা করা হয়েছে অস্ট্রিয়া জুড়ে। এই জল বিদ্যুৎ কারখানা থেকে অস্ট্রিয়া শুধু তার নিজের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করে না. এরা বিদ্যুৎ বেচে জার্মানীর কাছে, চেকো-শ্লোভাকিয়ায়, ইতালীতে এমন কি বেলজিয়ামে পর্যন্ত।

১৯৫৮ সালে অস্ট্রিয়া বেচেছে ভারতকে দুশো রেলগাড়ির ইঞ্জিন, এক হাজার ট্রাক্টর ও বিশ হাজার ছোট-ছোট রেলওয়ে যন্ত্রপাতি। এ ছাড়া এরা বেচেছে পুল ও জল-বিদ্যুতের বড় বড় টারবাইন। ছোট্ট দেশ অস্ট্রিয়া বিরাট দেশ ভারতকে বেচছে ভারি ভারি যন্ত্রপাতি।

ইন্‌স্‌ব্রুক : রেলপথে ভিয়েনা থেকে সালজবুর্গ হয়ে এবার ইন্‌সব্রুক। সালজবুর্গ খানদানি শহর। এর পথ-ঘাট বাড়ি-ঘরের প্রাচীনত্ব আমস্টারডামের মতনই, অলিগলিগুলো হেগ্-এর মতন। সালজবুর্গের রাজবংশ কয়েক শতাব্দী ধরে স্বাধীনভাবে রাজত্ব

চালিয়েছেন। শেষে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় অস্ট্রিয় সাম্রাজ্যের আওতায় আসে সোজাসুজি।

সালজবুর্গ শহরেই জন্ম হয় প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ মোজার্ত-এর। সে বাড়িখানা এখনও দেখা যায়। সামন্ততন্ত্রের স্মৃতিচিহ্ন পাওয়া যাবে এখনও পুরোনো শহরের অলিতে গলিতে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের বাড়িগুলো এখনও বেঠেঙ্গা দাঁড়িয়ে আছে

অষ্ট্রিয়ার এই পশ্চিম দিকটায় খালি পাহাড় আর পাহাড়। আল্পস্-এর উপত্যকায় শহরগুলো সত্য মনোরম। সালজবুর্গই বা বাদ যাবে কেন। চারধারে পাহাড় আর মাঝখানে ছোট্ট শহর সালজবুর্গ। এর লোকসংখ্যা মাত্র দেড় লক্ষ। মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে এক নদী। সালজবুর্গ রাজপরিবারের রাজপুত্ররা বেশ রসিক ছিলেন, তার পরিচয় মিলবে সালজবুর্গের উপকণ্ঠে পুরোনো গ্রীষ্ম প্রাসাদে। সে প্রাসাদে শুধু জলের খেলা। জলশক্তিকে বেঁধে কত মজার খেলাই না রচনা করেছে। পুতুল খেলা থেকে আরম্ভ করে, কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ও নানান ধরণের ফোয়ারা রয়েছে এই প্রাসাদে। যাই হোক, সালজবুর্গের বৈশিষ্ট্য হল বেড়াবার জায়গা বলে কলকারখানার জন্যে নয়। সালজবুর্গ সত্যি সুন্দর বেড়াবার জায়গা। স্বাস্থ্যের পক্ষে তো বটেই

সালজবুর্গ থেকে ইনস্ব্রুকে গিয়ে দেখি, ইনস্ব্রুক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা। গ্রীষ্মকালে যত লোক এখানে বেড়াতে আসে, তার চেয়েও বেশী লোক আসে শীতকালে কারণ, শীতকালে চলে বরফের ওপর দিয়ে লাফান ঝাঁপান। ইনস্ব্রুকের চার ধারে সুউচ্চ পাহাড়ের শ্রেণী যেন তাকে রক্ষা করতেই দাঁড়িয়ে আছে। ইনস্ব্রুক টিরোল জেলার সদর। টিরোল জেলাটার বিশেষত্ব আছে। টিরোলের নাচ-গান অন্য প্রদেশের চেয়ে ভিন্ন। আর পোশাক পর্যন্ত এখানে দেখছি বেজায় মার্কিন প্রভাব। মার্কিন আর জার্মান ভ্রমণবেরা শহরটাকে ছেয়ে ফেলেছে। বেড়াবার

জায়গা বটে। যত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা শহর। তাতে লোক তো আসবেই। লোক সংখ্যা মাত্র এক লক্ষ। সবাই জানে যে, অষ্ট্রিয়া নিরপেক্ষ দেশ। কিন্তু এদের কথাবার্তা হাবভাব দেখলে মনে হবে ঘোর মাকিনপন্থী। তাতে মনে হচ্ছে যে, এরা দায়ে পড়ে নিরপেক্ষ হয়েছে, মনে-প্রাণে নয়। বরং এরা অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের চেয়ে বেশী পরিমাণে মাকিনপন্থী টিরোলিরা স্বাধীনতাপ্রিয়। অনেক শতাব্দী ধরে তারা স্বাধীনতার লড়াই করেছে. এমন কি ছোট্ট টিরোল লড়েছে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে। সে লড়াই সত্যি গৌরবময়। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে টিরোলের জনগণ লড়াই করে ১৮০৯ সালে। তাদের নেতা ছিল এক চাষী। নাম তার আন্দ্রিয়াস হোফার। আন্দ্রিয়াস হোফার তার কৃষক-সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রবলবিক্রমে লড়েছে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে। জিতেছে সে। কিন্তু তাকে প্রাণ হারাতে হয় বিশ্বাসঘাতকের হাতে। টিরোলবাসীর কাছে তাই আন্দ্রিয়াস হোফার এখনও প্রিয় পূজ্য। আন্দ্রিয়াস হোফারের জয়গাথা এখনও শোনা যাবে টিরোলের গ্রামে গ্রামে, মূর্তি দেখা যাবে গ্রামে গ্রামে। ইন্সব্রুকে এক বিরাট মিউজিয়ম রয়েছে শুধু ওই লড়াই আর আন্দ্রিয়াস হোফারকে নিয়ে। তা ছাড়া কত যে মূর্তি ওই শহরে তার ইয়ত্তা নেই।

কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে, আন্দ্রিয়াস হোফারের জন্মভূমি-গ্রাম এখন ইতালীয়দের শাসনাধীন। দক্ষিণ টিরোল প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ইতালীয়দের অধীনে শাসিত হচ্ছে। প্রথম মহাযুদ্ধের দক্ষিণাস্বরূপ তৎকালীন মিত্রপক্ষ টিরোলের দক্ষিণাঞ্চল ভাগ করে দেয় ইতালীকে। সর্ত ছিল যে, যুদ্ধে জিতলে ও যোগদান করলে ইতালী পাবে ওই অংশ। সেই থেকে টিরোলের দক্ষিণাঞ্চল চলে যায় ইতালীতে। যদিও টিরোলিরা টিরোলি জার্মান ভাষাভাষী ইতালীয় নয়, তাহলেও তা আজ ইতালীর একাংশ। অস্ট্রিয়া সরকার ওই একাংশ ফিরে পাবার জন্যে অনেক চেষ্টাই করেছেন।

এখন চেষ্টা করছেন আলাপ আলোচনার মধ্যে সমস্যার মীমাংসা করতে। ওভাবে সমস্যার সমাধান না হলে তাঁরা অবশেষে জাতিপুঞ্জের সভায় যেতে বাধ্য হবেন। সেখানে হয়তো হবে সে সমস্যার নিষ্পত্তি। নইলে ইতালী ও অস্ট্রিয়ার সম্পর্ক হবে তিক্ততর। এখনই সে আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

বার্লিনে বাতাস বিক্রি হয়

জার্মানদের দুঃখ লণ্ডন-প্যারিসের মতন জাঁকালো রাজধানী নেই তাদের রাজধানী অবশ্য আছে। তাও আবার দুটো। দুই জার্মানীর দুই রাজধানী। পূর্ব জার্মান সরকারের রাজধানী পূর্ব বার্লিনে। তাও আবার গোটা বার্লিন শহরের এক-চতুর্থাংশ। পশ্চিম জার্মান সরকারের রাজধানী বন্-এ। রাজধানীর নাম বন্। বাংলাভাষায় যাকে বলে সত্যিকারের বন। জার্মানরা ওটাকে রাজধানী বলে মেনে নিতে চায় না। এমন কি শহর পর্যায়ে ফেলতে চায় না। ওরা বলে ওটা হল ছোট্ট ঘুমন্ত গ্রাম।

কিছুদিন আগে খোদ জার্মান রাজধানী বন্ শহরে বসে জার্মান পার্লামেন্টের সদস্য এবং ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট দলের পররাষ্ট্র দপ্তরের সম্পাদক ডঃ পিটেনবার্গের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। জার্মানীতে এত বড় বড় শহর থাকতে এই গণ্ড গ্রামে কেন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করা হল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যখন পরাজিত জার্মানী চার খণ্ডে বিভক্ত হল তখন চার বৃহৎ শক্তির শাসন পরিচালনা হত চার অধিকৃত অঞ্চল থেকে। ১৯৪৯ সালে যখন তিন বৃহৎ শক্তি মিলে ফেডারেল রিপাবলিক জার্মান-সরকার গঠন করে তখন সবাই মনে করেছিল যে রুশ অধিকৃত অঞ্চল যখন মিলিত হবে তখন অখণ্ড জার্মানীর রাজধানী হবে বার্লিন। যেমন ছিল যুদ্ধের আগে। জার্মানীতে বরাবরই প্রাদেশিকতা বড় বেশী

জোরালো। প্রুশদের সঙ্গে ব্যাভেরিয়ানদের সম্পর্ক, স্যাক্সদের সঙ্গে ভেটফালিয়ান বা ফ্রিজিয়ানদের সম্পর্ক খুব মধুর নয়। জার্মানীতে আঞ্চলিক প্রাধান্য ও আঞ্চলিক সরকারের প্রভাব কম নয়। তখনই ঠিক করা হয় বন্-এর মতন ছোট্ট শহরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করা হোক। বন্ এতই ছোট শহর যার প্রতি কোনো আঞ্চলিক সরকার বা প্রাদেশিকদের আকর্ষণ করবে না। হামবুর্গে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করলে মিউনিখের লোকেরা প্রতিবাদ করত। তেমনি ফ্রাঙ্কফুর্টে করলে প্রতিবাদ করত কোলন অথবা ডুসেলডর্ফ-এর আঞ্চলিক সরকার। তাছাড়া এগুলো বড় বড় শহর, কোনোটার গুরুত্ব ব্যবসা বাণিজ্যে, কোনোটার গুরুত্ব ব্যাঙ্কিং বা বন্দরে। এইসব বড় শহরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানেই রাজধানী বরাবর থেকে যেত। তাহলে ভবিষ্যতে আর কোনো দিন বার্লিনে যাবে না। প্রায় প্রত্যেকটি জার্মান মনেপ্রাণে এবং হৃদয়ে মনে করে বার্লিনই তাদের রাজধানী। বন্-এ রাজধানী অস্থায়ী। একদিন না একদিন তাদের রাজধানী বন্ থেকে উঠে বার্লিনে যাবেই। তাই বন্-এ সরকারী ভবনগুলোর জন্যে বিরাটকায় অট্টালিকা নির্মাণ করা হয় নি। ছোটখাট হাল্কা ধরনের বাড়ি-ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এমন কি রাজধানী বন্-এ বড় কোনো বিমানবন্দর নেই। কোলোন বিমান-বন্দরে নেমে গাড়ি, বাস বা ট্রেনে চেপে বন্-এ আসতে হয়। শহর হিসেবে বন্ এতই ছোট যে সেখানে বিদেশী দূতাবাসগুলোর পুরো জায়গা পাওয়া যায় না বলে অনেক বিদেশী দূতাবাস স্থাপন করা হয়েছে বন্ এর লাগাও আর একটা শহর গোডবাডেসবার্গ-এ। বন্ সরকারের কর্মচারি এবং বিদেশী দূতাবাসের অধিকাংশ কর্মচারীরা বাধ্য হয়ে বাস করে হয় গোডবাডেসবার্গ শহরে নয়তো কোলোন শহরে। জার্মান রাজধানী বন্ শহরের লোকসংখ্যা মাত্র এক লাখ আটচল্লিশ হাজার। পশ্চিম বার্লিনের লোকসংখ্যা বাইশ লাখ, হামবুর্গের লোকসংখ্যা আঠারো লাখ ষাট হাজার, মিউনিখের

লোকসংখ্যা বারো লাখ, ডুস্‌ল্‌ডর্ফে সাড়ে সাত লাখ, ফ্রাঙ্কফুর্টে দশ লাখ, কোল্‌ন শহরে সাড়ে আট লাখ, এস্সেন—ডর্টমুণ্ড, স্ট্যটগার্ট, হানোভার ও ব্রেমেন শহরে লোকসংখ্যা গড়পরতা ছয় থেকে আট লাখ। এর থেকেই বোঝা যাবে রাজধানী বন্‌ কোথায়। বরং সেদিক থেকে বিচার করলে পূর্ব জার্মানীর রাজধানী পূর্ব বার্লিনের লোকসংখ্যা বন্‌ থেকে প্রায় দশ গুণ বেশী। বারো লাখ লোকের বাস সেখানে। পূর্ব জার্মানীর রাজধানীর পরেই লাইবাৎজিগের লোকসংখ্যা সাত লাখ। ড্রেসডেনের পাঁচ লাখ, কার্ল মার্কসস্টাড ও মাগডেবুর্গে তিন লাখ করে।

জার্মানরা এখনও বার্লিন বলতে অজ্ঞান। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীর অনেকেই তাদের এখানের রাজধানী বার্লিন দেখে নি। অনেকেই সেখানে যায় না ভয়ে। কারণ পশ্চিম বার্লিন শহর পশ্চিম জার্মানীতে অবস্থিত নয়। পূর্ব জার্মান অঞ্চলে বেষ্টিত। পশ্চিম জার্মানীর বহু লোক আমায় বলেছেন, দরকার নেই বাবা পশ্চিম বার্লিনে গিয়ে। পূর্ব জার্মানীর কম্যুনিস্ট সরকার কবে ঘিরে ধরবে, তারপর সেখান থেকে বেরোন যাবে না। কিন্তু দূর থেকে সবাই বার্লিনকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। উপাসনা করে তাদের রাজধানী বলে। আমাদের কাছে গঙ্গাজল যেমন পবিত্র। অনেকে গঙ্গাজল কলসী ভর্তি করে রেখে দেয় বাড়িতে। তেমনি আজকাল জার্মানরা বার্লিনের বাতাস কৌটায় করে রেখে দিচ্ছে। খাস বার্লিন শহরের 'স্যুভনির শপ্‌'এ আজকাল বিক্রি হচ্ছে টিনের কৌটায় "লুফ্‌টড্যার বার্লিন" অর্থাৎ বার্লিনের বাতাস। না দেখলে বিশ্বাস হবে না। পশ্চিম জার্মানী হতে আগত অনেক পর্যটক বার্লিনের বাতাস কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরছে। যে বার্লিনের বাতাস কৌটায় করে বিক্রি হয় সে বার্লিনের অবস্থা যে কী তা আসল বার্লিনবাসীরাই বলেছে। বার্লিনের নাকি ভবিষ্যৎ নেই। কণ্টস্ট্রাস আর সাভিনিস্ট্রাসের আশে-পাশে কয়েকটা কাফেতে একালের তরুণ শিল্পীদের আড্ডা লেগেই আছে। লম্বা

চুলওয়ালা বিটনিক্, বামপন্থী ছাত্রের দল। কিছু উঠতি লেখক ওই কটা কাফে সারা দিন-রাতই নরক গুলজার করে রেখেছে। এক জার্মান শিল্পী বন্ধুর সঙ্গে ওদের একটা কাফেতে গিয়েছিলাম। কয়েকজন তরুণ চিত্র-শিল্পী ক্ষোভের সঙ্গে বলছিল যে, এককালে এই বার্লিন শহর ছিল জার্মান সংস্কৃতি আন্দোলনের পুরোধা। জার্মান চিন্তাশীল মহল, বুদ্ধিজীবী আর শিল্পীরা বার্লিনকে ঘিরে নতুন নতুন সৃষ্টিতে ইউরোপ মাতিয়ে রাখত। সেদিন আর নেই। এত বড় বার্লিন শহরে মাত্র চারটে কি পাঁচটা আর্ট গ্যালারি। তাও আবার মাঝে মাঝে হাত বদল হয়। জার্মান চিত্র-শিল্পীরা বার্লিনে ছবি বেচার আশা ত্যাগ করে এখন মিউনিখে আড্ডা জমিয়েছে বার্লিনের গুরুত্ব কমেছে যেমন তেমনি বেড়েছে মিউনিখের গুরুত্ব আর্ট চর্চায়। মিউনিখে আর্ট গ্যালারির সংখ্যা যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে আর্ট মিউজিয়ম। গোটা পাঁচেক বড় বড় মিউজিয়ম রয়েছে মিউনিখে। তারও ঘর রয়েছে হিটলার নির্মিত মিউজিয়ম অব মডার্ন আর্ট। সঙ্গীত সাহিত্যে আজকাল মিউনিখের নাম-ডাক বাড়ছে।

এক জার্মান চিত্র শিল্পী দুঃখ করে বলছিল যে, আজকাল জার্মানীতে একটু নাম করলেই চলে যায় প্রথমে প্যারিসে, না হয় রোমে। জার্মান শিল্পীরা আজকাল আড্ডা জমাচ্ছে প্যারিসে। আবার তাদেরই আঁকা চিত্রপট কিনছে প্যারিসে এসে জার্মান ধনপতির দল। জার্মান-ধনপতিরা জার্মানীস্থ আর্ট-গ্যালারিতে ছবি না কিনে কিনছে প্যারিসে, নয়তো রোমে। এখানেই জার্মান শিল্পের ট্র্যাজেডি। লণ্ডন-প্যারিসের মতন জমকাল রাজধানী তাদের নেই বলেই জার্মান-শিল্পীদের এই দুঃশা।

শাসন-কার্যের রাজধানী বন্ ছাড়া এখন রাজধানীর গুরুত্ব ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন শহরে। এবার সে সব বিভিন্ন রাজধানীর সন্ধানে বেরিয়েছিলাম চিরকালের জার্মান রাজধানী বার্লিন ছেড়ে প্রথমে

মস্কো-

পৌঁছই কোল্‌ন বিমান-বন্দরে। কোল্‌ন শহরকে বলা হয় ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর রাজধানী। ব্যবসা-বাণিজ্যে কোল্‌ন ভীষণ ব্যস্ত শহর। রাইন নদীর তীরে কোল্‌ন-এর জগদ্বিখ্যাত ও-ডি-কোলন কারুর অজ্ঞাত নয়। কোল্‌ন থেকে যাই বাডগোডেশবার্গে। যাবার সময় বন্‌ ভেদ করে যেতে হয়। বন্‌-এর হোটেলে জায়গা পাওয়া যায় না বলেই বাডগোডেশবার্গের শরণাপন্ন হয়েছিলাম। শান্ত স্নিগ্ধ শহর বাডগোডেশবার্গ। কোল্‌ন বা হামবুর্গের প্রাণচাঞ্চল্য সেখানে নেই। ছোট শহরে বাস করে আরাম আছে। চারধারে গাছপালা আর বন। সারাদিন কাটাতাম বন্‌-এ। সেখানে দেখাশোনার কাজ। বিকেলে এসে পৌঁছতাম বাডগোডেশবার্গ-এ. মোটর পথে দশ মিনিট। বাস বা ট্রামে লাগে পনের মিনিট।

বন্‌ থেকে ট্রেনে ফ্রাঙ্কফুর্ট পৌঁছতে লাগে দু'ঘণ্টা। ফ্রাঙ্কফুর্টে গিয়েছিলাম বছর আষ্টেক আগে। তারপর বছরে প্রায় তিন চার বার আমি ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমান-বন্দরে বিমান বদল করতে নেমেছি। ফ্রাঙ্কফুর্টে বিশ্বকর্মার চেলাদের যেন বিরাম নেই। তারা হাতুড়ি-শাবলে, যন্ত্রপাতির সাহায্যে নির্মাণ করে চলেছে রাস্তাঘাট, বাড়ি-ঘর। ফ্রাঙ্কফুর্টে এখন সুড়ঙ্গ পথে রেলপথ নির্মিত হচ্ছে। বছর-দুই পরে সুড়ঙ্গ পথে রেল বা মেট্রো চলাচল শুরু হবে। বার্লিন ও হামবুর্গে রয়েছে এই বস্তু। এখন নির্মাণ কাজ চলেছে ফ্রাঙ্কফুর্টে ও মিউনিখে। ফ্রাঙ্কফুর্টে পৌঁছে আমার পুরোনো বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করলাম, এটাকে কি তোমরা নিউইয়র্ক করে তুলবে। চারধারে ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা অট্টালিকার ছড়াছড়ি। এক বন্ধু রসিকতা করে বলল, না হে, এ শুধু এখন আর নিউইয়র্ক নয়, শিকাগো শহরও বটে। তার মানে? তার মানে বুঝলে না, রোজই খুন-খারাপি আর ডাকাতি হচ্ছে। ফ্রাঙ্কফুর্ট এখন বড় বড় ব্যাঙ্কের রাজধানী। এখান থেকে টাকার লেনদেন চলে।

আমেরিকান সামরিক বাহিনীর প্রধান ছাউনি এই অঞ্চলে।

তাই আমেরিকান সৈনিকদের মনোরঞ্জনে ফ্রাঙ্কফুর্টের প্রধান রাস্তা কাইজার ষ্ট্রাস ও রেলস্টেশনের আশে-পাশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য নাইট ক্লাব, কাবারে, কাফে-বার। তার সঙ্গে চলেছে সবচেয়ে পুরোনো ব্যবসা গণিকা-বৃত্তি। এই রাস্তায় ঘুরলে দেখা যাবে শুধু আমেরিকান সৈনিক। তাদের দেখাদেখি একদল জার্মান-যুবক কথায় কথায় ছুরি চালায় বা বন্দুক ছোঁড়ে। ফ্রাঙ্কফুর্টের এই কটি রাস্তায় মার্কিন সংস্কৃতির যত প্রভাব দেখা যাবে—ততখানি বোধহয় অন্য কোন শহরে নয়। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে রোজ সকালে যেতাম বিশ মাইল দূরে ভীস্‌বাডেন শহরে। জার্মান সিনেমা-শিল্পের আড্ডা এখন ভীজবাডেনে। ছোট-খাট কিছু স্টুডিও রয়েছে এখানে। তাছাড়া সিনেমা-প্রতিষ্ঠানের অফিস, বোর্ডের অফিস, সমিতির অফিস ইত্যাদি।

ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে মিউনিখ পৌঁছুই বিমানযোগে। অনেক কাল পরে পুরোনো মিউনিখে আসা গেল। বছর পাঁচেক আগে যে-সব বোমাবিধ্বস্ত প্রাসাদের গায়ে ক্ষতচিহ্ন দেখেছিলাম এবার দেখলাম সেগুলোকে মেরামত করা হয়েছে। নতুন জার্মান শহরগুলোর মধ্যে মিউনিখ তার বৈশিষ্ট্য এখনও বজায় রেখেছে। মিউনিখ অন্যান্য শহরের মতন অত ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি বোমার আঘাতে। তাই সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের অনেক ঐতিহাসিক প্রাসাদ এখনও দেখা যাবে। হিটলার দলের আবির্ভাব এই মিউনিখে। তাদের আড্ডা জমে প্রথমে মিউনিখে তারপর ছড়িয়ে পড়ে জার্মানীময়। হিটলারের তৈরী আর্ট মিউজিয়ম ও কয়েকটা বাড়ি-ঘর এখনও এখানে হিটলারি স্মৃতি বহন করে চলেছে। রাস্তা-ঘাটে 'বিয়ার সেলার'-এর ছড়াছড়ি। এক-এক জাগে এক লিটার করে বিয়ার আঁটে। তারই গোটা দশেক দুই হাতে জার্মান রমণী টেবিলে সাজিয়ে যাচ্ছে। ব্যাভেরিয়ার রাজধানী মিউনিখ। ব্যাভেরিয়ায় চলে বিয়ার। অনেকে জলের বদলে শুধু বিয়ারই পান করে। তাই মিউনিখে বিরাট বিরাট

বিয়ার সেলার যে কটা আছে তা গুণে বলতে পারব না। ব্যাভেরিয়া প্রদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। আল্পস্ পাহাড় ছড়িয়ে রয়েছে আর রয়েছে অসংখ্য লেক। এখানে বেড়াতে আসে নানান প্রদেশের জার্মান পর্যটক। চিত্রশিল্পিরা তাই ব্যাভেরিয়া বেছে নিয়েছে। তাছাড়া জার্মানীর অন্যান্য জেলার চেয়ে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বলেও টুরিস্টদের ভিড় ব্যাভেরিয়ানদের কথ্য ভাষায় অনেক টান থাকে বলে উত্তর জার্মানরা ওদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে থাকে। যেমন ইংরেজরা স্কটদের আর পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা করে পূর্ববঙ্গের লোকেদের। মেয়ে-পুরুষ সবাই গ্রীষ্মকালে আঞ্চলিক পোশাক পরে। এদের পোশাকে অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রাশিয়ানদের অভিযোগ, ব্যাভেরিয়ানরা বড়ই কুঁড়ে এবং বুদ্ধিতে খাটো। তবে ব্যাভেরিয়ান সামন্ত-রাজারা এককালে প্রচুর প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। ব্যাভেরিয়ায় ফরাসী প্রভাব একটু বেশী। অধিকাংশ প্রাসাদে দেখা যাবে তার প্রভাব। যেমন, মিউনিখের কাছে নিমফেনডর্ফ প্রাসাদে ও বারমার গার্ড জেলায় লিণ্ডার ফে প্রাসাদে। এগুলো ভারসাই প্রাসাদের নকল। এককালে ব্যাভেরিয়া ছিল স্বাধীন রাষ্ট্র। মিউনিখ থেকে একশ কিলোমিটার দক্ষিণে আল্পস পাহাড়ের গারমিশ শৈলাবাসে যাবার পথে ছোট-খাট গ্রামগুলো দেখার মতন। পুরোনো কাঠের বাড়ি, আর অনেক বাড়ির গায়ে দেয়াল-চিত্র। নানান রঙের দেয়াল চিত্র শুধু ব্যাভেরিয়ার এই অঞ্চলেই দেখা যাবে। ছুটি কাটাবার পক্ষে এই সব অঞ্চলগুলো মনোহর।

জার্মানীর কটা বড় সিনেমা স্টুডিও মিউনিখে। তারাই জার্মান ছবি তোলে। তার সঙ্গে আমেরিকান ছবিরও কাজ হয়। মিউনিখের অধিকাংশই ক্যাথলিক। তাই ক্যাথলিক রাজনৈতিক দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট দলই প্রধান। জাতীয়তাবাদী দলগুলোই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। আজকাল সাংস্কৃতিক-কেন্দ্র হয়ে উঠেছে বলে অনেক জার্মান লেখক মিউনিখে আড্ডা গেড়েছে। পুস্তক

প্রকাশকদের এক বড় অংশ আজকাল মিউনিখে ব্যবসা বাড়িয়ে তুলছে। পুস্তক প্রকাশের আরেক ঘাঁটি এখন হামবুর্গে।

এবার দক্ষিণ থেকে উত্তরে উড়লাম। মিউনিখ থেকে হামবুর্গে বিমানে পৌঁছতে লাগে ঝাড়া দেড় ঘণ্টা। আবহাওয়া দুর্যোগের জন্যে এক ঘণ্টা সময় নষ্ট হল বিমান-বন্দরে। হামবুর্গে পৌঁছে সাদরে বন্ধুরা বলল দেখেছ ইংলিশ ওয়েদার। কুয়াশা ভরা বাতাস। যেন লণ্ডনে বেড়াচ্ছি। চারধারে কল কারখানা জাহাজের ধোঁয়া কুয়াশাকে আরও গাঢ় করেছে হামবুর্গে এলে মনে হবে সত্যিকারের বিরাট শহরে এসেছি। জনসমুদ্রের ব্যস্ততা, পথচারীর ভিড় দেখলে মনে হবে এটাই জার্মান রাজধানী। এই বন্দর দিয়ে আসে-যায় জার্মান ব্যবসা-বানিজ্যের একটি বড় অংশ হামবুর্গের বন্ধু গুটনেক্টট্ বলছিল, যুদ্ধের ঠিক পরে তার বয়স কতই বা হবে—পনের ষোল। রাস্তাময় শুধু ধ্বংসস্তূপ আর মৃত দেহের স্তূপ। এমন একটি পরিবার নেই যার একজন না-একজন যুদ্ধে মারা গেছে। তাই যুদ্ধের পরে দেখা দেয় সামাজিক পরিবর্তন। তার জের এখনও চলছে। তার ফল ভোগ করছে একালের তরুণ-তরুণীরা। নব বিবাহিত অনেক তরুণ-তরুণী বিবাহের এক বছরের মধ্যেই ডিভোর্স করে।

হামবুর্গের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দেখা হল লম্বা চুলওয়ালা বিটনিক্ দলের সঙ্গে। আমার বন্ধুর স্ত্রী চুট্‌কি কেটে জিজ্ঞাসা করল, প্যারিসে এমন দৃশ্য দেখা যায় কিনা। জানালাম যে, লণ্ডনের পর বোধহয় হামবুর্গে এর দ্বিতীয় তীর্থস্থান। শুধু জার্মান-বিটনিক নয় সুদূর ইউরোপের বিটনিকদের এখন আড্ডাখানা হামবুর্গে। হামবুর্গে টাকার খেলা যেমন অত্যধিক, তেমনি প্রদীপের নিচে অন্ধকার বেশি। অর্থাৎ সামাজিক কলঙ্ক এখানেই বেশি। তাই প্রচুর জার্মান লেখক ঔপন্যাসিক হামবুর্গের সমাজ নিয়ে বই লিখেছেন। সেণ্ট বাউলির কুখ্যাত অঞ্চল ছেড়ে দিলেও খোদ শহরের মাঝখানেই

দিনে-দুপুরে অনেক দৃশ্য দেখা যাবে। বন্দর বলেই বোধ হয় বিদেশী নাবিকদের আনন্দ বিনোদনে বিশেষ ধরনের গণিকালয় গড়ে উঠেছে। হামবুর্গের দোকান-পাটে জিনিসের দাম একটু বেশি-বেশি বলেই মনে হল। বন্ধুবর গুটনেক্ট বলল যে, হামবুর্গের চেয়ে ডুশ্যেলডর্ফে জিনিসপত্রের দাম আরও বেশি। বার্লিন, ফ্রাঙ্কফুর্ট ও মিউনিখে জিনিসপত্রের দাম অনেক কম।

বিমানযোগে ডুশ্যেলডর্ফ বিমান-বন্দরে পৌঁছে টুরিস্ট ব্যুরোতে হোটেলের খোঁজ করতেই উত্তর পেলাম, মহাশয়, ডুশ্যেলডর্ফ-এ সস্তায় হোটেল পাওয়া যায় না বরং অন্য শহরে যান। অগত্যা ছোট হোটেলে বড় হোটেলের খরচায় ঘর পাওয়া গেল। কদিন বাস করে বুঝলাম ডুশ্যেলডর্ফ হল বড় সাহেবদের রাজধানী। অর্থাৎ বড় বড় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের বড় কর্তারা এখানে বাস করে। আমার এক সাংবাদিক বন্ধু এখানে বাধ্য হয়ে বাস করেন। তিনি পূর্বাঞ্চলের লোক। ডুশ্যেলডর্ফের বড় লোকরা তাদের দেখতেই পারেন না। তিনিই বলেছিলেন, ডুশ্যেলডর্ফবাসীরা এটাকে প্যারিস বানাতে চায়। কনিগসসালেকে এরা প্যারিসের সাজেলিজে বলে ভাবে। এই রাস্তায়ই সব সৌখিন দোকানপাট। যুদ্ধে সেকালের বাড়িঘর ধ্বংস হয়। তার জায়গায় ওঠে নতুন নতুন বাড়িঘর। ডুশ্যেলডর্ফের রাস্তাঘাটে হাঁটলে দেখা যাবে এটা সৌখিন নগর। পুঁজিপতিদের রাজধানী ডুশ্যেলডর্ফ। এখানে বসে পুঁজিপতিরা কাগজে-কলমে কোটি কোটি টাকার ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এদের নির্দেশে পরিচালিত হয় সারা জার্মানীর হাজার হাজার কল-কারখানা। ডুশ্যেলডর্ফে টাকার চর্চা হয়, বিজ্ঞান-সাহিত্য বা শিল্পচর্চা তেমন হয় না। তাই এর নাম দেওয়া উচিত টাকার রাজধানী।

বার্লিন

বার্লিনবাসীরা বলছেন, বার্লিনে আকাল লেগেছে। সেখানে এখন হায় হায় রব উঠেছে। এই গ্রীষ্মকালে গরম জামাকাপড়ের ওপর ওভারকোট চাপাতে হচ্ছে বলে। অবশ্য শীতকালের হাড়-কাঁপুনে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া আর তুষারপাতও দেখেছি। কিন্তু এই গ্রীষ্মকালে ওভার-কোট চাপাতে দেখি নি। এরই নাম আকাল। এ-বছরটাই যেন সব উল্টোপাল্টা ঘটনা ঘটছে। অষ্ট গ্রহের ফলাফল আর কি!

১৯৬১ সালের আগস্ট মাসে পশ্চিম বার্লিনের চারধারে দেওয়াল তুলে দেয় পূর্ব-জার্মান কর্তৃপক্ষ. তারপর থেকে দুই বার্লিনে যাতায়াত সহজসাধ্য নয়। আগে পূর্ব-বার্লিনের জনসাধারণ পশ্চিমে আসতো বেড়াতে, নয়তো তামাসা দেখতে। পশ্চিম বার্লিনের অধিবাসীরা যেত পূর্ব বার্লিনে আত্মীয়-স্বজনদের দেখতে। এখন সে-পথ বন্ধ। অন্যান্য বছরে এই ভরা গ্রীষ্মে বার্লিন ফিল্ম ফেসটিভ্যালে দেখেছি অসংখ্য নরনারী (তার মধ্যে বালখিল্যের দলই বেশী) বড় বড় হোটেলের দরজার সামনে নয়তো বড় বড় সিনেমার সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করত সিনেমাকাশের তারকাদের দর্শনলাভের জন্য। বালখিল্যের দল খাতা, পেন্সিল নিয়ে তারকাদের পিছু নিত একটা স্বাক্ষরের আশায়। এবার তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। পরে জানলাম যে, এ হ'ল দেয়াল দেওয়ার ফল। অর্থাৎ পূর্ব-বার্লিন থেকে আগে তারাই অধিক সংখ্যায় আসত। তারা এখন আর আসে না বলেই বার্লিনের চলচ্চিত্র উৎসব ম্লান।

অন্যান্য বছর এই গ্রীষ্মকালে বার্লিনের কুরকুস্টেনডম্ বা চৌরঙ্গী অঞ্চলে সকাল-সন্ধ্যে কাতারে কাতারে জনতার প্রাণচঞ্চল গতিবিধি দেখেছি। এখন তার তুলনায় নিতান্তই কম। শনি বা

রবিবারের সন্ধ্যেবেলায়ই যেটুকু দেখা যায় সপ্তাহের অন্য দিনে অনেক কম। আগে পূর্ব-বার্লিনবাসীরা পশ্চিম-বার্লিনে শুধু বেড়াতেই আসত না, এটা-সেটা কিনতেও আসত। পশ্চিম-বার্লিনে ব্যবসাদারদের কাছে পূর্ব বার্লিন অধিবাসীরা ছিল বড় খদ্দের। তারা সে খদ্দের হারিয়েছে। ফলে অনেক দোকানপাট বন্ধ। একদিকে যেমন পূর্ব-বার্লিনের লোকজনের যাতায়াত বন্ধ, অপরদিকে পশ্চিম বার্লিনের অনেকে বার্লিন ছেড়ে পশ্চিম জার্মানে বসবাস করতে যাচ্ছে। পশ্চিম বার্লিন এখন বন্ধ। পূর্ব-জার্মানীর অভিপ্রায়ের ওপর নির্ভর করছে পশ্চিম বার্লিনের ভবিষ্যৎ। আবার মার্কিনগোষ্ঠীরা চাইছে তাদের মান-সম্মান রক্ষার নিমিত্তে যে-কোন প্রকারে হোক পশ্চিম বার্লিনকে জিইয়ে রাখতে। পশ্চিম বার্লিনের চারধারে দেয়াল তোলার পর থেকে পশ্চিম জার্মান করদাতারা বিশেষ করে পশ্চিম-জার্মান শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা পশ্চিম-বার্লিন সম্বন্ধে তেমন আশাবাদী নয়। তার প্রধান কারণ হল পশ্চিম বার্লিনকে জাঁক-জমক করে খাড়া রাখতে যে অজস্র অর্থ ব্যয় হয় তা আসে তাদের পকেট থেকে। শিল্পপতিরা বলেছেন যে, পশ্চিম বার্লিনের পেছনে অত অর্থ ব্যয় করে কী হবে, কারণ কোনদিন হয়তো সেটা তাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়ে পূর্ব-জার্মান সরকারের খপ্পরে গিয়ে পড়বে। তাছাড়া অন্য অনেক কারণের মধ্যে বার্লিনকে জিইয়ে রাখতে পশ্চিম-জার্মান সরকার অনেক কর রহিত করেছে, উপরন্তু কোটি কোটি টাকা ঢালছে বার্লিনের ঠাট বজায় রাখতে। বার্লিনকে জার্মানরা এখনও রাজধানী বলে মনে করে। এ হল জার্মানদের মনের কথা। যদিও বার্লিন আর এখন জার্মানীর রাজধানী নয়, তাহলেও কি পূর্ব জার্মান কি পশ্চিম-জার্মান দু'জায়গার লোকেরাই বলে বার্লিনই রাজধানী। বার্লিন এখন দুই জার্মানীর গলার কাঁটা। বার্লিনকে নিয়েই দুই জার্মানীর বিরোধ। নইলে দুই জার্মানীর দুই পৃথক রাষ্ট্র যেমন চলেছে তেমনি চলত আরও অনেক

কাল। অনেক জার্মান যেমন দুই জার্মানীর মিলন চায়, তেমনি আবার অনেকে চায়ও না। এর কারণ ঐতিহাসিক। বরাবর পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে পার্থক্য ছিল। আগেও পূর্ব জার্মানীর স্যাক্সান ছিল স্বাধীন রাষ্ট্র। এদিকে প্রুশিয়া-বাভেরিয়া দুই পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র। পূর্ব-জার্মানীর জনসংখ্যার অধিকাংশ প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মাবলম্বী। এদের মধ্যে স্লাভ জাতির প্রভাব বেশী। পশ্চিম জার্মানীতে ক্যাথলিকদের প্রাধান্য ধর্মীয় পার্থক্যটা একেবারে ফেলে দেবার নয়। যাই হোক পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী তাদের পার্থক্য ভুলে গিয়ে একসূত্রে গ্রথিত হতে চাইলেই তা হওয়া সোজা নয়। এককালে জার্মানরা যেমন হিটলারের পুজো করেছে। অধিকাংশ পশ্চিম জার্মানীরা মনেপ্রাণে মার্কিনপন্থী, যাকে এরা বলে পশ্চিমী শক্তি। অনেক ক্ষেত্রে জার্মানরা মার্কিনদেরও ছাড়িয়ে যায়। অর্থাৎ এরা কট্টর রুশ-বিরোধী। এই ব্যাখ্যা শুধু পশ্চিম জার্মানদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, পূর্ব জার্মানীর জনসাধারণদের বেলায়ও প্রযোজ্য। ব্যতিক্রম মুষ্টিমেয় পূর্ব-জার্মান কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্য। জার্মানীতে এক কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্যরা ছাড়া, সমগ্র জার্মান জাতি এখন রুশ-বিরোধী। একটু আলোচনা করলেই এদের মনোভাব বোঝা যাবে।

১৯৬১ সালের আগস্ট মাসের আগে অর্থাৎ বার্লিনে দেয়াল তোলার আগে পূর্ব থেকে পশ্চিম-বার্লিনে আসার অনেকগুলো পথ ছিল। সার্কুলার রেলপথ এস্ বান্ ও সুড়ঙ্গ রেলপথ ইউবান দিয়ে দুই বার্লিনের মধ্যে অনায়াসে যাতায়াত করা চলত। এই সব পথের মধ্যে এস্ বান্-এর ফ্রিডরীশ স্ট্রাশ রেল স্টেশনে প্রচুর ভিড় দেখা যেত। এ-বছরে এসে দেখছি জনশূন্য। প্রথমতঃ পশ্চিম বার্লিনের এস্ বান্ দিয়ে লোক চলাচল কম। তারপর পূর্ব বার্লিনের ফ্রিডরীশ স্ট্রাশ রেল স্টেশনে নামলেই পুলিশ, কাস্টমস. পাসপোর্ট, ভিসার হাঙ্গামা। একমাত্র পশ্চিম বার্লিনবাসী ছাড়া যে কেউ পাসপোর্ট দেখিয়ে, টাকার হিসেব দেখিয়ে সেখানে প্রবেশ করতে পারে।

পাস-পোর্ট-ভিসার হাঙ্গামা কি কম? ফ্রিডরীশ স্ট্রাশ স্টেশনে আগে ছিল ছোটখাট শুল্ক-বিভাগ এখন ওখানে বিরাট নতুন স্টেশনঘর নির্মিত হয়েছে। সেখান দিয়ে বিদেশীদের পাসপোর্ট-ভিসার হাঙ্গামা পোয়াতে হয়। ফ্রিডরীশ স্ট্রাশ স্টেশনে নতুন ঘর-বাড়ি দেখে এই মনে হচ্ছে যে, বার্লিনের দেয়াল অস্থায়ী নয়। এরা কতকাল দেয়াল তুলে রাখবে কে জানে!

কিছুকাল আগে পশ্চিম বার্লিনের গভর্ণর পৌরসভাপতি হার উইলি ব্রাণ্ড-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। হার উইলি ব্রাণ্ড পশ্চিম জার্মানীর সোস্যাল ডেমোক্রাট দলের নেতা; জার্মানীর সাধারণ নির্বাচনে এবং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হার আদেনওয়রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরেছেন। যাই হোক, সাক্ষাৎকারের সময় হার ব্রাণ্ডকে প্রশ্ন করি, বার্লিনের দেয়াল কি স্থায়ী ব্যাপার না অস্থায়ী ঘটনা। তার উত্তরে হার ব্রাণ্ড বলেন, না। বার্লিনের দেয়াল অস্থায়ী। বেশীদিন এভাবে চলতে পারে না। বার্লিনের দেয়াল একদিন ভেঙে পড়তে বাধ্য। আরেকটি প্রশ্ন আমি করি, "আপনার কি মনে হয় না যে. বার্লিনের দেওয়াল আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের প্রতীক চিহ্নস্বরূপ। আরও খোলাভাবে বললে বোঝাবে, পূর্ব ও পশ্চিমী শক্তির মধ্যে যে-কলহ চলছে তারই প্রতিক্রিয়া?" আমার প্রশ্নের উত্তরে হার ব্রাণ্ড বলেন, "অনেকটাই সত্য। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পূর্ব ও পশ্চিমী দলে রেষারেষি ও দ্বন্দ্বের ফল হল বার্লিনের দেয়াল। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকেরা লিখবেন যে, পূর্ব জার্মনীর ব্যর্থতার প্রতীক চিহ্ন হল ওই দেয়াল।"

বার্লিন থেকে মিউনিখ

আঃ কি গরম। এ ধরণের হা-হুতাশ বার্লিনে শুনেছি, মিউনিখে এসেও শুনছি। এটা গ্রীষ্মকাল, সুতরাং গরম তো হবেই। এই সোজা কথাটা জার্মানদের বোঝাই কী করে। গরম না পড়লেও আবার বাবাজীরা গোঁসা করেন। গরম পড়লেও ফ্যাসাদ। ঠাণ্ডাও এদের অসহ্য, আবার গরমও। আমরা কিন্তু বেশ আরামে আছি। মনে হচ্ছে কলকাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। যেন বোশেখ জ্যৈষ্ঠ মাসের গরম।

বার্লিনে এবার যা গরম পড়েছিল তা আর বলবার নয়। ইউরোপের যে-কোন শহরের চেয়ে বেশী গরম পড়ে এবার বার্লিনে। বার্লিনের সুবিধে হচ্ছে, তার আশে-পাশে ত্রিশটা লেক বা পুকুর রয়েছে। সুতরাং বার্লিনবাসীরা লেকের জলে বসে বসে গা ভিজিয়েছে।

পুকুরের জলে বসে চারজনে মিলে তাস খেলেছে, তাও দেখেছি। এ অতি সোজা। ভাসমান টেবিল বসিয়ে তার চার ধারে বসে এরা তাস খেলেছে, নয় তো বই পড়েছে। বার্লিনের সেরা রাস্তা কুরফুর্সৃডাম্-এ তখন চলছিল মেরামতি কাজ। কর্মরত শ্রমিকরা আধঘণ্টা কাজ করছে তো এক বোতল জল বা বিয়ার টানছে চোঁ চোঁ করে। যত না এরা কাজ করছে তার চেয়ে অনেক বেশি পান করেছে হয় জল নয় তো বিয়ার। আর বাড়ি-ঘরগুলিও এমনভাবে তৈরী যে, বাতাস ঢোকার জো নেই। তার ফলে ঘরে টেকার জোটি নেই। বাতাস করার যন্ত্রও নেই। এ হেন অবস্থায় ছটফট না করে উপায় কী?

বার্লিনে তবু পুকুর' বা খাল আছে, কিন্তু মিউনিখে? শুধু এক ফালি নালার মত নদী। তার চার পাশে দেখছি হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ নর-নারী হাঁটু জলে জল তোলপাড় করছে। ওতেই

ওদের আনন্দ। মিউনিখবাসীরা বার্লিনের মতন নয়। তারা তাদের আঞ্চলিক পোশাক পরে গ্রীষ্মকালের রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে বেশ সেজেছে। সাজগোজে মিউনিখবাসিনীরা বার্লিনদের হার মানাতে পারে। তাছাড়া মিউনিখবাসিনীদের পোশাক সুন্দর তো বটেই, উপরন্তু হালকা। ব্যাভেরিয়ার পোশাক গ্রীষ্মকালেরই উপযুক্ত। অস্ট্রিয়ারও তাই। ভিয়েনায়ও দেখেছি ওই এক পোশাক। সে পোশাক গ্রীষ্মকালে আরামদায়ক। ইউরোপের অন্যপ্রান্তে ওই ধরণের পোশাক দেখা যায় না। পোশাকের গুণে মিউনিখের সুন্দরীরা বার্লিনের সুন্দরীদের চেয়ে অনেক কম কষ্ট পেয়েছে এই গরমের দিনে।

বার্লিনে-মিউনিখে এই গরমে বাবাজীরা যে ঘুমক্লান্ত হচ্ছেন তার প্রধান কারণ যে তাদের পোশাক —একথাটা তাদের মাথায় ঢোকে না। ভেবে দেখুন, বোশেখ-জষ্ঠি মাসের গরমে বাঙালি-সাহেবরা গরম কোট-প্যান্ট চাপিয়ে তার ওপর টাই এঁটে নিজের ইচ্ছায় প্রাণটা গ্রীষ্মদেবতায় সঁপে দিচ্ছেন। অবশ্য কলকাতায় গ্রীষ্মকালে কখনও এ দৃশ্য যে দেখা যায় না তা নয়। অনেক দেশী সাহেব ওরকম করে থাকেন। কিন্তু জার্মানীতে জার্মানরা ওই সাংঘাতিক গরমে গরম জামাকাপড় পরে ছট্‌ফট্‌ করছে তা না দেখলে বিশ্বাসই হবে না। জার্মানরা বৈজ্ঞানিকের জাত। অনেক কলই তারা বানিয়েছেন, কিন্তু ধুতি-পাঞ্জাবির মতন কিছু তারা আবিষ্কার করতে পেরেছেন কি? গ্রীষ্মকালে ধুতি পাঞ্জাবি পরে যে আরাম, তা এ-ব্যাটাদের বোঝাই কা করে। শুধু জার্মান কেন যে-কোন ইউরোপীয় যদি বুদ্ধিমান হত তাহলে অনেক আগেই তারা বন্ধনমুক্ত হয়ে বাঙলাদেশের ধুতি-পাঞ্জাবি পরে অনায়াসে সুখভোগ করতে পারত। অমন সুখভোগের রাস্তা খোলা থাকতে সাহেববাবুরা অহমিকার ঠেলায় যেভাবে কষ্ট পাচ্ছে তা শত্রু হলেও কষ্ট পেতে বাধ্য। গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যেবেলায় কলকাতার রকে জল ঢেলে তার ওপর লুঙি পরে বসে আড্ডা মারতে

যে আরাম, সে আরাম কি এরা পাবে গরম জামা-কাপড় পরে কাফে বা রেস্তোরাঁয় বসে? কখনও না। দুঃখের কথা ইউরোপীয় দেশগুলোতে নেই রক, নেই লুঙ্গি। ইউরোপীয়রা যে কবে সভ্য হবে তা কে বলতে পারে? এদের সভ্য করতে পারে একমাত্র রক, লুঙ্গি আর ধুতি-পাঞ্জাবি। এরা সভ্য হলে কলকাতার লুঙ্গি ও কাপড় ব্যবসায়ীরা হবেন একমাত্র লাভবান। আমশা নই। লুঙ্গি ও ধুতির কথা জার্মানদের অনেক বুঝিয়েছি। এরা এখন একটু একটু করে বুঝতে শিখছে।

ধুতি-পাঞ্জাবি পবে এরা যেমন সভ্য হতে পারে, তেমনি এরা গ্রীষ্মের আরামও ভোগ করতে পারে কিন্তু তা নয় উল্টে এরা এক-একজন দিগম্বর হচ্ছেন। পুরুষ-মেয়ে মিলে অর্ধউলঙ্গ হয়ে পথেঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারণ? কারণ হল গরম। কিন্তু তার চেয়েও যখন গরম পড়ে ভারতবর্ষে, তখন তারা বাধ্য হয়ে অর্ধউলঙ্গ হয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এইসব অর্ধউলঙ্গ ইউরোপীয়রা যখনই গ্রীষ্মকালে ভারতবর্ষে বেড়াতে আসেন তখন তাঁরা কর্মরত অর্ধউলঙ্গ ভারতবাসীদের দেখে নাক সিঁটকান। বলেন, ভারতবাসীরা অসভ্য। কিন্তু এখন ইউরোপের পথেঘাটে দেখুন, সভ্য ইউরোপীয়রা গরমের ঠেলায় অর্ধউলঙ্গ তো বটেই, কোন ক্ষেত্রে সমুদ্রের ধারে পূর্ণউলঙ্গ হয়ে শুয়ে আছে। এ-দৃশ্য দেখে নাক সিঁটকাবার জো নেই।

বার্লিন এখনও ধ্বংসস্তূপের ওপর বসে আছে কিন্তু মিউনিখ নয়। মিউনিখের ঐতিহাসিক প্রাসাদগুলো প্রায় অটুট রয়েছে। দুচারটে অবশ্য ধ্বংস হয়েছে। নিউনিখের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব এখন বার্লিনের চেয়ে বেশী। তাই মিউনিখের পথেঘাটে দেখা যাবে বিদেশী টুরিস্ট। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই আমেরিকান। বার্লিনের অবস্থা মিউনিখের মতন নয়। বার্লিন চার ভাগে বিভক্ত। বার্লিনবাসীরা সদাই শঙ্কিত। কখন কি না হয়। কখন যে কী হবে তা কেউ জানে না। মিউনিখের সে বালাই নেই। তাই এখানকার জীবন স্বতন্ত্র।

শুধু মিউনিখ নয়, সমগ্র পশ্চিম জার্মানী আর্থিক ও শিল্পক্ষেত্রে ফেঁপে উঠেছে। এদের এখন আর্থিক দুশ্চিন্তা নেই। দুশ্চিন্তা অতি উৎপাদন। এরা এতই উৎপাদন করছে যে, সেগুলো তাদের বিক্রী করতে সময় লাগবে অনেক। এবং ইতিমধ্যে তাদের উৎপাদনও করতে হবে। একেই বলে recession। পশ্চিম জার্মানীর এই আর্থিক উন্নতি এত অল্প সময়ে কী করে সম্ভব হল তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে (১) মার্কিন আর্থিক সাহায্য, (২) অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কারখানা, (৩) যুদ্ধের খাতে বা সামরিক খাতে ব্যয় নেই, (৪) খাটে বেশি। এর ফলে জার্মান পুঁজিপতিদের মেদ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পশ্চিম ইউরোপের অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, বৃটেন ফ্রান্সও পেয়েছে মার্কিন আর্থিক সাহায্য। কিন্তু তাদের যন্ত্রপাতি ও কারখানা সব পুরোনো, তাতে উৎপাদন হয় জার্মানদের তুলনায় কম। বৃটেন ও ফ্রান্সকে তার সম্মান রক্ষা করতে, ঔপনিবেশিক রক্ষা করতে জলের মতন অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। সে ব্যয় জার্মানীর নেই। মার্কিন আর্থিক সাহায্যের দেনা তারা কেউই শোধ করে নি। জার্মানরা ইংরেজ বা ফরাসীদের চেয়ে খাটে অনেক বেশি। জার্মান-শ্রমিকরা ধর্মঘট করে উৎপাদন কমায় নি। উপরন্তু জার্মান-শ্রমিক ইংরেজ ও ফরাসীদের চেয়ে কম মাহিনা গ্রহণ করে। এই সব কারণেই জার্মানীর আর্থিক উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে। কোন যাদুমন্ত্রবলে নয়।

জার্মানরা যেমন তাদের আর্থিক সমস্যার সমাধান করেছে তেমনি নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, সে হচ্ছে অতি-উৎপাদন। তার উৎপন্ন মাল বেচতে হবেই। নইলে কারখানায় কাজ বন্ধ হবে, নয়তো তাকে উৎপাদন করতে হবে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র। যুদ্ধের সময় যেমন ছিল জার্মানী ইউরোপের সমস্যা। এখন এই শান্তির সময়েও জার্মানী একমাত্র ইউরোপেরই সমস্যা।

আবার বার্লিন

আবার বার্লিন। সবারই প্রশ্ন আবার ১৯৪৮-৪৯ সালের মতন হবে কি বার্লিন? বার্লিনের অবস্থা সত্যিই সঙ্গীন। ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রায় এগার মাস ধরে চলে বার্লিন-অবরোধ। সেই অবরোধ পশ্চিম-বার্লিনবাসীদের পক্ষে হয়ে ওঠে অসহ্য। পশ্চিম-বার্লিন, পশ্চিম-জার্মান সরকারের শাসনাধীনে।

বার্লিন দু'খণ্ডে বিভক্ত, যেমন জার্মানী--পূর্ব ও পশ্চিম খণ্ডে। অনেকটা ভারত ও পাকিস্তানের মতন। তবে ভারত ও পাকিস্তান বৃটিশ-সরকারের সৃষ্ট, জার্মানীরা চারটি রাষ্ট্রের। আগে জার্মানী ছিল চার ভাগে বিভক্ত। বৃটিশ, ফরাসী, আমেরিকান ও রুশ। পরে বৃটিশ, ফরাসী ও আমেরিকানরা মিলে গড়ে তোলে পশ্চিম জার্মান রাষ্ট্র, তেমনি রুশরা গড়ে তোলে পূর্ব জার্মান রাষ্ট্র। বার্লিনের বেলায়ও তাই। পশ্চিম বার্লিনে রয়েছে বৃটিশ, ফরাসী ও আমেরিকান সৈন্যবাহিনী, তেমনি পূর্ব-বার্লিনে রুশ বাহিনী। এখন সমস্যা দেখা দিয়েছে পূর্ব-বার্লিন থেকে। ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে এক ঘোষণায় রুশ-প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভ জানান যে, তাঁরা অর্থাৎ সোভিয়েত বাহিনী পূর্ব বার্লিন থেকে তো অপসারিত হবেই,—পূর্ব জার্মানী থেকেও হবে। তাঁরা চান যে, ঠিক অনুরূপভাবেই পশ্চিম জার্মানী থেকে সরিয়ে নিতে হবে ফরাসী, বৃটিশ ও মার্কিন সামরিক বাহিনী। সেই থেকে চলে দুই দলের মত-বিরোধ। কেউ কারও গোঁ ছাড়বেন না। এবং সেই থেকেই উদ্ভব হয়েছে জেনেভা-সম্মেলন। জেনেভা-সম্মেলনে চারটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা হিমসিম খেয়ে গেছেন। তবুও তাঁরা বার্লিন সমস্যার সমাধা করতে পারছেন না। বার্লিন সমস্যার মূল জার্মান সমস্যায়। দুই বিভক্ত ও স্বাধীন জার্মান রাষ্ট্রের জোড় না লাগলে বার্লিন সমস্যার সমাধান হতে পারে না। আমি বার্লিন শহরে বার্লিনের বিখ্যাত মেয়র ও

পশ্চিম জার্মানী সরকারের প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি। তাঁরাও ঐ কথাই বলেছেন। দুই জার্মানী একত্রিত না হলে বার্লিন-সমস্যার সমাধান হতে পারে না।

বার্লিনের অবস্থা কী রকম? ভেবে দেখুন, কলকাতার মধ্যভাগে অর্থাৎ চিত্তরঞ্জন এভিন্যু ধরে ভাগ হয়েছে। এক ধারে আপনি ও অন্য ধারে আপনার ভাই বাস করছেন। দুই ধারের অধিবাসী এধার ওধার করতে পাবে না। রাস্তা পেরুতে গেলেই পাসপোর্ট চাই। দুই রাস্তার ধারে দুই সরকার। এ ধারের সরকার বলে ওকে, তুই ব্যাটা বড় বদমায়েস। অপর জন তার উত্তরে বলে, তুই মস্ত পাজী। এই ধরনের প্রচারকার্য চলছে দুই বার্লিনে। দুই বার্লিনের দুই সরকারে মুখ দেখাদেখি নেই। তবে একটা কথা ঠিক যে, অধিকাংশ জার্মান রুশ-বিরোধী। জার্মানীরা কম্যুনিজম বিরোধী এই কারণে যে, তারা রুশদের ঘৃণা করে।

বার্লিনে বসে আছি। মনে হচ্ছে যেন কোন ধ্বংসস্তূপের ওপর। বার্লিন সফরকালে ঐতিহাসিক মিউজিয়ম ছাড়া আর কিছুই নয়। চার ধারে শুধুই ধ্বংসস্তূপ। পশ্চিম বার্লিনের চার ধারে পূর্ব-জার্মান সরকারের অক্টোপাস-বেষ্টনী। পশ্চিম বার্লিন হতে সাধারণভাবে পশ্চিম জার্মানী আসার জো নেই। কারণ তাদের কাছে পূর্ব জার্মান-সরকার বিদেশ। বিশেষ করে পশ্চিম বার্লিনকে পূর্ব-জার্মান সরকারের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে চলতে হয়। বার্লিনে এসে একটা জিনিস জানতে পেলাম যে, জার্মানরা এত রুশ-বিরোধী কেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানরা যখন রাশিয়ার একাংশ দখল করে, তখন তারা যেমন ওখানে অত্যাচার চালায়, ঠিক তেমনি অত্যাচার চালায় যুদ্ধের শেষে রুশরা জার্মানীতে। পূর্ব-বার্লিনে স্তালিন আলে নামে বড় রাস্তার ধারে বিরাট বিরাট বাড়িগুলো শুধু নির্মিত হয়েছে রাশিয়ান প্যাটার্নে। অর্থাৎ জার্মানীর বুকে

নির্মিত হয়েছে রুশ অট্টালিকা। যা কোনো জার্মানই সইতে পারে না। এ হল জাতীয় অপমান।

বার্লিনের ভারতীয় মহলের কাছ থেকে জানতে পেলাম যে, আমরা ভারতীয়রা ভারতবর্ষে যে পরিমাণে জার্মানদের সম্মান দিই ও খাতির করি, তার একাংশ পায় না ভারতীয়রা জার্মানীতে।

আবার গেছলুম জার্মনীতে—১৯৬৪

একই দেশে দুটো সরকার। একই শহরে দুই পরস্পর-বিরোধী রাষ্ট্রিক আন্দোলন চলছে বার্লিনে। বিশ্বের দুই বৃহৎ শক্তি এই বার্লিন শহরের বুকে বসে দুই জার্মানীকে নিয়ে খেলছে রাজনৈতিক খেলা। এমন দৃশ্য পৃথিবীর আর কোনো দেশে দেখা যাবে কিনা সন্দেহ।

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহটি পশ্চিম জার্মানীর ইতিহাসে অনেককাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১লা জুলাই পশ্চিম বার্লিনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়ে গেল। এই নিয়ে পূর্ব জার্মান-সরকার ও সোভিয়েত-সরকার পশ্চিম জার্মান ও পশ্চিমী শক্তিবর্গের কাছে প্রতিবাদ লিপি পাঠিয়েছে। তাদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও পশ্চিম জার্মানীর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। আমি তখন বার্লিনে। বার্লিন প্যালাস আম ফুঙ্কটুর্ম-এর বিরাট হলঘরে হয় নির্বাচন-পর্ব।

এবারকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে গুরুত্ব হল এই জন্যে যে, বার্লিন শহর পট্সডাম চুক্তি অনুযায়ী পশ্চিম জার্মানীর খাস্ এলাকা নয়। এর প্রশাসনিক ব্যবস্থা ফেডারেল গভর্নমেণ্টের থেকে ভিন্ন। ফেডারেল গভর্নমেণ্টের লোকসভা বা বুণ্ডেস্টাগে বার্লিন থেকে কোন নির্বাচিত সদস্য নেই। আছে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাছাই করা কয়েকজন সদস্য। উপরন্তু সোভিয়েত ও পূর্ব জামান-সরকারের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তারা নির্বাচন পালা সাঙ্গ করে।

বার্লিনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন-পর্বের দিন কয়েক আগেই এসে পৌঁছুই বার্লিনে। এত বড় একটা নির্বাচন হয়ে গেল, তার কোনও প্রতিক্রিয়া দেখলাম না সেখানে। নেই হৈ-হট্টগোল, নেই সভা-সমিতির প্রতিযোগিতা, যা হয়ে থাকে আমাদের দেশে। এমন কি সংবাদপত্রে পর্যন্ত কোনও গরম খবর দেখি নি। বরং তখন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল সুরু হয়েছে—তাই নিয়ে জনসাধারণ ব্যস্ত। রাষ্ট্রপতি-নির্বাচন পালার অনেকদিন আগে থেকে সাংবাদিকের দল ফলাফল জানে। সবাই জানে যে, রাষ্ট্রপতি হাইনরিখ ল্যুবকে আবার দ্বিতীয়বারের মতন পুনর্নির্বাচিত হবেন। কারণ রাষ্ট্রপতি ল্যুবকে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাট দলের। কিন্তু তাঁকে তাঁর দল ছাড়া সমর্থন জানায় বিরোধী দল সোস্যাল ডেমোক্রাট পার্টি। তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে লিবারেল দলের এভাল্ড বুখার। বুখার হলেন, বর্তমান কোয়ালিশন সরকারের লিবারেল দলের একজন মন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ সভা-সমিতিতে ভাল ভাল কথা বলেন, দ্বারোদ্ঘাটন করেন, পুরস্কার বিতরণ ও মহিলা-সভায় সভাপতিত্ব করা হল নিয়মিত কাজ। সেদিক দিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা নেই বলেই বোধহয় বার্লিনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তেমন জনসাধাণের উৎসাহ দেখি নি। অবশ্য ইউরোপের জনসাধারণ রাজনীতি নিয়ে বেশী সময় নষ্ট করে না।

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে ফরাসী রাষ্ট্রপতি জেনারেল দ্য গল গিয়েছিলেন বন্-এ জার্মান প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে। আদেনওয়র যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন দ্য গলের সঙ্গে চলত গলাগলি ভাব। এখন সে দৃশ্য বদলেছে। আদেনওয়র বিদায় নিয়েছেন। তাই দ্য গল এখন একা। পশ্চিম জার্মানীর ক্ষমতায় আসীন এরহার্ড দ্য গলের রাজনীতি মানে না। তেমনি আদেনওয়রের। তাই এবারকার দ্য গলের জার্মান পরিদর্শন সার্থক হয় নি। বরং দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মতবিরোধের ফলে দুই দেশের সম্পর্ক তিক্ত হয়েছে।

কয়েক মাস ধরে মার্কিন সংবাদপত্রগুলো জার্মানীর নতুন এক ঐশ্বর্য নিয়ে খুব লেখালেখি করেছে। পশ্চিম জার্মানীর আর্থিক উন্নতি সব দেশকে আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু গত দু'বছরে যে জিনিসটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তা তার আর্থিক ঐশ্বর্য নয়। সে হল 'ফ্রলাইন হবুণ্ডার' অর্থাৎ তরুণী বিস্ময়। পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে জার্মান মেয়েদের সুনাম ছিল এই বলে যে, তারা ভাল গৃহিণী। সংসারে মন দেয়। বিলাসিতায় মন দেয় না, এখন তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। এরা ফরাসী মেয়েদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে বিলাসিতায়। এই নিয়ে সর্বত্র আলোচনা হচ্ছে জার্মানীতে। তার ঢেউ এসে লেগেছে পূর্ব-জার্মানীর কম্যুনিস্ট সমাজে। এই গ্রীষ্মে গরম প্যান্তালুন পরে আঁটো-সাঁটো জামা পরে জার্মান মেয়েরা বেড়াচ্ছে। যা এক যুগ আগেও ছিল অভাবনীয়। বার্লিনে দেখেছি এই দৃশ্য। সেই দৃশ্য দেখলাম কোলন শহরে। কোলনের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রাস্তা হোস্ট্রাসে দিয়ে চললে শুধু 'ফ্রলাইন হবুণ্ডার'ই দেখা যাবে। তাদেরই নগর।

দুই বার্লিনের ভারতীয় সমাজের কথা না বললে সবই অসমাপ্ত থেকে যায়। দুই বার্লিনের ভারতীয় সমাজের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীরা। প্রতি বছরে জুলাই মাসে বার্লিনের ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এ উপস্থিত ভারতীয়দের নিয়ে বসে নানান আড্ডা-সম্মেলন। এবারও তাই হল। একদিন হয় পূর্ব বার্লিনে। আবার পশ্চিম বার্লিনে হয় আইশ ক্যাম্পের আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে। এই দুই সম্মেলনে উপস্থিত ছিল দুই বার্লিনের বাঙালীরা এবং স্থানীয় জার্মানরা। বার্লিনে এই সব ভারতীয়রা বেশ জমিয়ে রেখেছে। এদের আড্ডায় গেলে মনে হবে না যে, আমরা বিদেশে বাস করছি। খানা থেকে আরম্ভ করে আলাপ-আলোচনা সবই ভারতীয়। বরং বলতে পারি যে, ভারতীয়রা এখানে কলোনী খুলে বসেছে।

দুই বার্লিন—১৯৬৫

বার্লিন সমস্যার সমাধান অদূর ভবিষ্যতে হবে বলে কোনও রাজনৈতিক নেতাই মনে করেন না। রুশ-মার্কিন প্রতিযোগিতায় জার্মান নেতারা এখন নিরাশ হতে বাধ্য হয়েছেন। পশ্চিম-বার্লিনের ওপর যখন-তখন রাজনৈতিক চড়-চাপড় মেরে চলেছে অপর পক্ষ। পশ্চিম জার্মান সরকারের কথা বাদ দিলেও, প'শ্চমী শিবিরে ক্ষমতাশালী তিনটি রাষ্ট্র—মার্কিন'যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও বৃটেন পশ্চিম বার্লিনের রক্ষাকর্তা। তারা কাগজে-কলমে প্রতিবাদ জানায় এই পর্যন্ত।

আমি যেদিন বার্লিনে এসে পেঁছিলাম অর্থাৎ ২৯শে জুন, সেদিন পশ্চিম বার্লিনের আকাশে উড়ছিল পূর্ব-জার্মান সরকারের হেলিকপ্টার। এদের মতে সেটা ছিল বে-আইনী। তারপর গেল তার প্রতিবাদ পত্র। ওই পর্যন্ত। এখন শুনছি যে ১লা জুলাই থেকে পূর্ব-জার্মান-সরকার নতুন কর-ভার চাপিয়েছে পশ্চিম বার্লিনের ওপর। এটা পরোক্ষ। যেসব স্টীমার পশ্চিম জার্মানী হতে নদী বয়ে মালপত্র নিয়ে আসে পশ্চিম বার্লিনে সেই সব স্টীমারের ওপর প্রতি ক্ষেপে দুশো টাকা কর ধার্য করেছে পূর্ব জার্মান-সরকার। অর্থাৎ যতই দিন যাচ্ছে ততই একটি রাজনৈতিক চিত্র পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে, পূর্ব জার্মানীর ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক সরকার জলজ্যান্ত। এই সরকারকে পশ্চিমী শক্তিবর্গ স্বীকার করে না বটে কিন্তু তার নিয়ম-কানুন ও সময় সময় জুলুমও মানতে হয় পশ্চিম জার্মানী ও পশ্চিমী শক্তিবর্গকে।

বার্লিনকে নিয়ে এত রাজনৈতিক কাণ্ড-কারখানা ঘটে যাচ্ছে প্রতিদিন কিন্তু দুই বার্লিনের বার্লিনবাসীদের আমি কিন্তু চিন্তাগ্রস্ত হতে দেখি নি। তারা খাচ্ছে-দাচ্ছে আর কাজ করে যাচ্ছে।

কী পুব কী পশ্চিম—দুই বার্লিনের সর্বত্রই লোকাভাব। কাজ আছে, লোক নেই। অল্প লোক নিয়ে কাজ করতে হয় বলে কোনও প্রতিষ্ঠানের মালিক তার কর্মচারিকে বেশী খাটাতে সাহস করে না। দিন কয়েক আগে এখানে হয়ে গেল মিত্রশক্তিবর্গের বার্লিন মুক্তির বিংশ বার্ষিক। পশ্চিম বার্লিনের তিন শক্তির সামরিক কুচকাওয়াজ জানিয়ে দিল যে তারা এখনও পশ্চিম বার্লিনে অবস্থান করছে। পুবের চাপ যতই আসুক না কেন তারা সে চাপ থেকে পশ্চিম বার্লিনকে রক্ষা করবেই।

পশ্চিম বার্লিনকে জলজ্যান্ত রাখার জন্যে চিন্তিত পশ্চিম জার্মানীর প্রতিটি রাজনৈতিক দল। বর্তমানে মন্ত্রি-সভার উপ-প্রধানমন্ত্রী বা ভাইস চ্যান্সেলর হার এরিখ মেন্ডে এসেছিলেন দু-দিনের জন্য পশ্চিম বার্লিনে। বর্তমান মন্ত্রিসভা কোয়ালিশন। ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট দলের সঙ্গে যোগদান করেছে ছোট দল ফ্রী ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। এরিখ মেন্ডে এই দলের নেতা। বার্লিনের সিনেটের সদস্য ও বার্লিনের এফ. ডি পি. দলের সভাপতি হার বোর্ম ও উপ-প্রধানমন্ত্রী এরিখ মেন্ডের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম এক ভোজসভায়। বর্তমান জার্মান রাজনীতি, বার্লিন সমস্যা ও ভারতের সঙ্গে জার্মানীর সম্পর্ক নিয়ে চলে আমাদের আলোচনা। এদের দল চায় ব্যবসা বাণিজ্যে এবং রাজনীতিতে উদারনৈতিক কর্মপদ্ধতি।

একটি সাংবাদিক সভায় পশ্চিম বার্লিনের গভর্নর মেয়র হার উইলি ব্রাণ্ড আমাদের বলেছেন যে, পশ্চিম বার্লিনের স্বাধীনতা তারা যে করে হোক বজায় রাখবেনই। পশ্চিম জার্মানীর সোস্যালিস্ট দলের নেতা উইলি ব্রাণ্ড। আগামী সাধারণ নির্বাচন হবে মাস সাত-আটেক পরে, তারই মহড়া চলছে সর্বত্র। পশ্চিম বার্লিনে তার সূচনা হয়ে গেছে। সব রাজনৈতিক দলের নেতা এখন ঘন ঘন পশ্চিম বার্লিনে আনা-গোনা শুরু করেছে। পশ্চিম জার্মানীতে সাধারণ

নির্বাচন আসন্ন বলেই পূর্ব-জার্মান সরকারের বিভিন্ন দপ্তর এখন বিশেষ ব্যস্ত। পশ্চিম জার্মানীর কোন রাজনৈতিক নেতা হিটলারের আমলে কী করেছেন তাদের ইতিবৃত্ত যোগাড় করে পূর্ব-বার্লিনের রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র মারফত নিয়মিত প্রচারিত হয়। এই রাজনৈতিক লড়াই-এ পূর্ব জার্মান-সরকার পশ্চিম জার্মান-সরকারকে নানাভাবে চাপ দিচ্ছে। সাধারণ নির্বাচন সামনে বলেই পশ্চিম জার্মান-সরকার পূর্ব জার্মান সরকারের সব চাপ নীরবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। দুই জার্মান-সরকারের রাজনৈতিক খেলা উপভোগ্য হবে বার্লিনে এলে। দুই বার্লিনের দুই ভিন্ন সরকার। তাদের রাজনৈতিক কসরত দেখার মতন।

দুই বার্লিনের আর্থিক অবস্থা এতই ভাল যে, দোকান-পাট সব তো জিনিসপত্রে ভর্তি। এক কথায় ফেঁপে উঠেছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে যখন পশ্চিম বার্লিনে এসেছিলাম তখন দেখেছিলাম কর্ফুর্স্টেনডাম রাস্তার ধারে বিখ্যাত বোমা বিধ্বস্ত গীর্জার লাগাও 'ইউরোপা সেণ্টার' অট্টালিকা নির্মিত হচ্ছে। পঁচিশতলার এই বাড়িটিতে যে কী নেই সেটা খুঁজে বার করাই সমস্যা। এখন বাড়ির কাজ চলছে। এই বাড়িটাতে রয়েছে সিনেমা থিয়েটার অফিস কাফে-রেস্তোরাঁ, বাজার, এমন কি এই গ্রীষ্মকালে বরফের ওপর স্কেটিং করার জায়গা। বাড়ির অর্থাৎ তিনতলার মাঝখান দিয়ে রাস্তা গেছে। এটা অনেকটা সাঁকোর মতন। দুই ধারের রাস্তা পেরোনোর হাঙ্গামা নেই। যুদ্ধে বিধ্বস্ত দুই বার্লিন গড়ে উঠছে পাল্লা দিয়ে। পশ্চিম বার্লিনে যেমন বাড়ি ঘর নির্মাণের কাজ চলছে তেমনিভাবে এখন চলেছে পূর্ব বার্লিনে। পশ্চিম বার্লিনে ইউরোপা সেণ্টারের মতন নির্মিত হয়েছে পূর্ব-বার্লিনের আলেকজাণ্ডার প্লাংস-এ ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টারের অট্টালিকা। বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় থাকবে এই বাড়িগুলোতে।

বিগত দিনের 'উন্টান ডেন লিণ্ডেন' সৌখিন রাস্তার জৌলুষ হয়ত আর ফিরে আসবে না কিন্তু তার কিঞ্চিৎ প্রচেষ্টা করে চলেছে পূর্ব বার্লিনের পৌরসভা। উন্টান ডেন লিণ্ডেন রাস্তার ধারে এই কয়েক বছর আগেও দেখেছি ধ্বংসস্তূপ। এখন সেখানে নির্মিত হচ্ছে বিরাট বিরাট অট্টালিকা। চওড়া রাস্তার মাঝখানে সাজান ফুলের গাছ। পূর্ব-বার্লিনের অধিবাসীরা বলেছে যে, ১৯৬৩ সালের পর থেকে পূর্ব বার্লিনে সচ্ছলতা এসেছে। বিলাসিতার গন্ধ সেখানেও পৌঁছেচে যা ছিল আগে একমাত্র পশ্চিম-বার্লিনে। অবশ্য সমানভাবে তুলনা করা চলে না এখনও। তবুও বলব যে, পূর্ব জার্মান সরকার প্রচেষ্টা করে চলেছে তাদের গঠনকার্য।

ক্রুশ্চেভের পতনের পর পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে অল্পবিস্তর আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন হয়েছে। পূর্ব-জার্মানীর আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তেমন বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। পূর্ব জার্মানীর কম্যুনিস্ট দলের এখনও একচ্ছত্র নেতা উলব্রিথট। নতুন প্রধানমন্ত্রী উইলি স্টোপ তার পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী গ্রোট ভোলের মতন তেমন জনপ্রিয় নয়। এদের দলে হার নয়মান নামে এক তরুণ নেতার জনপ্রিয়তা বেশি। ইনি কিন্তু মন্ত্রিসভায় নেই। ভবিষ্যতে নয়মান্ প্রধানমন্ত্রী হলে বিস্মিত হব না। পূর্ব জার্মানীর শাসকগোষ্ঠী অর্থাৎ কম্যুনিস্ট দলের সম্মুখে কোন বিরোধ না থাকলেও ওদের ভেতরে ভেতরে সামান্য বিভেদ দেখা যায় মাঝে মাঝে মস্কো ও পিকিংপন্থীদের মধ্যে। তবে সেটা মতবাদগত। পররাষ্ট্রনীতিতে এরা পুরোপুরি মস্কোর ওপর নির্ভর করতে বাধ্য। নইলে ইউরোপে এদের অস্তিত্ব বজায় রাখা সোজা নয়।

রষ্টক

কাঁটাতারের বেড়া ভেদ করে পূর্ব-বার্লিনে প্রবেশ করেছি নিরাপদে। একটি রাষ্ট্র থেকে আর-একটি রাষ্ট্রে প্রবেশ করতে হলে যে যে হাঙ্গামা পোহাতে হয় অর্থাৎ পাসপোর্ট, ভিসা, কাস্টমস ইত্যাদির ঝামেলা আমাকেও সইতে হয়েছে। বিদেশী বা পশ্চিম জার্মানীর বাসিন্দাদের পূর্ব-বার্লিনের কর্তারা বিনা বাধায় প্রবেশানুমতি দিয়ে থাকেন, কিন্তু পশ্চিম বার্লিনবাসীদের নয়। পূর্ব-বার্লিনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পশ্চিম বার্লিনবাসীদের যেন আদায়-কাঁচকলার সম্পর্ক।

পূর্ব-বার্লিন থেকে যেদিন রষ্টকের পথে রওনা দিলাম সেদিন ওখানে ভরা বর্ষা। বর্ষা বাদলে পথঘাট প্যাচপেচে। রষ্টক পূর্ব-জার্মানীর সবচেয়ে বড় বন্দর। বড় বড় জাহাজ এখানে ভেড়ে, মায় ভারতীয় জাহাজ পর্যন্ত। সমুদ্র-পথে পূর্ব জার্মানীর ব্যবসা চলে এই বন্দর দিয়ে। রষ্টক শুধু বন্দর নয়, জাহাজঘাটা ও জাহাজ নির্মাণের বড় বড় কারখানা সেখানে।

রষ্টক এই ভরা গ্রীষ্মে আনন্দ মুখর এইজন্যে যে, রষ্টক শুধু বন্দর নয়, রষ্টকের কাছেই ভার্নেমুণ্ডের সমুদ্রসৈকতে কাতারে কাতারে টুরিস্টের দল আসে ছুটি কাটাতে। টুরিস্টরাই রস্টক নগরীকে এত আনন্দ-মুখর করে রেখেছে।

পূর্ব-বার্লিনের শেষ প্রান্তর 'পানকোভে'র মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি নয়স্টারলিংজ ও নয়ব্রাণ্ডেনবুর্গের পথে। পশ্চিমী দেশের খবরের কাগজে প্রায়ই দেখা যাবে 'পানকোভ' সরকারের কেলেঙ্কারির কথা। তারা পূর্ব-জার্মান সরকার না বলে 'পানকোভ' সরকার বলে এই জন্যে যে, পূর্ব-জার্মান-সরকারের কর্ণধার ও রাজনৈতিক নেতারা প্রায় সবাই 'পানকোভ' একটি ছোটখাট 'কলোনি'তে বাস করে। পূর্ব-বার্লিন হতে রষ্টকের দূরত্ব ২৫০ কিলোমিটার। সময়

লাগে পাঁচ ঘণ্টা। আমার সঙ্গী গাড়িতে উঠে শুধু খাই খাই করছে। সঙ্গে করে সে এক পোঁটলা সাণ্ডুইচ এনেছে। তাই সে চিবোচ্ছে। আশী কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে নয়স্ট্রারলিংজ শহরে পৌঁছে সে রেস্তোরাঁর খোঁজে ছোটে। সেখানকার খাদ্য তার মনঃপূত হলো না। অগত্যা আমরা নয়ব্রাণ্ডেনবুর্গের পথে মোটরের গতি বাড়াতে বাধ্য হলাম। এই দুই শহরে দেখছি, আরও অনেক নতুন পথ-ঘাট নির্মিত হয়েছে। আরও নতুন নতুন বাড়ি-ঘর তৈরী হয়ে চলেছে। এককালে এগুলো ছিল ধ্বংসস্তূপের ওপর। এখন সারি সারি অট্টালিকা। পূর্ব জার্মান সরকার আর যাই করুক, গৃহ নির্মাণ করে চলেছে নিয়মিত। বছর দুই আগে যা দেখেছিলাম এবার দেখছি আরও নতুন নতুন অট্টালিকা। তবে এগুলো প্রাসাদ নয়। শ্রমিকদের জন্তে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর। রান্না ও স্নানের ঘর সমেত।

আমার সঙ্গী শ্বোয়াইরিনের অধিবাসী। শ্বোয়াইরিন শহর ঐতিহাসিক। তাঁর মতে শ্বোয়াইরিনের কাছে কেউ লাগে না। সেখানাকার ছোট কাফে-রেস্তোরাঁয় নাকি অমৃত পরিবেশন হয়। জানি না কতখানি সত্যি। যাই হোক, আমার পেটুক সঙ্গী গুশত্রো নামে এক ছোট ও অ জ্ঞাতনামা এক শহরের ক্ষুদ্রস্য ক্ষুদ্র এক গেঁয়ো রেস্তোরাঁয় আমাকে টেনে নিয়ে হাজির। ওখানে নাকি তার পছন্দসই ‘অমৃত’ পাওয়া যায়. কিন্তু যা খেলাম তা আর ভুলবার নয়। সন্ধ্যাবেলা রষ্টক এসে পৌঁছলাম। গতবারে যে হোটেলে এসে উঠেছিলাম, এবারও সেই হোটেলে উঠতে হল। দু বছর আগে এই হোটেল সবেমাত্র নির্মিত হয়েছে। তখন তাতে ছিল না ‘লিফট’, ছিল না রেস্তোরাঁ-কাফে। এবার দেখেছি তার সঙ্গে জোড়া হয়েছে লিফট্, রেস্তোরাঁ-কাফে।

রষ্টক আজকের বন্দর নয়, শহর হিসেবেও পুরোনো। জার্মানীর ব্যবসা-বাণিজ্যের দলকে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বলা হত হান্সা।

হান্সা দলের প্রভাব শুধু রষ্টকে নয়, সমগ্র উত্তর জার্মানী হল্যাণ্ড-বেলজিয়ামেও প্রভাবিত হয়েছিল। রষ্টকে তার স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে স্থাপত্যে। রষ্টক বিশ্ববিদ্যালয় তিন-চারশ বছরের পুরোনো। হান্সাদের প্রভাব সেখানেও পাওয়া যাবে। শহরের মধ্যভাগে যেখানে এককালে হাট-বাজার বসত, সেই পাড়ায় রষ্টক পৌরসভা ভবন বা টাউন হল। তারই চারধারে দোকান-পাট হাট-বাজার। এখানকার বাড়িঘর সবই হান্সাদের স্মৃতি বহন করে চলেছে। একালে তার নাম ঠালমান্ প্লাৎজ। ৭ই জুলাই ওই ঠালমান্ প্লাৎজে রষ্টকের 'ওষ্ট সী ভোকে' উৎসব সরকারীভাবে উদ্বোধন করলেন পূর্ব জার্মান সরকারের প্রধানমন্ত্রী হার উলব্রিথ্‌স্ট। মঞ্চের ওপর শুধু প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন না, ছিলেন উলব্রিথ্‌স্ট মন্ত্রিসভার প্রায় সবাই। সামনে জনতার মধ্যে শিশু ও কিশোরদের সংখ্যাই বেশী। এরা 'পাইওনিয়ার' ও 'এফ. ডি. জি' বা যুব-সঙ্ঘের সভ্য।

রষ্টকের পথে-ঘাটে যেন শিশুর মেলা। শুধু রষ্টকে নয়, সমগ্র পূর্ব-জার্মানীতে খালি শিশুর দল: এরা এল কোথা থেকে? পূর্ব জার্মানীতে এখন লোকসমস্যা চলেছে। প্রাপ্তবয়স্কদের সংখ্যা কম। তাদের অনেকে পালিয়েছে পশ্চিম জার্মানীতে। যারা আছে তাদের বয়স পঞ্চাশের ওপরে, আর নয় শিশুর দল। এদের দিয়ে কল-কারখানা চালান মুস্কিল। যুবক ও মধ্যবয়সীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। পূর্ব-জার্মানীতে লোকাভাব। তাই ডকে, কল-কারখানায়, রেল লাইনে কাজ করছে মেয়ে শ্রমিকের দল। যা অন্য দেশে কম দেখা যায়। পূর্ব-জার্মানীতে প্রায় শতকরা আশিটি মেয়েই একটা-না-একটা চাকরি করে।

রষ্টক দুই ভাগে বিভক্ত। পুরাতন রষ্টকে হান্সা প্যাটার্নের বাড়ি। নতুন রষ্টকে দেখা যাবে নতুন বাড়ির প্রদর্শনী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে মার্কিন বোমারু বিমান এক রাতে রষ্টককে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। তারপর থেকে নির্মিত হয়ে চলেছে বাড়ি আর বাড়ি।

এযাবৎ সরকার নতুন রষ্টকে নির্মাণ করেছে বার হাজার ফ্ল্যাট। এক-একটি ফ্ল্যাটে বা এ্যাপার্টমেণ্ট দুই তিন চার ঘর সম্বলিত। ফ্ল্যাটের ভাড়া ত্রিশ টাকা। গ্যাস ও ইলেকট্রিকের মাসিক খরচ পনর টাকা। উঁচু তলার বাড়িতে আছে লিফ্‌ট। এমনি এক বাড়িতে গিয়ে আমরা উপস্থিত। বাড়ির কর্তা বুড়ো মানুষ। তিনিও কাজ করেন। স্ত্রী পেনসন পান। রোজগার মাসে চারশ টাকা। তার মেয়েও তার সঙ্গে বসবাস করে। সে মাসে রোজগার করে তিনশ টাকা। তিনজনের মাসে খাওয়া-থাকা খরচ পড়ে তিন থেকে চারশ মার্ক। ঘরে দেখলাম রেডিও ও টেলিভিশনের সেটও রয়েছে।

নতুন রষ্টকে স্টেডিয়ামও নির্মিত হয়েছে। ত্রিশ হাজার দর্শকের জায়গা আছে তাতে। ওখানেই গোটা আটেক বড় বড় হাসপাতাল। রষ্টক বিশ্ববিদ্যালয় এখানে নতুন একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে। সেটি হল জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ চালনা ও জাহাজ-বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা ফ্যাকালটি. তারই পাশে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর ছাত্রাবাস। এসব দেখে আমার মনে হল বর্ধমান বা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অমন অবস্থা হবে কবে? কতকাল পরে কে জানে!

রষ্টকে উৎসব চলাকালে ভার্নেমুণ্ডের কুরহাউস-এ পূর্ব-জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ লোথার বোলজ এক অভ্যর্থনা দেন গণ্যমান্য অতিথিদের। পূর্ব জার্মানীর সব নেতারাই সেদিন ওখানে উপস্থিত ছিলেন। বিরাট সান্ধ্য-সভায় খানা-পিনা ও বাদ্যের মাঝে প্রধানমন্ত্রী হার উলব্রিখ্‌ট যা বললেন তা হল পূর্ব-পশ্চিমের রাজনৈতিক বিরোধ। পররাষ্ট্র মন্ত্রী লোথার বোলজও। বক্তৃতার পরে চলে খানা ও পিনা। আমার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী হার উলব্রিখ্‌ট-এর যখন পরিচয় হল তখন আমাদের ভাষার সমস্যার সমাধান করেছিলেন শ্রীমতী উলব্রিখ্‌ট। শ্রীমতী উলব্রিখ্‌ট পূর্ব-জার্মান রাজনীতিতে হার উলব্রিখ্‌টের পরেই স্থান পেয়েছেন। তিনি

হিটলারের আমলে জার্মানী ত্যাগ করে মস্কোতে পালাতে বাধ্য হন। এঁরা দুজনেই জব্বর কমিউনিস্ট। হার উলব্রিখ্‌স্টের হয়ে শ্রীমতী উল্‌ব্রিখষ্ট আমায় বললেন, "পূর্ব-জার্মানী একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। আমরা শান্তি কামনা করি। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীর লড়াইপ্রিয়রা যুদ্ধের প্রস্তুতি করছে। আর তাদের ইন্ধন যোগাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দিচ্ছে উস্কানি। এখন থেকে সব রাষ্ট্রকেই তাদের নীতি নির্ধারণ করতে হবে। কারণ এবার যদি যুদ্ধ বাধে তাহলে তা হবে না ছোটখাট কোরিয়া বা লাওসের মতন যুদ্ধ। হবে বিশ্বযুদ্ধ। কেউ সেই যুদ্ধ থেকে নিস্তার পাবে না। আমাদের সহ্যক্ষমতার সীমা আছে, আমরাও একেবারে একা ও দুর্বল নই।" আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যুদ্ধ কি শিগগিরই লাগবে? উত্তরে তিনি জানান, ঠিক কবে তা বলা মুস্কিল। আমাদের যখন কথা হচ্ছিল তখন হার উলব্রিখ্‌স্ট আমাদের আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। আর হাসছিলেন মাঝে মাঝে।

সুইৎসারল্যাণ্ড

এতকাল প্যারিসে বাস করে বৃহত্তম নগরীর কোলাহলমুখর জীবন ধাতস্থ হয়ে গেছে। বিশ্বের বৃহত্তম নগরীগুলো সবই প্রায় এক ধরনের। ইট-লোহা-কাঠের নায়ক। যান্ত্রিক দৈত্যই হল এসব নগরীর চালক। তাদেরই কথায় উঠতে বসতে হয়। আমাদের কলকাতাও এই গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে।

নগরীশ্রেষ্ঠা প্যারিসের সৌন্দর্য দেখে দেখে এতদিন গা সওয়া হয়ে গেছে। প্যারিসের সৌন্দর্য যতটা মনুষ্যসৃষ্ট, ততটা প্রাকৃতিক নয়। সেদিক থেকে সুইৎসারল্যাণ্ডের ছোট বড় শহরগুলো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দাবী করতে পারে। সুইৎসারল্যাণ্ডের ছোট-বড় শহরগুলো দেখলে মনে হয় যেন, প্রকৃতি দেবী তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য দিয়ে নিজে হাতে গড়েছেন, কার্পণ্য করেন নি একটুও।

দেশ হিসেবে ফ্রান্স বাংলাদেশের মতন শস্য-শ্যামলা সবুজের দেশ। কিন্তু সুইৎসারল্যাণ্ড ছোট্ট, পাহাড়ে ঘেরা, সেই সঙ্গে ছড়িয়ে আছে অজস্র ছোট-বড় হ্রদ। ছোট ছোট গ্রামগুলো দাঁড়িয়ে আছে এই সব হ্রদের ধারে। পাহাড়গুলো যেন দাঁড়িয়ে আছে পাহারা দেবার জন্যেই।

আরও খতিয়ে দেখলে এই মনে হবে যে, কবিদের স্বপ্ন একমাত্র এখানেই সার্থক হয়েছে। এখানকার গাছপালা জলা পাহাড় যেন সত্যি সত্যিই কাব্যের অলঙ্কার। প্যারিসের কোলাহলমুখর বিমানবন্দর ছেড়ে দেড় ঘণ্টার মধ্যেই জেনেভায় পৌঁছলাম। কিন্তু এ কি! জেনেভা না আন্তর্জাতিক শহর! আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান-গুলোর পীঠস্থান—বিগত জাতিসংঘের কেন্দ্রস্থল। জেনেভার বিমান বন্দর পাটনার বিমান-বন্দরকেও হার মানিয়েছে। বিমান-বন্দর থেকে কয়েক মিনিটের মধ্যেই জেনেভা শহরের প্রাণকেন্দ্রে এসে উপস্থিত হলাম। জেনেভা শহর হিসেবে যে আন্তর্জাতিক সে-

বিস্ময়ে সন্দেহ নেই, কারণ পৃথিবীর সব দেশেরই অধিবাসী ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এখানে বসবাস করেন। দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে শহর প্রদক্ষিণ করে এলে মনে হবে যেন ফ্রান্সের একটি মফস্বলের শহর। আয়তনে ক্ষুদ্র তো বটেই, লোকসংখ্যা মাত্র দেড় লক্ষ।

সুইৎসারল্যাণ্ডের রাজধানী বার্ন জেনেভার চেয়েও ছোট—লোকসংখ্যা এক লক্ষেরও কম। একমাত্র জনবহুল শহর হল ৎসুরিখ, লোকসংখ্যা চার লক্ষ। ৎসুরিখ শিল্প-কারখানার শহর।

আমার কাছে কিন্তু বার্ন শহরটি ভাল লেগেছে। পাহাড়ে ঘেরা এবং শহরটিও ছোট পাহাড়ের ওপর, মাঝখান দিয়ে নালার মতন একটি ছোট্ট নদী বয়ে গেছে। বার্ন রাজধানী। তাই সমস্ত দূতাবাস ও সরকারী প্রধান কার্যালয়গুলো এখানেই। তা সত্ত্বেও মনে হবে যেন ঘুমন্ত রাজপুরী। জেনেভায় সন্ধ্যের পর সাতটা-আটটা পর্যন্ত জেনেভা লেকের ধারে 'কে মো ব্লার' ধারে অনেকে বেড়াতে বেড়োন। কিন্তু বার্নে সন্ধ্যের পর অনেক রাজপথ জনশূন্য। নির্জন।

প্যারিস বা কলকাতায় ঠিক তার উল্টোটা। চায়ের দোকানে বা কাফেতে গেলে পাওয়া যাবে প্রাণের চাঞ্চল্য। প্রাণখোলা কথাবার্তার ঢেউ এসে লাগবে কানে। সেখানে আছে হৃদ্যতার ছাপ। আর এখানে সুইৎসারল্যাণ্ডের কাফেগুলোতে আছে ব্যবসার ছাপ।

সুইসরা ব্যবসা ভাল বোঝেন, তাই তাঁরা রাস্তায় অসংখ্য ব্যাঙ্ক খুলেছেন। যেমন প্যারিসে রাস্তার ধারে অসংখ্য কাফে। সুইৎসারল্যাণ্ডের ছোট-বড় শহরের রাস্তায় সংস্কৃতির ছাপ দেখতে পাওয়া বেশ কষ্টকর। কিন্তু ঐশ্বর্য সবার চোখেই পড়বে। ভিখিরী জাতীয় কোনো ব্যক্তিকে খুঁজে বার করতে হলে অনেক পরিশ্রম প্রয়োজন হবে। সুইসদের এত ঐশ্বর্য থাকতেও যে কেন এত

দুর্ভাগ্য তা একটু খতিয়ে না দেখলে পরিষ্কার হবে না। এদের ব্যাঙ্কে বিদেশী ধনীদের গচ্ছিত অর্থ প্রতিদিনই স্ফীত হচ্ছে। সেই টাকায় অর্থাৎ পরের ধনে পোদ্দারি এঁরা করছেন। বিনা পরিশ্রমে পরের অর্থ ভোগকারী সুইসরা মানসিক অশান্তিতে এত ভোগেন কেন তা জিজ্ঞাসা করলাম আমার এক বন্ধুকে। তার উত্তরে তিনি যা বললেন তা শুনে স্তম্ভিত হবার যোগাড়। তিনি বললেন যে, 'একমাত্র বার্ন শহরে প্রতিদিন অন্ততঃ একটি করে আত্মহত্যার খবর পাই আমরা। আর ডিভোর্স-সংখ্যা ইউরোপের মধ্যে এখানে সবচেয়ে বেশী। আরও আছে—কেউই বিবাহ করতে চান না। তাই অবিবাহিতের সংখ্যাও প্রচুর' সবাই প্রতি রাত্রে টাকার হিসেব করছেন আর ভাবছেন যে, তাঁর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স কমছে না বাড়ছে।

এখানে আত্মহত্যার কারণ নিশ্চয়ই আর্থিক অনটন নয়, মানসিক। অভাব নেই, কিন্তু নেই সেই সঙ্গে শান্তি। এ যেন অভিশাপ। বর্তমান সভ্যতার অভিশাপ।

চুরি ডাকাতি এখানে নেই সত্যি। কিন্তু নর-নারীর পারিবারিক জীবন স্বাভাবিক নয়। সেখানে প্রচুর আবর্জনা বার্নে সুইস সরকারী মহলে ঘোরাফেরা করে বুঝলাম যে, এরা নিরপেক্ষ জাতি হিসেবে পরিচিত বটে কিন্তু ইংরেজদেরও ওপরে যায়। মুখে শান্তির বুলি কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভীষণ সংরক্ষণশীল ও ঘোর মার্কিনপন্থী যুদ্ধবাদী।

বার্ণে ভারতীয় দূতাবাসের অন্যতম কর্মচারী এবং স্বর্গীয় অধ্যাপক বিনয় সরকারের একমাত্র কন্যা ডক্টর ইন্দিরা সরকার আমায় বললে যে, আজ রাত নটায় এখানকার কাজিনোতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ছবি দেখান হবে ও সেই সঙ্গে এক সুইস সাংবাদিক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবে—যাবে তুমি? সে রাত্রে যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হলাম আমরা দুজনে। গিয়ে দেখি হল-ঘরে একতিল স্থান নেই। তায় আবার দক্ষিণা দিয়ে ছবি দেখতে ও বক্তৃতা শুনতে এসেছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আগ্রহ আছে দেখলাম দর্শকদের।

সুইস সাংবাদিক লুই মাতেলো নাকি ভারতবর্ষে কয়েক বছর ছিলেন। তিনি কী সাংবাদিকের কাজ করেছেন তা তিনিই জানেন। তিনি প্রায় হাজার পৃষ্ঠার এক বই লিখেছেন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে। তাতে প্রচুর ছবি। সাংবাদিক মাতেলো মশাই নেহরুর পোশাক পরে এসে হাতজোড় করে নমস্কার জানালেন এবং পরে জার্মান ভাষায় ছোট্ট বক্তৃতা দিয়ে ছবি দেখালেন ত্রাবাঙ্কোরের নারকেল গাছ ও দড়ি পাকানোর ওপর। ছবিটি যে কত কুৎসিত হতে পারে তা নিজের চক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। তার সঙ্গে হাতি, ঘোড়াও দেখিয়েছেন। দক্ষিণ-ভারতের এক বন্ধুও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বললেন যে, মাতেলো একটা জিনিস দেখাতে ভুলে গেছেন, সেটা হল দোসা ও রসম। এ দুটো দেখালে ছবিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হত

তারপর তিনি বক্তৃতায় বললেন যে, ভারতবর্ষের লোকেরা খুব নিরীহ ও ভাল। যদিও অনেক কুসংস্কার আছে তাহলেও অতিথি-পরায়ণ। তারপর তিনি আবার দেখাতে লাগলেন মধ্যপ্রদেশের আদিম জাতিদের বিভিন্ন ছবি।

এরাই নাকি প্রকৃত ভারতবাসী। বক্তৃতার পর মাতেলো-মশাইকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তিনি কি ভারতবর্ষে সাপ, ব্যাং ও

আদিম জাতি ছাড়া আর কিছুই দেখেন নি। সেখানে আরও অনেক লোক জড়ো হলে আমি বললাম যে, আপনি কেন কলকাতা বা বঙ্গের ছবি দেখালেন না, সেখানে রাস্তায় বাঘ-সিংহ অনায়াসে ঘুরে বেড়ায়। তা শুনে কয়েকজন ভদ্রমহিলা তো ফিট হতে হতে উঠে পড়লেন। এ সব বুঝে মাতেলোমশাই সটকে পড়তে চেষ্টা করলেন। বক্তৃতার পর তিনি নিজ স্বাক্ষরিত বই চড়া দরে বেচতে লাগলেন। সেই বইয়ে ভারতবর্ষের আদিম জাতির প্রচুর নগ্ন ছবি ও বাঘ-ভাল্লুকের ছবিতে ভরা। এ-ঘটনা শুধু সুইৎসারল্যাণ্ডেই ঘটছে তা নয়, সমগ্র ইউরোপ জুড়ে হচ্ছে। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য, আদিম জাতি ও বাঘ-ভাল্লুক ইউরোপীয়দের সান্ধ্য-বৈঠকের খোরাক যোগায়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইউরোপীয়রা যে কত অজ্ঞ তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না।

জেনেভায় ফিরে পুরোনো এক মার্কিন বন্ধুর সঙ্গে দেখা, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম সুইসদের সম্পর্কে তাঁর কি অভিমত। তার উত্তরে তিনি জানালেন যে, এখানে সুইসরা খুবই সৌজন্য প্রকাশ করে থাকে। তবে সে সৌজন্য আন্তরিক নয়, মৌখিক। তিনি এক বছর এখানে বাস করে হাঁপিয়ে উঠেছেন। কালই সুইৎসারল্যাণ্ড ত্যাগ করে দেশে ফিরে যাচ্ছেন। সেই সঙ্গে আমিও পরদিন রওনা হলাম।

রোমের পথে

কোথায় গেল সেই নীলাকাশ, রৌদ্রোজ্জ্বল দিনগুলো! এসিয়া ছেড়ে আফ্রিকায় পেয়েছি নীলাকাশ আর রৌদ্রে-ভরা দিন। কিন্তু যেই পা দিয়েছি ইউরোপের মাটিতে অমনি পেলাম কালো মেঘে-ভরা আকাশ আর কনকনে ঠাণ্ডা।

এক রৌদোজ্জ্বল সকালে কাইরো থেকে বিমানে এথেন্স ও রোমের অভিমুখে রওনা হলুম। দুপুরবেলা ভূমধ্য-সাগরের তীরে গ্রীসের ছড়ান দ্বীপগুলো চমৎকার দেখাচ্ছিল। ওপর থেকে সমুদ্রের *জল দেখা যায়; যেন সবুজ রঙের। দ্বীপগুলোর ওপরে তখনও সূর্যের হাসি ঝরে পড়ছিল। দক্ষিণ গ্রীসের দ্বীপময় পাদদেশ যত রৌদ্রোজ্জ্বল ছিল ততখানি ছিল না মূল এথেন্স নগরীতেও। এথেন্স তখন কুয়াশায় ঢাকা।

চেহারায় গ্রীক ও ইজিপশীয়দের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। তেমনি ইতালীয়ানদের সঙ্গেও। এই জাতই বেশ ঢিলেঢালা। এদের মধ্যে নেই ইউরোপের নার্ডিক জাতের কাঠিন্য। তাই ইজিপশীয়, গ্রীক ও ইতালীয়ান সুন্দরীরা ইউরোপের সের'; খানাপিনায় এই তিন জাতের অনেক মিল আছে।

গ্রীকরা জাতে ইউরোপীয়, কিন্তু ইউরোপীয় রাজনীতিতে নেই তার স্থান। গ্রীস আর আগের গ্রীস নেই। গ্রীকরাই বলছে, 'দেখুন মশাই, ইংরেজ, ফরাসী, আমেরিকান প্রভৃতি গোষ্ঠীর কাছে এখন আমরা দয়ার পাত্র, গলগ্রহ। আমরা ইউরোপীয় সত্যি, কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নেই আমাদের স্থান। আমাদেরই দেশের একাংশ সাইপ্রাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে ইংরেজ। তাতে সায় দিচ্ছে ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী। আমাদের সাইপ্রাসের ভাইয়েরা আজও পূর্ণ স্বাধীনতা পেল না। একটি ইউরোপীয় দেশ করছে কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের ওপর অকথ্য অত্যাচার। সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে

আমাদের দেশের একাংশে আজও চলেছে অন্তর্কলহ। থাকগে রাজনীতি। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখে এথেন্স নগরী ত্যাগ করে এবার উড়লাম রোমের পথে। আরে সর্বনাশ! রোমে নামব কি, খালি উড়ন্ত মেঘ। কনকনে ঠাণ্ডা তার সঙ্গে বৃষ্টি। সন্ধ্যের একটু আগেই রোম এয়ারপোর্ট ছেড়ে শহরের অভিমুখে রওনা হলাম। পথে দেখি বড়দিন উৎসবের আয়োজন। ক্রীষ্টমাস-এর এখনও অনেক দেরী, কিন্তু রোমনগরী ক্রীষ্টমাস উৎসবের সাজে সেজেছেন অনেক আগেই। ইতালীয়ানরা গোঁড়া ক্যাথলিক। মানত তো রোজই লেগে আছে গোঁড়া ক্যাথলিকরা পুজো-আচ্চায় হিন্দুদেরও হার মানায়। তাই খ্রীষ্টের জন্মদিন এরা জাঁকজমক করেই করে। ফরাসী বা ইংরেজদের মতন নয়। এ-বিষয়ে জার্মানরাও কম যায় না। জার্মানরা ক্রীষ্টমাস বেশ ঘটা করে পালন করে। সবাই দেখছি রোমের দোকানগুলোতে ভিড জমিয়েছে এখন থেকেই ক্রীষ্টমাসের সওদা আরম্ভ হয়ে গেছে।

শহর হিসেবে কোনও শহরের চেয়ে রোম নিকৃষ্ট নয়। কিন্তু আয়তনে বড় ছোট। লণ্ডন প্যারিসের মতন বড় নয়। ইতালীর অন্যান্য শহরগুলোও রোমের মতনই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাচীন ও নতুন অট্টালিকায় মিলে গড়েছে আধুনিক রোম। প্রাচীন রোমের ধ্বংসাবশেষ আজও পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই সঙ্গে আকর্ষণ করবে নতুন ঢঙয়ের আধুনিক স্থাপত্যের নিদর্শন অট্টালিকাগুলো। স্থাপত্য ও আর্টের ব্যাপারে রোম ইউরোপের যে কোনও শহরকে চ্যালেঞ্জ দিতে পারে.

একধারে রয়েছে রোমে সেকেলে পুরোনো পথঘাট, অপরদিকে রয়েছে নতুন সড়ক। রোমের আভিজাত্যকে নস্যাৎ করা সহজ কাজ নয়। তাই রোমের এত আদর।

রোম-নারীর মতন রোমের নরনারীরাও এক তাজ্জব জাত।

এদের দেখে মনেই হবে না যে, এককালে এরাই ছিল সেই রোমান, যারা সমগ্র ইউরোপে করেছে আধিপত্য।

ভাটিকান শহর তো তীর্থস্থান নয়, যেন রাজনীতির পীঠস্থান। ধর্মের নামে যে রাজনীতির খলা চলে ভাটিকান না গেলে মালুম হবে না। এবিষয়ে ভাটিকান মক্কাকেও হার মানিয়েছে।

রেনেসাঁ যুগের রোম এখনও দাঁড়িয়ে এখানে-সেখানে। ভেনিস প্যালেস্ এখনও আছে দাঁড়িয়ে। এই ভেনিস প্রাসাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন মুসোলিনি। মুসোলিনি আনতে চেয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীর রোমের বুকে নবজন্ম বা রেনেসাঁ। তাঁর সে স্বপ্ন সফল হয়েও হল না। রেনেসাঁ যুগের রোম ডুবে গেছে, এখন যা আছে তা শুধু তার পাঁজর কখানা। সেই প্রাচীন রোম, রেনেসাঁ যুগের রোম এখন মার্কিন গোষ্ঠার কথায় ওঠে-বসে। মার্কিন আর্থিক সাহায্যে ইতালীয়ান অর্থনীতি ও শিল্প বেশ কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু সেই আর্থিক সাহায্যের কৃত্রিম বল দিন দিন শিথিল হয়ে আসছে। এখন নতুন বাড়িতে ফ্ল্যাট পাওয়া যায়, কিন্তু পাওয়া যায় না তার খদ্দের। এমনি করে তার আর্থিক দুর্যোগের কালো মেঘ দিন দিন ঘনীভূত হচ্ছে।

ফ্রান্সে কম্যুনিস্ট দল বিপর্যয়ের মুখে। কিন্তু ইতালীতে কম্যুনিস্ট দল বেশ ভারি। ইতালীতে আর্থিক দুর্গতি যত বেশী বাড়বে ততই বাড়বে কম্যুনিস্টদের প্রতিপত্তি। কে যে যাবে আর কে যে আসবে তা বলা মুশকিল।

তোরিনো থেকে মিলানো

ইতালিয়ান ভাষায় ইতালির শহরগুলোর নাম এক, ইংরেজী ভাষায় আর এক। একই জায়গার নাম যে কত বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয় তার উদাহরণ কলকাতা, বর্ধমান। ইতালির কথা না হয় বাদই দিলাম। ইংরেজরা কলকাতাকে বানিয়েছে ক্যালকাটা, জার্মানরা বলে কালকুটা, ফরাসীরা বলে ক্বালকুত্তা। সুন্দর শব্দ বর্ধমানকে ইংরেজরা উচ্চারণ করে বার্ডওয়ান। বিকৃত উচ্চারণ নিশ্চয়ই কৃতিত্বের কথা নয়। তেমনি ইতালির বিশ্ববিখ্যাত জায়গাগুলোর নাম এমনই বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয় যে, খোদ ইতালিয়ানরা পর্যন্ত তোবা তোবা করতে থাকে। ইতালিয়ান ভাষায় মধুরভাবে উচ্চারিত হয় তোরিনো, মিলানো, রোমা, নাপলি, ভেনিৎসিয়া, ফিরেঞ্জি ইত্যাদি। ইংরেজরা ওগুলোর উচ্চারণ করে টুরিন, মিলান, নেপল্‌স, ভেনিস, ফ্লোরেন্স রোম। ফরাসীরা বলে তুরাঁ, মিলঁ, রম্‌, নাপ্‌ল্‌স, ভেনিজ ফ্লোরঁস। জার্মানরা আরও সাংঘাতিক। গত বছরে জুলাই মাসে অষ্ট্রিয়ার শাল্‌জবুর্গ শহর থেকে ইন্‌সব্রুক-এর পথে চলেছি। ট্রেনের কামরায় ছিলেন এক মার্কিন মহিলা। তিনি যাবেন মিলানোতে। তাই তাঁকে ট্রেন বদলাতে হবে ইন্‌সব্রুকে। সেই ভদ্রমহিলা ইংরেজীতে স্টেশনে রেল কর্মচারিদের জিজ্ঞাসা করছেন কোন ট্রেন যাবে মিলানে। মিলান বলতে জার্মানভাষী অষ্ট্রিয়ানরা কিছুই বোঝে না। তারা বলে আমরা জানি না। এক অষ্ট্রিয়ান ভদ্রমহিলা এগিয়ে এলেন তাঁকে সাহায্য করতে। মার্কিন মহিলা তাঁর স্বভবগত মার্কিনি টানে উচ্চারণ করছিলেন মিলান। তা বোঝার সাধ্য নেই কারুর। অষ্ট্রিয়ান মহিলা তাঁকে উপদেশ দিলেন জার্মান ভাষায় উচ্চারণ করতে। জার্মান ভাষায় মিলানো শহরের নাম মিল্যাণ্ড। মার্কিণ মহিলা ছিলেন রসিকা। তিনি হেসে

বললেন ও! ও! মাইল্যাণ্ড। তাই বল। এ যে একেবারে আমেরিকান! হায় ভগবান কোথায় মিলানো আর কোথায় মিল্যাণ্ড বা মাইল্যাণ্ড! এমনি বিকৃত উচ্চারণ চলে আসছে বিশ্বের সব দেশেই। এ যেন রেওয়াজ। রামায়ণের আমলের অমন সুন্দর নাম অযোধ্যা, যে শহর এখনও বেঁচে আছে উত্তরপ্রদেশে, সেই অযোধ্যাকে ইংরেজরা বানাল আউধ। আউধ শুনে অনেকেই রাম নাম উচ্চারণ সুরু করবেন।

আমরা তিনজনে চলেছি উত্তর ইতালি ভ্রমণে। তিনজনের মধ্যে একজন বঙ্গচন্দ্র, অপর দুই ফরাসী ও চিলিয়ান—দক্ষিণ আমেরিকার চিলির লোক। প্রথম ধাপ প্যারিস থেকে তোরিনো শহর। তোরিনো থেকে সমগ্র আল্পস পর্বতমালা বেষ্টিত উত্তর ইতালি, সেখান থেকে লাগো কোমো (ইংরেজীতে বলে লেক কম), লাগো কোমো যেন কাশ্মীর, সেখান থেকে মিলানো, মিলানো থেকে আবার তোরিনো।

ইউরোপে ইতালিই একমাত্র দেশ যার রাজধানী অনেকগুলো। অবশ্য সত্যিকারের রাজধানী একটিই—সে হল রোম। ব্যবসা-বানিজ্যের রাজধানী মিলানো। যন্ত্রপাতি কলকারখানার রাজধানী তোরিনো। এর পরে রয়েছে ভেনিস, নেপল্স, ফ্লোরেন্স, জেনোয়া ইত্যাদি। প্রতিটি শহরের গুরুত্ব প্রায় সমান। আরও এই শহরগুলোর লোকসংখ্যা গড়পড়তা দশ থেকে পনের লক্ষ। প্রথম তিনটির গুরুত্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ছাড়াও রয়েছে টুরিস্টিক। ইতালির সব শহরগুলোই টুরিস্টিক। সমগ্র ইতালিই দেখবার মতন। জলহাওয়া, প্রাকৃতিক দৃশ্য ছাড়াও ঐতিহাসিক ঐশ্বর্যই টুরিস্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চারিধারে শুধু রাজপ্রাসাদ—রেনেসাঁ যুগের স্থাপত্য আর চিত্রকলার নিদর্শনে পথিকমাত্রই থমকে দাঁড়াতে বাধ্য। ইতালির কোন্ শহরে যে ঐতিহাসিক সৌন্দর্য নেই, তা খুঁজে বার করতে হলে গবেষণার প্রয়োজন। তোরিনো বা

তুরিন শহরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছি আর দেখছি সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর স্থাপত্য চিত্রকলা। সে হচ্ছে ঐতিহাসিক ঘটনা। একালের তুরিন ইতালির যন্ত্রপাতি-কলকারখানার রাজধানী,—রাজনৈতিক রাজধানী ; তার উপর সে হল ইতালির, ইণ্টেলেক্চুয়ালদের রাজধানী। ইতালীর রাজনীতিতে তুরিনের প্রভাব অনেকখানি কারণ, এখানকার রাজনীতিই একালের ইতালিতে আধিপত্য বিস্তার করছে তার আর একটা কারণ হল এখানকার কলকারখানা। কলকারখানার মধ্যে ফিয়াটই সব চেয়ে বড়। ফিয়াট কোম্পানী কী না প্রস্তুত করে! ফিয়াটের কারখানায় দেখলাম তৈরী হচ্ছে ছোট-বড় মোটরগাড়ি, রেফ্রিজারেটর, কাপড় কাচার যন্ত্র। ফিয়াট তৈরী করে বিমান, ট্রাক, ট্রাক্টর, এমন কি আণবিক যন্ত্রপাতি। ইতালির ফিয়াট, হল্যাণ্ডের ফিলিপস আর চেকোশ্লোভাকিয়ার স্কোদা। এই তিনটে কোম্পানী যে কি না তৈরী করে সেটাই প্রশ্ন আলপিন থেকে এ্যাটমবোমা তৈরী করার ক্ষমতা রাখে এই তিনটে কোম্পানী। এক ফিয়াটের কারখানায়ই কাজ করে তুরিন শহরে ৮০,০০০ হাজার কর্মচারী। অন্য কারখানার কথা বাদই দিলাম। ফিয়াটের এক কারখানা আছে বম্বেতে। বম্বেতে আজকাল ফিয়াট কোম্পানী ছোট মোটরগাড়ি নির্মাণ করছে। তুরিন শহরের চারধারে কাপড়ের কল, জুতোর কারখানা—কারখানা আর কারখানা। অর্থাৎ যেখানেই টাকা বা অর্থনৈতিক লেনদেন সেখানেই রাজনীতিতে খবরদারি। রোম রাজধানী কিন্তু তাকে পরিচালনা করে মিলান ও তুরিন।

তুরিন শহর আবার ইণ্টেলেকচুয়ালদের শহর, তার ওপর ফ্যাসানের। ফ্রান্সের মতন ইতালিও আজকাল ফ্যাসন জগতের পথ-প্রদর্শক। আর তারই কেন্দ্র হল তুরিন। প্যারিস তো শুধু মেয়েদের পোশাকের বিধানকর্তা, কিন্তু তুরিন মেয়েদের তো বটেই, উপরন্তু পুরুষদেরও। আজকাল পশ্চিম ইউরোপে পুরুষের পোশাকের

বাজারে বেশ টক্কর চলছে লণ্ডনের ফ্যাসনের সঙ্গে তুরিনের। তবে ফ্যাসনের বাজারে ইতালিয়ানদের দিগ্বিজয় চলছে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে। সেকথা পরে বলছি।

ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে সুরু হয়েছে কারনাভাল ইতালি জুড়ে। সমগ্র ইউরোপময় চলছে এই কারনাভাল। তবে সত্যিকারের কারনাভাল প্রতিপালিত হয়ে থাকে উত্তর-ইতালিতে, পশ্চিম-জার্মানীর বাভেরিয়া প্রদেশে আর দক্ষিণ-ফ্রান্সে। কারনাভালের বাংলা হল 'দোল খেলা': জেলেপাড়ার সং সাজা। তবে এরা রঙ খেলে না, তার বদলে কাগজের টুকরো ছড়ায়, কাগজের ফিতে ছোঁড়ে আর মুখোস পরে সঙ সাজে। কারনাভালের সেরা কারনাভাল প্রতিপালিত হয় মিউনিখ শহরে, তাকে বলা হয় ফাশিং, সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড। কোথায় লাগে আমাদের হোলি। তার কিঞ্চিৎ উপভোগ করা গেল তুরিনে ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখে। সেদিন শনিবার। সন্ধ্যে হতেই দেখছি দলে দলে নর-নারী সঙ সেজে রাস্তায় বেরিয়েছে। পো নদীর ধার দিয়ে চলেছে সবাই। হোটেলে-রেস্তোরাঁয় লেগেছে মুখোস পরে নাচের ধুম। উৎসবমুখর তুরিন নগরী। আমরা তিনজনে চলেছি ইতালিয়ান বন্ধুদের সঙ্গে কারনাভাল দেখতে। আমাদের সঙ্গী আরও চারজন—দুটি ছেলে, দুটি মেয়ে। তুরিনে দেখছি সবাই পোশাকে ধোপ দুরস্ত পুরুষেরা একেবারে সবাই জেণ্টেলম্যানের পোশাকে, মেয়েরা পটের বিবির পোশাকে।

ছেলেরা মেয়েদের পোশাক পরে

আমাদের সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন দেখছেন তুরিনের পোশাক-টোশাক? আমরা বললাম, চমৎকার। তবে পুরুষগুলো মেয়েদের মতন অমন করে সেজেগুজে বেরিয়েছে কেন? মানলাম মেয়েদের না হয় দরকার আছে পটের বিবি সাজার। কারণ ওটাই

তাদের সম্বল। কিন্তু পুরুষদের গুণটা কি তার পোশাকে ফুটে উঠবে? আমি আরও বললাম, দেখুন আমি যে পোশাকে আছি, সে পোশাক বোধহয় কোনও চাকর-বাকরও পরে না এখানে। কিন্তু প্যারিসে সে বালাই নেই। প্যারিসে একটা সুবিধে আছে, সেটা হল পুরুষেরা বিশেষ করে লেখাপড়ার কাজে যাঁরা আছেন তাঁরা যেমন খুশি পোশাক পরে বেড়াতে পারেন। কেউ কিছু বলবেন না। লণ্ডনে অবশ্য অতটা চলে না। আমার ফরাসী বন্ধুটি ইতালি ভাল করে চেনেন। তিনি আমায় জানালেন যে, এই হল ইতালির দস্তুর, বিশেষ করে তুরিন আর মিলানের জনসাধারণ হয়তো একবেলা খায় কিন্তু তার জামা-কাপড় দেখলে তা বোঝার উপায় নেই। পশ্চিম ইউরোপে ইতালির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আর্থিক অবস্থা মর্মান্তিক। কিন্তু বিলাসিতায় আর চালিয়াতিতে এরা ওস্তাদ। আমার চিলিয়ান বন্ধু বাধা দিয়ে বলল যে, স্পেনেও তাই আর্থিক অবস্থা এদিকে শোচনীয় কিন্তু চালিয়াতি বা বিলাসিতায় ওস্তাদ। পশ্চিম ইউরোপে ল্যাতিন দেশগুলোর অবস্থা সবারই প্রায় সমান ল্যাতিন দেশগুলো কথার ফুলঝুরিতে যেমন ওস্তাদ তেমন বিলাসিতায়। নোংরামি আর ছ্যাঁচড়ামিতে কম যায় না। নর্ডিক জাতের মতন নয়। তার প্রমাণ মিলবে দু' দুটো মহাযুদ্ধের ইতিহাসে। ফরাসীরা সেই '৭০ সালের ফ্রাঙ্কোপ্রুশিয়ান যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ডু হারা হেরেছে। এদের বীরত্ব নিরস্ত্র জাতির ওপর—যেমন ইন্দোচীন আর আলজেরিয়া, ইতালির কথা আর না বলাই ভাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফাসিস্ত ইতালির সঙ্গে যখন নাৎসী জার্মানীর গলায় গলায় ভাব তখন ঠিক হয় যে ইতালি তার আশে পাশের দেশ আক্রমণ করবে এবং উত্তর আফ্রিকায় চালাবে আক্রমণ। কিন্তু হায়, ইতালিয়ানরা কোথায়! তারা আক্রমণ না চালিয়ে হটতে আরম্ভ করে। শেষে ইতালিয়ানদের রক্ষা করতে জার্মান সামরিক বাহিনীকে চার ধারে ছড়িয়ে পড়তে হয়, তার প্রমাণ উত্তর-আফ্রিকায়

রোমেলের সামরিক বাহিনী। খাস ইতালিতেও জার্মান বাহিনী ইতালিয়ানদের রক্ষা করে। এই হল চালিয়াত আর বিলাসিতার পরিচয়।

সম্প্রতি ইতালীর রাষ্ট্রপতি সিনব গ্রোঞ্চি মস্কো বেড়াতে গিয়েছিলেন, সেখানে তখন এক সম্বর্ধনায় ঠোঁটকাটা ক্রুশ্চেভ ইতালীয়ান রাষ্ট্রপতিকে বলেন যে, দেখুন, আপনাদের দেশে মানে পুঁজিপতিদের দেশে যাঁরই প্রচুর অর্থ আছে তিনিই হলেন স্মার্ট। কিন্তু আমাদের দেশে যাঁরই মাথায় কিছু আছে (ট্যালেন্টেড) তিনিই স্মার্ট। তফাত এখানেই। ক্রুশ্চেভ যা বলেছেন তা হুবহু সত্যি। বিশেষ করে ইতালীর বেলায় তা পরিপূর্ণই খাটে। ল্যাতিন জাতির গৌরব হল যুদ্ধে পরাজয়। লোকঠকান আর নোংরামি। তুরিন থেকে চলেছি উত্তর-পথে। পথে পড়ল ভারচেল্লি। অলিভেত্তি টাইপরাইটার নিশ্চয়ই দেখেছেন। তারই আদিম কারখানা ছিল এখানে। অলিভেত্তির মালিক ভারচেল্লিতে গড়েছেন অতি আধুনিক ধরণের অট্টালিকা—নতুনতম স্থাপত্য। একদিকে সেই পুরোনো রেনেসাঁ যুগের স্থাপত্য আর তারই পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে অতি আধুনিক স্থাপত্য নিদর্শন। ভারচেল্লি থেকে আমরা চলেছি গ্রামের পথে আল্পস পাহাড়ের পথে। পথে দেখি বলদ দিয়ে চাষ হচ্ছে। ইতালীতে যত ধান উৎপন্ন হয় তার অর্ধেকও ইতালীয়ানরা হজম করে না, প্রায় সবটাই বেচে। ধানক্ষেত থাকলেই মশা থাকবে। আর মশা থাকলেই ম্যালেরিয়া। তাই ইতালিতে রয়েছে ম্যালেরিয়া আর মশা।

ভারেল নামে ছোট গ্রামে অতিথি হলাম এক চাষীর বাড়িতে। চাষীটি ফরাসী জানে, আমাদের এক বন্ধু ইতালিয়ান জানে, আমরাও অল্প-স্বল্প ইতালিয়ান বলতে পারি। তাতেই কাজ চলে যায়। পেট পুরে খাওয়া গেল চাষীর বাড়িতে। ইতালির চাষী পরিবার কিন্তু বেশ অতিথিপরায়ণ।

আরও উত্তরে চলেছি। আল্পসের গায়ে দেখছি পুঞ্জীভূত তুষার। এত তুষার, কিন্তু ঠাণ্ডা তেমন নয়। তুষার ছিটিয়ে বেশ খানিক হৈহল্লোড় করা গেল। উত্তর ইতালির আল্পস পর্বতমালা প্রদক্ষিণ করে চললাম লাগো কোমোর পথে। কাশ্মীরকে যেই কারণে ভূস্বর্গ বলা হয় সেই কারণে ইতালির লেক কোমোকেও ইতালির স্বর্গ বলা চলে। কোমো লেকের শেষ প্রান্ত হল সুইৎজারল্যাণ্ড। কোমো শহরটা দেখে মনে হয় যেন ওখানেই সুইৎজারল্যাণ্ড সুরু হয়েছে। শহরটা সুইৎজারল্যাণ্ডের শহরগুলোর মতনই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আবহাওয়াও যেন সুইৎজারল্যাণ্ডের মতন। লেকের দুধারে উঠেছে পাহাড়। মাঝখানে শান্ত কোলাহলবিহীন হ্রদ। অমন শান্ত পরিবেশ যে কোন টুরিস্টকে আকর্ষণ করতে বাধ্য। শুনলাম টুরিস্টদের মধ্যে এখানে ইংরেজ টুরিস্টই বেশী আসে। আর আসে জার্মান।

এবার কোমোর মায়া ত্যাগ করে মিলানোর পথে। মিলান তাজ্জব শহর। রেনেসাঁ যুগের গীর্জা, ডোম, স্থাপত্য; অমন সুন্দর স্থাপত্যের নিদর্শন, আর তারই পাশে দাঁড়িয়ে আছে পিরেল্লি কোম্পানীর বত্রিশতলা অট্টালিকা। সে আবার যেমন তেমন নয় একেবারে যেন দেশলাই-এর বাক্স। আরও উঠেছে ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা অট্টালিকা। একাধারে প্রাচীন, একেবারে নতুন, অতি আধুনিক। ইতালীয়ানরা যে স্থপতির জাত তার পরিচয় মিলবে আধুনিক মিলান শহরে। এরা যেমন প্রাচীনকালে স্থপতি বিদ্যায় জগৎকে তাক লাগিয়েছে তেমনি লাগাচ্ছে একালেও স্থপতি বিদ্যায় ইতালিয়ানদের কাছে ঘেঁষা বেশ কষ্টকর; এদের কাছে স্থপতি বিদ্যা শেখার অনেক কিছু আছে। রেনেসাঁর মিলানের তলা দিয়ে চলেছে যন্ত্রদানবের কাজ। মিলানের সুড়ঙ্গ পথ নির্মিত হচ্ছে, এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। ওই সুড়ঙ্গ পথে চলবে ট্রেন।

মিলানে অবস্থিত ইতালির জাতীয় পেট্রোল কোম্পানীর প্রধান

কার্যালয়। এই কোম্পানী এখন ফরাসী-ইংরেজদের চক্ষুশূল। কারণ মধ্যপ্রাচ্যে এরা প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে। যেখানেই ইংরেজ-ফরাসী বিদ্বেষ সেখানেই এই কোম্পানী নাক গলাচ্ছে। ভারতবর্ষেও এরা প্রবেশ করেছে। তবে অত পুঁজি নেই। এদের দৃষ্টি এখন উত্তর-আফ্রিকায়।

ইতালিতে কয়েক সপ্তাহ—১৯৬৪

ইতালির একটি নগর বা গ্রাম দর্শন করবার কথাও ছিল না আমাদের ভ্রমণ-তালিকায়, তবু অর্ধেক ইতালি দেখেছি এ যাত্রায়। আগে অনেকবার ইতালি গিয়েছি বিমানে, কখনও বা মোটরে চড়ে বেড়িয়েছি নগর থেকে গ্রামে। এবারকার ভ্রমণে আমাদের বাহন ছিল দৈত্যাকায় অতি আধুনিক ট্রেন যেটি ইউরোপে 'ট্রান্স ইউরোপ এক্সপ্রেস' বলে পরিচিত এর গতি ঘণ্টায় ১০৫ থেকে ১২৫ কিলোমিটার।

এবারকার ইতালি সফরে সেখানকার রাজনৈতিক আবহাওয়ার গতি দেখার সুযোগ ঘটেছিল।

জুন মাসের শেষ সপ্তাহে আমরা যখন ইতালিতে, তখন চলেছিল ইতালির মন্ত্রি-সভার দুর্যোগ। মন্ত্রি-সভার যখন তখন পতন হবার উপক্রম। ইতালিতে তখন দারুণ আর্থিক সঙ্কট চলছে। যুদ্ধোত্তর ইতালিতে এসেছে যেমন আর্থিক সচ্ছলতা তেমনি কয়েক বছর ধরে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে রকেটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আকাশের দিকে। ইতালির সরকারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে 'কমন মার্কেট' সদস্যরা। তারা ইতিমধ্যে দশ কোটি টাকা ধার দিয়েছে। তা সত্ত্বেও ইতালির সমস্যা মেটে নি। তাই গত ছ'মাস ধরে বিভিন্ন কল-কারখানায় চলেছে নিয়মিত শ্রমিক ধর্মঘট। ইতিমধ্যে কয়েকবার হয়ে গেছে সরকারী কর্মচারী

ও রেল-শ্রমিকদের ধর্মঘট। এবার আবার শুরু হচ্ছে সংবাদপত্রে নিয়োজিত শ্রমিক ও রেল-শ্রমিকদের ধর্মঘট। মুদ্রাস্ফীতির দরুণ জিনিসপত্রের দাম যত গুণ বেড়েছে ঠিক ততগুণ বাড়ে নি শ্রমিকদের মাসিক বেতন। তাই তারা ধর্মঘট করতে বাধ্য হয়েছে। তাই বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো ইদানীংকালের ইতালির মন্ত্রিসভাকে সমর্থন জানায় নি। ফলে প্রধানমন্ত্রী আলদো মোরোর কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। বিগত সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে ইতালির মন্ত্রিসভার কোনও একটি রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য না থাকায় সর্বদা কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা বসে। ফলে একটু বেঁকে বসলেই মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। প্রধানমন্ত্রী আলদো মোরো ও রাষ্ট্রপতি সিনর সেগ্নি ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট দলের নেতা বটে কিন্তু তাঁরা সোস্যাল ডেমোক্র্যাট ও অন্যান্য বামপন্থী দলের সহায়তা ছাড়া মন্ত্রিসভা গড়তে অক্ষম। তাই এত ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পতন হয় ইতালিতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গত ১৯ বছরে ইতালিতে ২[illegible]টি মন্ত্রিসভা বা সরকারের উত্থান-পতন হয়।

ইংরেজ কবি লর্ড বায়রণ বলেছিলেন, 'ভেনিস না দেখে মরো না।' কথাটা কতখানি সত্যি সেটা প্রমাণিত হল ভেনিস দেখার পর। শুধু বায়রণ নয় ইউরোপের প্রতিটি খ্যাতনামা শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি ভেনিসকে তাঁদের তীর্থস্থান বলে মনে করেন। জলের ওপর ভাসছে অনেকগুলো প্রাসাদ। দ্বীপময় নগর। আড্রিয়াটিক সমুদ্র তীরে ১১৭টি ছোট-বড় দ্বীপ, ১৫০টি খাল আর ৪০০টি সেতু বা সাঁকো —এই নিয়ে ভেনিস। ভেনিস ইউরোপের একমাত্র নগর যেখানে মোটরগাড়ি চলে না। এখনও সেই রোমান্টিক গণ্ডোলা বা ডিঙ্গি নৌকো ভেসে চলেছে। তারাই এখান হতে আরেক খালের ধারে লোক পারাপার করে। মোটর গাড়ির স্থান নিয়েছে মোটরবোট। ট্যাক্সির বদলে মোটরবোট ট্যাক্সি পাওয়া যাবে। টেলিফোনে

খবর দিলে বাড়ির সামনে মোটরবোট ট্যাক্সি এসে হাজির হবে কয়েক মিনিটে। বাড়িগুলো রাস্তার ওপরে না দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জলের ওপর। রাত্রিবেলা হোটেলের ঘরে বসে জানলা দিয়ে দেখছিলাম খালের ওপর গণ্ডোলার মিছিল। অন্ধকার রাতে গণ্ডোলায় জ্বলছে ছোট একটি আলো। একজন চালাচ্ছে আরেকজন গান ধরেছে। আর যাত্রীরা ভেনিসের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে চলেছে এখাল-সেখালের জলপথ দিয়ে। রাত্রিবেলা ভেনিস যেন স্বপ্নপুরী। তাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম পিয়াৎসা সান মার্কোর পথে। রাত তখন এগারটা। রাস্তায় টুরিস্ট গিজ গিজ করছে। পিয়াৎসা সান মার্কোর ওপর কাফে-রেস্তোরাঁগুলো বেশ জমে উঠেছে। চারধারে টেবিল চেয়ারের ছড়াছড়ি। একদল অর্কেস্ট্রা বাজিয়ে গান ধরেছে। সান মার্কোর পথে আমি শুধু ইতালিয়ান ভাষা ছাড়া আর সব ভাষা শুনেছি। কারণ এটা টুরিস্টদের মরশুম। জার্মান আর আমেরিকান টুরিস্টে ভেনিস ছেয়ে গেছে। আমরা যখন ভেনিসে তখন বেশ গরম। অনেকটা কলকাতার মার্চ মাসের মতন। দিনের বেলা দেখি অনেকে খালি গায়ে নৌকো চালাচ্ছে। রাত্রে একটা জামা গায়ে দিলেই যথেষ্ট। দিনের বেলায় রৌদ্রের তাপ এতই প্রখর যে কয়েকটি কাফে ঘর ঠাণ্ডা রাখার নতুন উপায় বাতলেছে। রাস্তায় ফুটপাথের ধারে কয়েকটি কাফে-রেস্তোরাঁ সামিয়ানা খাটিয়ে সামিয়ানার ওপরে যন্ত্রচালিত পিচকারি দিয়ে জল ছিটোচ্ছে আর তার নিচে চলছে পাখা। ফলে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে; মনে হবে যেন এয়ারকণ্ডিশন-করা ঘর।

ভেনিস শহরটাই কবির হাতে গড়া। প্রতিটি বাড়ি-প্রাসাদ যেন শিল্পীর হাতে অতি যত্ন দিয়ে গড়া। স্থাপত্যশিল্প দেখতে হলে ভেনিস না দেখে উপায় নেই। তার ওপর রয়েছে ভাস্কর্য আর আর্ট-এর ছড়াছড়ি। তাই দেখা যাবে ভেনিসের রাস্তায় সাঁকোর ধারে দেশ-বিদেশের আর্টিস্ট রঙ তুলি নিয়ে একমনে এঁকে চলেছে।

একালের ভেনিস সৌন্দর্য-নগরী বলে পরিচিত। কিন্তু ঐতিহাসিক ভেনিস ছিল পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের প্রধান বন্দর। নবম শতাব্দীতে ভেনিসের পত্তন ঘটে। সেই থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ভেনিস ছিল ব্যবসাকেন্দ্র। এখান থেকে বড় বড় জাহাজ বোঝাই করে সওদাগরেরা যেত ইউরোপের প্রতিটি বড় বন্দরে ব্যবসা করতে।

ভেনিসের এত ঐশ্বর্য এল কোথা থেকে এ প্রশ্ন সহজেই আসতে পারে। সেকালে ভেনিসে ছিল না বিরাট কলকারখানা। ছিল হাতে তৈরী সৌখিন শিল্পজাত দ্রব্য। তারই নিদর্শন এখনও মিলবে মুরানো দ্বীপে। মুরানো দ্বীপে এখনও কাঁচের নানান জিনিস নির্মিত হচ্ছে। গত আটশ বছর ধরে চলছে এদের কারখানা। তবে ভেনিস ছিল সওদাগরদের আড্ডাখানা। তারা বিদেশে মাল কিনে বিদেশেই বেচত। কেনা-বেচার মাধ্যমে চলত এদের মুনাফার ব্যবসা। সেই অর্থে তারা নির্মাণ করে প্রাসাদের পর প্রাসাদ।

ইতালি সফরকালে মিলানের বড় রেল স্টেশনে আমায় এক টুরিস্ট বলছিলেন, মিলানের রেল স্টেশনের প্রকাণ্ড আয়তন ও ভাস্কর্য দেখতে। এত বড় রেল-স্টেশন ইউরোপে কোনো রাজধানীতে আছে কি না সন্দেহ। মিলানে ইতালির রাজধানী নয়, একটি প্রদেশিক শহর মাত্র। মনে রাখতে হবে যে, ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইতালি বলে কোনও একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল না। তার আগে ছিল খণ্ড খণ্ড স্বাধীন বা পরাধীন রাষ্ট্র। বিগত দুই শত বছরে ইতালিতে রাজত্ব চালিয়েছে ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া, তাই এখনও মিলান তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। রোম ইতালির রাজধানী কিন্তু ব্যবসা চালায় মিলান শহর। আর কলকারখানার রাজধানী হল তুরিন বা তোরিনো। উত্তর ইতালি দক্ষিণ ইতালি থেকে সমৃদ্ধিশালী বলে তারা ইতালীয়ান রাজনীতি পরিচালনা করে থাকে।

ভেনিস হল ছুটি কাটাবার রোমান্টিক নগর। আর ফ্লোরেন্স হল আর্ট চর্চার শহর। সমগ্র ফ্লোরেন্স শহরটাই যেন মিউজিয়াম। মধ্যযুগের বড় বড় প্রাসাদগুলো দেখলে আমাদের তাজমহলের কথা মনে পড়ে আমাদের তাজমহল সত্যি বিরাট। কিন্তু ছোটখাট অসংখ্য কত তাজমহল যে ছড়িয়ে আছে ইতালীময় সেগুলো গুণে শেষ করা যাবে না। তাই বোধ হয় ইতালীয়ানরা এত গর্বে গর্বিত। ফ্লোরেন্স নগরে মাইকেল এঞ্জেলোর ভাস্কর্য আর বত্তিচেল্লির আঁকা চিত্রপটগুলো নগরের গৌরব। পিত্তি প্যালাস আর উফিজি প্যালেসে যেন ভাস্কর্য আর আর্টের হাট বসিয়েছে। এগুলো যোগাড় করা বা কেনা সহজ নয়। তা ছাড়া মধ্যযুগে ইতালীয়ান শিল্পীদের সুনাম ছিল। ফ্লোরেন্সের ব্যাঙ্কার, সওদাগর, ব্যাপারীরা মিলে একাধারে যেমন অর্থোপার্জন করেছে তেমনি তারা শিল্পচর্চায় অর্থ ঢেলেছে ইতালীয়ানরা ভেনিসকে বলে ভেনিৎসিয়া আর ফ্লোরেন্সকে বলে ফিরেনৎসে। ফিরেনৎসে বা ফ্লোরেন্স নগরের সূত্রপাত দু' হাজার বছর আগে। কিন্তু একালের ফ্লোরেন্স গড়ে ওঠে ত্রয়োদশ শতকে ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকে ফ্লোরেন্সের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা সমগ্র ইউরোপে টাকার লেনদেন করত। লোম্বার্দি প্রদেশের ব্যবসায়ী আর ইহুদীদের একচেটে ব্যবসা ছিল ব্যাঙ্কের। তারা টাকা ধার দিত, সুদ খেত। তারাই শতবর্ষের যুদ্ধে ইংরেজ সম্রাট তৃতীয় এডোয়ার্ডকে টাকা ধার দেয়। তাদের ব্যবসা এতই জমে ওঠে যার ফলে একালের টাকা বা মুদ্রার চলন তারা শুরু করে বলে ইউরোপের অনেক দেশে এখনও মুদ্রাকে বলা হয় ফ্লোরিন। যেমন হল্যাণ্ডে, বেলজিয়ামে চলছে। এমন কি হাঙ্গেরিতেও তাই। মধ্যযুগে সারা ইউরোপে মুদ্রাকে বলা হত হয় ফ্লোরিন নয় গোল্ড বা গেল্ড। ফ্লোরেন্সের আধিপত্য ইউরোপময়। শুধু অর্থনীতিতে নয়, সাহিত্য, রাজনীতি ও শিল্পচর্চায় তার নামডাক ছিল মধ্যযুগে জগৎ জুড়ে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দান্তে আলিঘেরি

আর পঞ্চদশ শতকে মেকিয়াভেলি বাস করেছেন ফ্লোরেন্সে। তারপর পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত জিওত্তো, ফ্রা আঞ্জেলিকো, বত্তিচেল্লি, আরও কত খ্যাতনামা চিত্রকর ফ্লোরেন্স নগর জমিয়ে রেখেছিল। বড় বড় প্রাসাদগুলোর কথা ছেড়ে দিলেও ত্রয়োদশ শতকে নির্মিত ডোম বা বড় ক্যাথেড্রাল দেখলে বিস্মিত হতে হয়। এককালে ইতালীয়ানরা সত্যিকারের শিল্পচর্চা করত। তার প্রমাণ ভেনিস-ফ্লোরেন্সের স্থাপত্য আর ভাস্কর্যের ছড়াছড়ি। এগুলো গুণে শেষ করা যাবে না। ঐশ্বর্য ভরা ইতালি আজ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে এরই নাম বোধ হয় অদৃষ্টের পরিহাস। ফ্লোরেন্সে মুসাফিরি শেষ করে আমরা যখন রোমে পৌঁছলাম তখন রোমে রাজনৈতিক আবহাওয়া গরম হয়ে উঠেছে। মন্ত্রিসভা টলটলায়মান। যাক গে রাজনীতি। ইতালির সব নগরের চেয়ে পুরোনো রোম। রোমের আভিজাত্য আলাদা। এককালে এই ছোট্ট রোমান শহর সমগ্র ইউরোপ শাসন করেছে। করেছে সমগ্র উত্তর-আফ্রিকা। খ্রীস্টপূর্বের রোমান-সাম্রাজ্য আর মধ্যযুগের রোমান সাম্রাজ্যে অনেক তফাত। আর একালের পুরোনো রোমের বুকে নিয়মিত উঠছে বাক্স-প্যাটার্নে আকাশচুম্বী অট্টালিকা। এখন আর প্রাসাদ নির্মিত হয় না। নির্মিত হচ্ছে অফিস, আদালত, বিদ্যালয়, আর জনসাধারণের জন্যে ফ্ল্যাটবাড়ি। তাতে নেই ভাস্কর্য বা কারুকার্য। কিন্তু স্থপতিবিদ্যার দিক থেকে সেগুলো বিংশ শতাব্দীর অত্যুৎকর্মতার স্বাক্ষর।

রাজনৈতিক আবহাওয়া

রোম আমার ভাল লাগে এই কারণে যে, প্রায় সর্বত্র দিশী-দিশী গন্ধ। চাল-চলনে আর খাদ্যে তার আভাস পাওয়া যাবে।

কাজের বেলায়ও তাই। এরা গ্রীষ্মকালে আমাদের মতনই দিনের বেলায় খেয়েদেয়ে একটু গড়িয়ে নেয়। রোমের পররাষ্ট্র দপ্তরে টেলিফোন করে জানলাম যে, তাঁরা দুপুরে অফিস করে না। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে আবার বিকেলবেলা অফিসের কাজ শুরু করে।

রোমের পররাষ্ট্র দপ্তর ভবনটির অনেক রহস্য আছে। সরকারী কর্মচারীরা বলে যে, এটির উদ্বোধন হয়েছে পাঁচ বছর আগে। কিন্তু ঠোঁটকাটা ইতালিয়ানরা বলে অন্য কথা। তারা বলে যে, এ হচ্ছে মুসোলিনির অবদান। মুসোলিনির আমলে এর নির্মাণকার্য শুরু হয়। মার্বেল পাথরের এই বিরাট প্রাসাদের বারান্দায় অনায়াসে ফুটবল খেলা চলে। এই থেকে কিছুটা মালুম হবে প্রাসাদের বিরাটত্বের। মুসোলিনির দুই কীর্তি। একটি পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রাসাদ। আর দ্বিতীয়টি হল রোমের দক্ষিণে আর-এক বিরাট প্রাসাদ পালাৎ-সোদার-সিভিলিজ্জাৎনিয়ে বা শিল্প ও সংস্কৃতির প্রাসাদ। দুটোই দেখবার মতন। মনে রাখার মতন তো বটেই।

দ্য গল আসার আগে ফ্রান্সে হত নিয়মিত মন্ত্রিসভার পতন। ওই ধরণের রাজনৈতিক সমস্যা চলে আসছে ইতালিতে গত আঠার বছর ধরে। এঁদের রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম পররাষ্ট্র দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারি সিনর গ্রিমালদফে। তিনি হ্যাঁ-না করে কথাটা কাটিয়ে দিতে চান। তাঁরই পরামর্শ ও আয়োজনে আমি রোমের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংবাদপত্র অফিসে যাই আলাপ-আলোচনা করতে।

ইতালিয়ান সোস্যালিস্ট দলের বামপন্থী বা নেন্নি পন্থীদের

মুখপত্র 'আভান্তি' পত্রিকা অফিসে পররাষ্ট্র বিশেষজ্ঞ ডক্টর গোজ্জোন ও সিনর দাদস্তের সঙ্গে প্রায় ঘণ্টা দুই নানা বিষয়ে আলোচনা করি। এরা দুজনে আমায় বলেন যে, বর্তমান ইতালিয়ান সরকারের উত্থান-পতনের মূল কারণ হল আর্থিক সঙ্কট ও মুদ্রাস্ফীতি। ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট দল পরিচালিত মন্ত্রিসভা বিদেশে রপ্তানির চেয়ে আমদানি করেছে অনেক বেশি। তাই এই অর্থনৈতিক সঙ্কট। সোস্যালিস্ট দলে অনেক দলাদলি, যেমন আমাদের দেশে রয়েছে। মুসোলিনির ফ্যাসিস্ত দল মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে বটে, কিন্তু এদের কোন প্রভাব নেই এখন। ফ্যাসিস্ত দলের একালের নাম হয়েছে ইতালিয়ান সোস্যালিস্ট মুভমেণ্ট এই দল গত সাধারণ নির্বাচনে শতকরা মাত্র সাতটি ভোট লাভ করে। এদের মতে ভ্যাটিকান অর্থাৎ ক্যাথলিক জগতের প্রধান কার্যালয়ে প্রভাব সাধারণ ইতালিয়ানদের মনে অনেকখানি দেখা যায়। এই ভ্যাটিকান মারফত ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাট দল ইতালিয়ান রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করেছে।

'ইল গোপোলো'র কার্যালয়ে সম্পাদক ডঃ রোসিয়র সঙ্গে আলোচনা হল তাদের দলের কার্যক্রম সম্পর্কে। ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাট দলের আবির্ভাব হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। ক্যাথলিক গীর্জা আর ভ্যাটিকান এই দলকে পরিচালনা করে বললে ভুল বলা হবে না। এই দল ধনপতিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যে রাজনীতি পরিচালনা করছে তা বিস্ময়কর বললেই চলে। এদের মতে ইতালির যে অর্থনৈতিক সমস্যা চলেছে তার মূল কথা হল, সরকারী ও কারখানা কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি আর হল ইস্কুলে অতিরিক্ত সরকারী সাহায্য দান। দল হিসেবে এই দল অত্যন্ত দুর্বল কিন্তু গীর্জা ও ধর্ম-প্রচারকদের প্রচারকার্যের ফলে এই দল নির্বাচনের সময় অনেক বেশি ভোট লাভ করে থাকে। এদের প্রভাব বেশি ইতালির অনুন্নত অঞ্চলে ও গ্রামে। নেপলস-এ এদের প্রভাব অনেকখানি।

নেপলস্‌-এ সোস্যালিস্ট বা কম্যুনিস্টদের প্রভাব কম। ইতালির সংবাদপত্রগুলোর প্রচার সংখ্যা ইংলণ্ডের মতন লাখ লাখ নয়।

সাধারণতঃ দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রচার সংখ্যা আশী হাজার থেকে এক লাখ। বড় জোর দুই লাখ। সব চেয়ে বেশী প্রচার-সংখ্যা যে-পত্রিকাটির সেটি কম্যুনিস্ট দলের মুখপত্র। নাম তার 'ইউনিতা'। 'ইউনিতা' পত্রিকার কার্যালয়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে আলাপ আলোচনা হল সম্পাদক ও বিভিন্ন কর্মচারীদের সঙ্গে। ইতালির বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে সব চেয়ে বড় প্রভাবশালী দল হল কম্যুনিস্ট পার্টি। এদের সভ্যসংখ্যা সব চেয়ে বেশি। প্রায় কুড়ি লাখ। লোকসভায় এদের প্রতিনিধির সংখ্যা প্রায় একশত কুড়ি জন। এই দলের নেতা তোগলিয়াত্তির মৃত্যু হয়েছে কিছু দিন হল। এদের ভিতর এখন চলেছে দলাদলি। এখন দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন লুই লংগো। ইনি মধ্যপন্থী; উপরন্তু মস্কো ঘেঁষা। কিন্তু অপর নেতা আমানদোল্লা বেশ ক্ষমতাশালী। আমানদোল্লা পিকিংপন্থী। আমানদোল্লা ও লংগোর মধ্যে চলছে দ্বন্দ্ব।

ইউনিতার সম্পাদক বলছিলেন যে, ইতালির চিন্তাশীল মহলে কম্যুনিস্ট দলের প্রভাব অনেকখানি। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকদের ওপর যতখানি ততখানি নয় ইস্কুলে শিক্ষকদের ওপর। এখানেই এদের প্রধান সমস্যা। ফ্রান্সে তাও নয়। ফ্রান্সে বিদ্যালয় শিক্ষকদের ওপর কম্যুনিস্ট দলের প্রভাব অনেকখানি। তবে ইতালির শিল্পপ্রধান অঞ্চলে কম্যুনিস্ট দলের একচেটিয়া প্রভাব, তার পরেই হল বামপন্থী সোস্যালিস্ট দলের। অদূর ভবিষ্যতে যদি কখনও বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলোর সঙ্গে কম্যুনিস্ট দলের একটা বোঝাপড়া হয় তাহলে ইতালিয়ান রাজনীতিতে বড় পরিবর্তন আসতে বাধ্য।

হল্যাণ্ড: একালের গ্রীক্ ট্রাজিডি

ভূমধ্যসাগরের তীরে ইতালি ও গ্রীসের উষ্ণ আবহাওয়ায় অনেকবার কেটেছে। ভূমধ্যসাগরীয় দেশের চাল-চলন ও আচার-ব্যবহারের সঙ্গে অনেক পার্থক্য উত্তর-ইউরোপের ঠাণ্ডা দেশের সঙ্গে। দক্ষিণ ইউরোপের লোকজনের হাব-ভাব, খানা-পিনার সঙ্গে অনেক মিল নেই উত্তর ইউরোপের। উত্তর-ইউরোপ বেড়াবার সময় তার হদিস পেয়েছি অনেকবার। হল্যাণ্ড বেলজিয়ামের দৃষ্টান্তই দেওয়া যাক প্রথমে। তারপর অন্য দেশগুলো আসবে।

এথেন্স সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল ভিন্ন। ভেবেছিলাম এথেন্সে পৌঁছেই শহরের রাস্তায় রাস্তায় দেখতে পাব গ্রীক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। ঠিক এমনি ধারণা নিয়ে আসে বহু বিদেশী ভারতে। তাঁদের ধারণা দিল্লী, কলকাতা বা বোম্বে নেবেই দেখতে পাবে হিন্দু-স্থাপত্যের নিদর্শন। কিন্তু বড় শহরে এসে যখন দেখে বড় বড় অট্টালিকা আর মোটরের দৌড় তখন তারা সত্যি মনঃক্ষুণ্ণ হয়। এ সম্বন্ধে আমার অনেক বিদেশী বন্ধু অনুযোগ করেছেন। এথেন্স যাওয়ার আগে কয়েকজন গ্রীক বন্ধুর পরামর্শ নিয়েছিলাম। তারা কিন্তু গোড়াতেই বলেছিল, 'এথেন্স দেখে কী হবে, সত্যিকারের গ্রীস বা তার পুরোনো সভ্যতার টুকরো-টাকরা দেখতে পাবে ছোটখাট দ্বীপে, এথেন্সে নয়।' যাই হোক নভেম্বরের গোড়ায় যখন এথেন্স পৌঁছলাম তখন কিন্তু আথেনা দেবীর প্রতি আমার ভক্তি চটে গেল। প্রাচীন গ্রীক আথেনা দেবীর সম্মানে এথেন্স নগরীর নাম। তবে ভাল লাগে নভেম্বরের মৃদুমন্দ বাতাস। তখন উত্তর-ইউরোপে কনকনে ঠাণ্ডা। হাল্কা পোশাকে ঘুরে বেড়িয়েছি মহা সুখে। লোকে বলে ও হচ্ছে ভূমধ্যসাগরের আবহাওয়া। ভূমধ্যসাগরের তীরে পুবের সব কটা দেশের লোকজনের চেহারা, হাল-চাল ও খাবার-দাবার প্রায় এক। বেশ কিছু সংখ্যক গ্রীকের চেহারা পাঞ্জাব ও

কাশ্মীরের লোকেদের মতন। তবে গ্রীক খাবারে শুধু নয়, গ্রীসের পুব দিকে ভূমধ্যসাগরের তীরে প্রায় প্রতিটি দেশে একই ধরনের খাবার। এর কারণ হল তুর্কীদের প্রাধান্য ছিল এই সব দেশে। ভারতেও এককালে ছিল। যে-দেশে তুর্কীর প্রাধান্য সে-দেশে কোফ্‌তা-কাবাবের ছড়াছড়ি। রান্নার দিক দিয়ে গ্রীসের সঙ্গে উত্তর-ভারতের অনেক মিল। তারপর হালুয়া। অবশ্য বোম্বের হালুয়া (ওরা বলে হালবা), জিলাপিজাতীয় জিনিস।

এথেন্স যাবার আগে প্যারিসের বন্ধুরা বলে দিয়েছিল ভাল করে দেখতে যে, সামরিক রাজত্বে যে সব ফাসিস্ত কার্যকলাপ দেখা গেছে সেখানে তার ফলে মিনিস্কার্ট, হিপিদের আবির্ভাব কমেছে কি না। শুনেছি সামরিক সরকার ফারমান জারি করে মিনিস্কার্ট, হিপির দৌরাত্ম্য, নিকি থিও জারাকিয়া-এর গান 'জর্বা দি গ্রীক' বন্ধ করেছে। সামরিক সরকার একটু বেশীমাত্রায় জাতীয়তাবাদী। তারা বলেছে যে, কম্যুনিস্টদের চক্রান্তে গ্রীক জীবনে অনেক পঙ্কিলতা ঢুকেছে। তারা আন্তর্জাতিক হয়ে যাচ্ছে। সামরিক সরকার চান গ্রীসের সেই পুরোনো গৌরবময় সভ্যতার দিন ফিরিয়ে আনতে এবং তা চান কট্টর জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে। এবং জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে সামরিক সরকার ক্ষমতা প্রয়োগের পক্ষপাতী। তাঁরা আইন-কানুন ভাল কথার ধার ধারেন না। যাই হোক, এ সম্বন্ধে আমি সাধারণ লোকেদের মতামত জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

এথেন্স-এর রাস্তার ধারে বাদামওয়ালার সংখ্যা কম নয়। এরা বেচে পেস্তা, কাঠবাদাম, কুমড়োর বিচি, চিনেবাদাম ভাজা। এদের একজন অল্প ফরাসী জানত, তার সঙ্গে আলাপ করছিলাম। সামরিক সরকার মিনিস্কার্ট পরিধান বন্ধ করেছে কি না। উত্তরে বাদামওয়ালা হেসে জানায় যে, আগেও গ্রীক মেয়েরা মিনিস্কার্ট পরত না। হয়ত দু-একজন। বিদেশীরাই ও সব করে। তবে এ নিয়ে এথেন্সে বেশ মুখরোচক গল্প শোনা যাবে। তবে আমি এথেন্স শহরে কোনো

সামরিক দাপটের চিহ্ন দেখি নি। অন্যান্য ইউরোপীয় শহরের মতনই আমোদ-আহ্লাদের জীবন দেখেছি। শহরের মধ্যমণি সিনৃটিগমা,—স্ট্যাডিউ পাড়ায় নৈশ জীবন অন্য কোনো শহরের চেয়ে হীন নয়। অ্যাক্রোপোলিসে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে ট্যুরিস্টের ভিড় আমি কম দেখি নি। ভাল কথা, এথেন্সের সুউচ্চ অট্টালিকার আশে-পাশে দু-চারটে ছিটকে পড়া প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের কিছু নমুনা অতি সন্তর্পণে দেখা যায় এখনও।

পশ্চিম ইউরোপের উন্নত দেশগুলো এখনও কিন্তু গ্রীসকে অনুন্নত দেশ বলে গণ্য করে। কয়েক লাখ গ্রীক শ্রমিক এখনও খেটে খাচ্ছে পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স ও বৃটেনে। তারা ভাগ্যান্বেষণে বিদেশ যেতে বাধ্য হয়েছে। গ্রীসের মূল খণ্ড এবং এথেন্সের আশে-পাশে যত শিল্পোন্নয়ন হয়েছে তেমন হয় নি ছোট-বড় দ্বীপগুলোতে। গ্রীসের আর্থিক সমস্যাই তার রাজনৈতিক সমস্যা। গ্রীসের লোকসংখ্যা পঁচাশি লাখ। এথেন্স নগরীর হল সাড়ে পনের লাখ। ছোট-বড় দ্বীপের সংখ্যা চল্লিশের ওপর। অধিকাংশ দ্বীপেই চাষাবাদ চলে। কল-কারখানার নামগন্ধ নেই। চাষাবাদ ছাড়া এখন প্রধান আয় হল বিদেশী পর্যটকের কাছ থেকে। ট্যুরিজম ব্যবসায়ে গ্রীস ফেঁপে উঠছে। জার্মান, ফরাসী, ইংরেজ ট্যুরিস্টে ছেয়ে ফেলে গ্রীস। তার পর আমেরিকান তো আছেই। এহেন অনুন্নত দেশে চরমপন্থীদের আড্ডা জোরে জমবে না তো কি রাজার দল ও গণতান্ত্রিক দলের আড্ডা জমবে? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ফাসিস্তদের প্রভাব বাড়ছিল। যুদ্ধে বৃদ্ধি হল জার্মান প্রভাব। যুদ্ধশেষে শুরু হল ইংরেজ-আমেরিকানদের।

গ্রীসের উত্তরে ও তিনদিকে ঘেরা তিনটি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র। আলবানিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও বুলগারিয়া ঘিরে আছে গ্রীসকে। এই তিন দেশেই কিন্তু আবার গ্রীক ভাষার প্রভাব। এককালে

ওগুলোতে গ্রীক রাজত্ব বহাল ছিল। যাই হোক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গ্রীসে দেখা দেয় গৃহযুদ্ধ। ইঙ্গ-মার্কিনদের চাপে পড়ে কম্যুনিস্টরা পালাতে বাধ্য হয়। তারপর ১৯৫০ সালে গ্রীসকে টেনে আনা হয় উত্তর আতলান্তিক সামরিক চুক্তিতে। উত্তর আতলান্তিক চুক্তিবলে গ্রীসে প্রবেশ করে মার্কিন-সামরিক বাহিনী। সেখানে মার্কিন ছাউনি থেকে গুপ্তচর বিমান উড়ে বেড়ায় কম্যুনিস্ট দেশের ওপর। গ্রীক সামরিক বাহিনীর পদস্থ সমর নেতাদের হাতে আসে আমেরিকানরা। তার ওপর রয়েছে ডলারের ঝনঝনানি। আমেরিকান অর্থ সাহায্যও সমানে দেওয়া হয়।

কিন্তু অধিকাংশ দ্বীপে ইতরবিশেষ পরিবর্তন না হওয়ায় বামপন্থী দলগুলোর শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকে। তার মধ্যে দক্ষিণপন্থী দলগুলোও নিশ্চুপ ছিল না। অধিকাংশ সময়ে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হত। এবং মার্কিন ঘেঁষাই অধিকাংশ। কিন্তু রাজার কোনো ক্ষমতা ছিল না। সবাই জানত যে, চরম দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থী যে কেউ ক্ষমতা পেলে রাজাকে পালাতে হবে। ঠুঁটো রাজার ক্ষমতা বড়ই সীমিত। রাজাকে নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো বেশী মাথা ঘামাত না। যাই হোক, রাজা এখন বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন। ভবিষ্যতে তাঁর ক্ষমতা পাবার আশা অতি ক্ষীণ।

বর্তমান গ্রীক সংকটের গোড়াপত্তন হয় ১৯৬৫ সালে কিন্তু তার প্রথম অধ্যায় দেখা যায় ১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি। বৃদ্ধ ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পাপান্দ্রেউসকে ঘিরে গণ্ডগোলের সৃষ্টি। তাঁর ছেলে বামপন্থী নন, বরং বলা চলে আমেরিকান ঘেঁষা ডেমোক্র্যাটিক। তাকে জেলে পোরা হয়। সামরিক বাহিনীর সমর্থনে চরম দক্ষিণ-পন্থীরা রাজনৈতিক গোলযোগ শুরু করে ১৯৬৬ সালের মাঝে। আর ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে সামরিক নেতারা সব ক্ষমতাই কেড়ে নেয়। প্রথম দিকে মার্কিন সরকার সমর-নেতাদের তিরস্কার করে বটে কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা পরোক্ষে তাদের সমর্থনই

জানায়। মার্কিন সরকার ভাল করেই জানে যে, বর্তমান গ্রীসের সামরিক সরকার অতি অনুগত। তাদের পররাষ্ট্র নীতি মার্কিন সরকারের পছন্দসই। বরং কম্যুনিস্ট প্রভাব বাড়বে না ভেবে মার্কিন সরকার বেশ তুষ্ট। এইসব কারণেই একমাত্র আমেরিকানদের সম্মতিক্রমে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি। এতখানি বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন নি রাজা কন্সটানটিন। তাই তাঁকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। হয়তো তাকে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হবে। নয়ত তাঁর শ্বশুরবাড়ি ডেনমার্কে আশ্রয় লাভ হবে তাঁর একমাত্র পথ।

গ্রীসে মার্কিন ও নেটো সামরিক ঘাঁটির গুরুত্ব অনেকখানি। সেখান থেকে পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে কড়া দৃষ্টি রাখা যায় তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রীস হাতছাড়া করতে নারাজ। এবং এই সব কারণে গ্রীসের সামরিক সরকার বিনা বাধায় তাদের রাজত্ব চালিয়ে যাবে বলেই অনেকের ধারণা।

হল্যাণ্ড

হেগ্-এ এসে খালি নয়াদিল্লীর কথা মনে পড়ছে। হেগ্ হল্যাণ্ডের রাজধানী, নয়াদিল্লী ভারতের। কিন্তু সাদৃশ্যটা শহর হিসেবে নয়, সাইকেলের। নয়াদিল্লীতে সকাল নয়টায় ও পাঁচটার পর যা সবচেয়ে আকর্ষণীয় তা হল সাইকেল। যেন সাইকেলের শোভাযাত্রা দিল্লীর বৈশিষ্ট্য। তেমনি হেগ্-এর অবস্থা। হেগ্-এ দেখছি সকালে বিকেলে লাখ-খানেক সাইকেল আরোহী চলেছে। স্কুল-কলেজের ছাত্ররা চলেছে সাইকেলে, হয়ত কোন ছাত্রের না ছাত্রীর বয়স সাত আট, তিনি আবার তার পেছনের সিটে করে নিয়ে চলেছেন তাঁর ছোট ভাই বা বোনকে। মা বা বাবা নিয়ে চলেছেন তাঁর সন্তানকে পেছনের সিটে।

অফিসের আগে ও পরে ছুটে চলেছে লাখ লাখ অফিস কর্মচারী সাইকেলে চেপে। শুনলাম হল্যাণ্ডে প্রতিটি দ্বিতীয় ব্যক্তি নাকি সাইকেলের মালিক। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি চতুর্থ ব্যক্তি মোটরগাড়ির। সমগ্র হল্যাণ্ডে পঞ্চাশ লক্ষ সাইকেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আগে বলা হত হল্যাণ্ড টিউলিপ ফুলের দেশ, এখন বলতে হচ্ছে হল্যাণ্ড সাইকেলের দেশ। সমস্ত দেশ জুড়ে শহরে গ্রামে বড় রাস্তার ধারে মোটরগাড়ির মতন সাইকেল চালাবার পথও নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। শুধু কি সাধারণ সাইকেল। তার কত রকমের বাহার। এখানে বৃষ্টি তো হয়ই, তার ওপর তুষারপাত। সুতরাং রাস্তা ঘাটের অবস্থা খুবই শোচনীয়। তাই যাতে সাইকেলের চাকা থেকে কাদা ছিটকে পোশাক নষ্ট না করে তার জন্যে পেছনের চাকার ওপরে ঢাকা হয়েছে প্লাস্টিক দিয়ে।

নয়াদিল্লীতে যেমন দেখা যায়, দিল্লীওয়ালা চলেছে তার সাইকেলে চেপে, সামনে একটি বাচ্চা পেছনের সিটে তার স্ত্রী ও স্ত্রীর কোলে আরেকটা বাচ্চা। আবার কখনও দেখা যায় তার

ওপরে মাথায় নিয়ে চলেছে খাটিয়া। যেন গন্ধমাদন পর্বত। ঠিক তেমনি না হলেও অনেক সময় হল্যাণ্ডের পথে-ঘাটেও প্রচুর মাল-বোঝাই সাইকেল চলেছে দেখতে পাবেন।

এদেশে যে সাধারণ নির্বাচন হচ্ছে তা টের পাওয়ার জো নেই। 'অমুক বাবুকে ভোট দিতে হবে' বা 'অমুক ব্যক্তিকে ভোট দিন' বলে হৈ-চৈ তো দূরের কথা, রাস্তায় পোস্টার পর্যন্ত নেই। শুধু মাত্র শহরের কয়েকটি বিশিষ্ট স্থানে গোটা-কয়েক পোস্টার মারা আছে। তাও পথিককে আকৃষ্ট করার জন্যে নয়। ইউরোপে একমাত্র বোধহয় হল্যাণ্ডই একটি দেশ যেখানে নিঃশব্দে সাধারণ নির্বাচন পালা শেষ হয়। রাজনৈতিক নির্বাচনে উত্তেজনা দূরের কথা, জনসাধারণ নির্বাচনের কথা মুখেও আনে না। সাধারণ নির্বাচন এদের কাছে মুখ্য নয়, গৌণ। মুখ্য হল কাজ করে যাওয়া। এরা প্রত্যেকেই জানে, কোন পার্টির কী মত। আরও জানে যে, প্রায় সব পার্টিই একই পথের পথিক। বিশেষ ফারাক নেই তাদের কর্মসূচীতে। তার চেয়েও মজার হল এই যে, হল্যাণ্ডের কোন রাজনৈতিক দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠ তো নয়ই এবং কোন দিন কোন একটি রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে মন্ত্রিসভা পরিচালনা করতে পারবে না। এদের এই অদ্ভুত রাজনৈতিক অবস্থার কারণ বলছি

এদেশেও বৃটেনের মতন একজন আছেন রাণী। রাজা যেন থেকেও নেই। তিনি রাণীর স্বামী এই মাত্র। রাজা নন। রাণী ভাল মানুষ, তিনি আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেন না। সেখানে রয়েছে মন্ত্রিসভা। তাঁরাই রাজকার্য চালনা করেন। এবং এই মন্ত্রিসভা সাধারণতঃ গঠিত হয় দু-তিনটে রাজনৈতিক দল নিয়ে। অর্থাৎ সর্বদাই এখানে চলে কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট। তার প্রধান কারণ হল, এখানে শতকরা তেত্রিশজন রোমান ক্যাথলিক, শতকরা পঁয়তাল্লিশ জন প্রোটেস্টাণ্ট আর বাদ বাকি অন্য ধর্মাবলম্বী।

রোমান ক্যাথলিকদের রয়েছে ক্যাথলিক পার্টি। ক্যাথলিক

সম্প্রদায়ভুক্ত ভোটদাতারা ভোট দেয় সাধারণতঃ ক্যাথলিক পার্টিকে ; তেমনি প্রোটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়ভুক্তরা প্রোটেস্টাণ্ট পার্টিকে। তার ওপর রয়েছে লেবার সোস্যালিস্ট পার্টি, লিবারেল পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টি। সোস্যালিস্ট ও লিবারেল পার্টি এক-এক নির্বাচনে বেশ ক্ষমতা লাভ করে। কিন্তু তারা কোনও দিনই একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারে না। সোস্যালিস্ট পার্টি চায় বড় বড় কয়েকটি ব্যবসা ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করতে। লিবারেল পার্টি চায় সব কিছুই সরকারী আওতা হতে মুক্ত করতে। এরা চায়, ব্যবসায়ীদের আরও স্বাধীনতা দিতে কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থা এখানে বড়ই শোচনীয়। তাও আবার ছটো ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত। সব শুদ্ধ রাজনৈতিক দলের সংখ্যা হল আটটি।

ওলন্দাজরা গোঁড়া ও রক্ষণশীলের জাত প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মাবলম্বীরা ক্যাথলিকদের ভোট দেবে না। তেমনি ক্যাথলিকরাও প্রোটেস্টাণ্টদের ভোট দেয় না।

ডাচরা বিয়ে-থা করে ঘর সংসারে ডুবে থাকে মেয়েরাও ঘর-সংসার করতে বেশী ভালবাসে। ডাচরা কাফে রেস্তোরাঁয় ফরাসী বা ইতালিয়ানদের মতন বেশী আড্ডা মারে না। এরা ঘর-মুখো। তাই ডাচ-বাড়িতে ঢুকলে দেখা যাবে ঘরদোর সব ঝক্‌ঝক্ করছে। জানলাগুলো সবই চওড়া আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাস্তা ঘাটের তো কথাই নেই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় ডাচরা সুপরিচিত। ডাচ-সংস্কৃতিতে ইউরোপের তিনটি দেশের সংস্কৃতি বিশেষভাবে বিস্তার করেছে। জার্মান-ফরাসী ইংরেজ। তাই ডাচ ভাষায় পাবেন জার্মান-ফরাসী আর ইংরেজী শব্দ। ভাষাতে যেমন এরা তিন মিশেলি, তেমনি খাদ্যের ব্যাপারেও। এদের খাদ্য সুখাদ্য। কিন্তু পানীয়ের ব্যাপারে চরম। মাদক দ্রব্যের চরমতা কাফে-বারে ঢুকলেই দেখা যাবে।

তবে হ্যাঁ, ডাচরা খাটিয়ের জাত। এদেশে কেউ হাত

গুটিয়ে বসে নেই। এদের অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে প্রত্যহ প্রকৃতি দেবীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। দেশটা যেমন ছোট্ট, তেমনি বৃহৎ এদের জনসংখ্যা। দেশের আয়তন মাত্র ১২,৬০০ বর্গ মাইল। কিন্তু জনসংখ্যা ১০,৫০০,০০০ এর বেশী। জগতে হল্যাণ্ডেই সবচেয়ে বেশী জনসংখ্যা—বর্গ মাইল প্রতি এখানে বাস করে ৮৩৩ জন। সে ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে মাত্র ২১৫। তার ওপর দেশের দুই-পঞ্চমাংশ জমিই সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচে। আগে তো প্রায়ই ওই নিচু জমি বানের জলে ভেসে যেত। সেই থেকে এদের লড়তে হচ্ছে সমুদ্রের বিরুদ্ধে। সমুদ্রকে এরা বশে এনেছে।

হল্যাণ্ড আয়তনে ছোট হলে হবে কি, এরা এক কালে অভিযান চালিয়েছে সুদূর দেশে। ওলন্দাজরাই প্রথম আবিষ্কার করে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান নিউইয়র্ক জেলা ডাচরাই পত্তন করে। তখন অবশ্য তার নাম ছিল নিউ আমস্টারডাম। এক কালে ওলন্দাজরা কলকাতার কাছে চুঁচুড়াতেও উপনিবেশ গড়েছিল।

আগেই বলেছি ডাচদের লোকসংখ্যা এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, এক হল্যাণ্ডে তাদের বাস করা অসম্ভব। তাই ডাচ সরকার উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার পুনর্বাসন করার জন্যে এক সরকারী প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন। এই প্রতিষ্ঠান প্রতি বছরে ডাচদের হাজারে হাজারে প্রেরণ করে আমেরিকায়, কানাডায়, অস্ট্রেলিয়ায় আর দক্ষিণ-আফ্রিকায়। গত দশ বছরে কয়েক লক্ষ ডাচ বিভিন্ন দেশে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেছে।

পশ্চিম ইউরোপে হল্যাণ্ডের জীবনযাত্রার মান বেশ উচ্চ। প্রায় শতকরা সত্তরজনই সমাজ-বীমা ভোগ করে থাকে। কর্মচারী, মালিক ও সরকার তিনজনে সমানভাবে প্রতিমাসে সমাজ-বীমা তহবিলে টাকা জমা দিয়ে থাকে।

হল্যাণ্ডে শিক্ষা, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক তো

বটেই উপরন্তু বাধ্যতামূলক। ছ' বছর থেকে চোদ্দ-পনর বছর বয়স পর্যন্ত চলে প্রাথমিক শিক্ষা। তারপর যে-যার ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করে। কেউ কারিগরি, কেউ চাষাবাদ নয়ত উচ্চ শিক্ষা। প্রাথমিক বা সাধারণ বিত্থালয়ের একটি বিদেশী ভাষা প্রত্যেককে শিখতেই হয়। হল্যাণ্ডে সব-শুদ্ধ রয়েছে ছটি বিশ্ববিত্থালয়। তাদের মধ্যে নামকরা হল লাইডেন আর উট্রেখ্ট। আমস্টারডাম আর রটারডাম কম যায় না। হেগ-এ এই বছর সাতেক হল একটি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সেটা হল ইণ্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল স্টাডিজ। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঁয়ত্রিশটি দেশের ছাত্র-ছাত্রী নানান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে পনর জনই ভারতীয়। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছরে অনেকগুলো বৃত্তি দিয়ে থাকে। প্রাক্তন রাজপ্রাসাদে এখন চলেছে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ।

আমি হল্যাণ্ডে এসে একমাত্র হেগ শহরেই বসে নেই। হল্যাণ্ডের ছোট-বড় শহর ও গ্রামেও ঘুরে দেখেছি। আরও দেখেছি এদের বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো। তাদের মধ্যে হেংগলো, আইণ্ডহোভেন, রটারডাম, আমস্টারডাম ও উট্রেখ্ট-এ দেখলাম বিরাট বিরাট কারখানা। হল্যাণ্ডের মতন ছোট দেশ যে এত বড় কারখানা চালাতে পারে তা ভাবলে আশ্চর্য লাগে। আইণ্ডহোভেনে রয়েছে বিখ্যাত ফিলিপস কারখানা। ওই কারখানায় কী যে তৈরী না হয় তা বলা শক্ত। হেংগলোর স্টর্ক কারখানা উট্রেখ্ট ও আম্স্টারডাম-এর ভ্যার্কস্পুর কারখানায় দেখলাম ভারতবর্ষের জন্যে এরা তৈরী করছে বড় চিনির কল, বিরাটকায় পাম্পিং স্টেশন, রেলের কোচ্ আরও অনেক কিছু। এদের এক-একটি কারখারনায় কাজ করে পাঁচ থেকে দশ হাজার শ্রমিক। তবে সবচেয়ে মজার হল এই যে, এই সব কারখানায় নাকি কখনো ধর্মঘট হয় না।

স্টর্ক আর ভ্যার্কস্পুর কারখানায় নতুন জিনিস দেখলাম। তুটো

কারখানায় একটি অংশ রয়েছে কারখানায় কাজ শেখাবার জন্যে। এখানে বার-তের বছর থেকে পনর-ষোল বছরের ছেলেরা হাতে-কলমে কাজ শিখছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এরা এখানে কাজ শেখে তিন-চার বছর ধরে। তার সঙ্গে যন্ত্র-শিল্পের বিদ্যালয়েও পড়তে হয়। ছোটবেলা থেকে কারখানার কাজে ছেলেদের লাগালে তারা বড় হয়ে হবে দক্ষ যান্ত্রিক। এই ধরণের ছাত্র সংখ্যা এক একটি কারখানায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ। এমনি এক ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি এখন স্টর্ক কারখানায় চিনি-কল বিভাগের ডিরেক্টর। তিনি তাঁর জীবন আরম্ভ করেন এমনি শিক্ষা-নবিশ হিসেবে। পরে ধাপে ধাপে উঠে তিনি এখন ডিরেক্টর। গত চল্লিশ বছর ধরে একই কারখানায় কাজ করে তিনি পাকা ইঞ্জিনীয়ার হয়েছেন।

হেগ শহরে একটি জিনিস চোখে পড়ল। স্কুলের ছুটির পরে দেখলাম ফুটপাথের ধারে পাঁচ-সাত বছরের ছেলে সাদা পোশাক পরে হাতে পুলিসের পতাকা নিয়ে রাস্তার যানবাহন থামাচ্ছে। যানবাহন থামলেই তার সহপাঠীরা রাস্তা পার হচ্ছে। শখের পুলিসটি বিদ্যালয় হতে প্রতিদিন নির্বাচিত হয় শিক্ষক কর্তৃক। তাতে স্কুলের ছেলে-মেয়েরা যেমন পায় আনন্দ তেমনি এই কাজের ভেতর দিয়ে বাড়ে তাদের দায়িত্বজ্ঞান।

রটারডাম থেকে আমস্টারডাম

রটারডাম ও আমস্টারডাম হল্যাণ্ডের শুধু দুটো বন্দর নয়, দুটো বড় শহর। বিশ্বের বৃহত্তম বন্দরগুলোর মধ্যে রটারডাম এখন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। প্রথম হল নিউইয়র্ক, দ্বিতীয় রটারডাম আর তৃতীয় লণ্ডন। আমস্টারডাম অত বড় বন্দর নয়। কিন্তু শহর হিসেবে সবচেয়ে বড। আমস্টারডাম ও রটারডামের দুটো ডামই হল ড্যাম অর্থাৎ বাঁধ। রটারডাম শহরের উৎপত্তি রটার নদী থেকে। আমস্টারডামের উৎপত্তি আমস্টেল নদী থেকে। ড্যাম বা বাঁধ হল হল্যাণ্ডের প্রতীক চিহ্ন। হল্যাণ্ড জলা দেশ। খাল-বিল-নদী চারদিকে জুড়ে রয়েছে। সেই খাল-বিল আর নদীকে এরা বেঁধেছে আষ্টে-পৃষ্ঠে।

উত্তর মধ্য হল্যাণ্ডের সমুদ্রাঞ্চলকে এরা বলে জাইডার জী। সেখানে তারা সমুদ্রের জল সেচে জমি বানিয়েছে, সে জমিতে হচ্ছে উৎকৃষ্ট ধরনের চাষ। এই নতুন জমিকে বলে ডাচ্ ভাষায় 'পোল্ডার'। পোল্ডার-এর কাজ আজ শুরু হয় নি। এর কাজ শুরু হয় ষোডশ শতাব্দীতে। সে সময়ে পোল্ডার বানান ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু গত পঁচিশ বছর ধরে এরা পোল্ডার নির্মাণ করে চলেছে ক্রমান্বয়ে। তার মধ্যে তিনটে তো বড গ্রামই হয়ে গেছে। আরও দুটোর কাজ এখনও চলছে, আগামী বছরে তার কাজ সমাপ্ত হবে।

জাইডার জী অর্থাৎ দক্ষিণ সমুদ্রের বাঁধ এরা তৈরী করেছে ১৯২৯ সালে। তারপর নিচের দিকে আস্তে আস্তে পোল্ডার তৈরী করেছে। নর্ড ওস্ট পোল্ডারটির নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৯৪২ সালে। ওস্ট লিঙ্ক পোল্ডার ১৯৫৭ সালে নির্মিত হলেও তার চাষাবাদ এখনও শুরু হয় নি। নর্ড ওস্ট পোল্ডারের কেন্দ্রীয় শহর এমলর্ড। এমলর্ডে সেদিন দুপুরবেলার ভোজন সাঙ্গ করলাম সর্ববৃহৎ হোটেল-

রেস্তোরাঁয়। যে রেস্তোরাঁয় আমরা ভোজন করলাম সেটি এককালে ছিল সমুদ্রগর্ভে। সমুদ্রগর্ভের এই হোটেলটি শুধু হোটেলই নয়, গ্রামবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এখানে রয়েছে বড় বড় হলঘর। সেখানে সপ্তাহে হয় কেনা-বেচা।

হল্যাণ্ডের সমস্যা শুধু জমি নয়। জলও। অর্থাৎ এখানে এত বেশী নোনা জল যে তা ব্যবহারযোগ্য নয়। তাই ওয়াটার স্টেট মন্ত্রী-দপ্তর দেশের বিভিন্ন জায়গায় সমুদ্রের জলে বাঁধ বেঁধে নোনা জলকে মিষ্ট জলে পরিণত করছে। এই ধরনের মিষ্টি জলের আধারের পরিমাপ এদেশে নতুনভাবে সৃষ্টি হয়েছে তিন লক্ষ একর জমির পরিমাপে।

ডাচরা বাঁধ বাঁধার কাজে, পোল্ডার তৈরীর কাজে হাত পাকিয়েছে। তাই তারা আজ বিশ্বের চারধারে ছড়িয়ে পড়েছে ওই কাজে। বিভিন্ন দেশে জল সেচের কাজে বাঁধ বাঁধার কাজে ডাচ্‌রা সুনাম অর্জন করেছে। আজকাল এরা আমেরিকার মতন উন্নত দেশেও বন্দর তৈরীর কাজে, বাঁধ বাঁধার কাজে লেগেছে। ভারতবর্ষেও ওরা কাজ শুরু করেছে—একটি কলকাতার কাছে সল্ট লেকে, অপরটি সৌরাষ্ট্র জেলায়। সৌরাষ্ট্রের কাজ আরম্ভ হয়েছে। সেখানে তারা নোনা জলকে মিষ্ট জলে পরিণত করবে, আরও সুদূর ভবিষ্যতে তারা নির্মাণ করবে পোল্ডার বা জমি। এই কাজের জন্যে হল্যাণ্ডে একটি আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম নেডেকো। এই নেডেকোর কয়েকজন ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে আলাপ হল হেগ শহরে। তাদের একজন ইঞ্জিনীয়ার আমায় জানাল যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নাকি সুন্দরবন অঞ্চলকেও পোল্ডার-এ পরিণত করতে চান। তাহলে সেখানে চাষাবাদ হবে।

ডাচ্‌রা যেভাবে সমুদ্রকে বেঁধেছে তাতে তার শক্তির পরিচয় মিলবে তার যন্ত্র-শিল্পে। হল্যাণ্ডে তিনটে যন্ত্র-শিল্পের প্রতিষ্ঠানই বিরাটকায়, হেঙ্গেলোর স্টর্ক, আমস্টারডাম-এর ভ্যার্কস্পুর ও

আইণ্ডহোভেনের ফিলিপ্‌স। ফিলিপ্‌স কারুর অজ্ঞাত নয়। স্টর্ক ও ভ্যার্কস্পুর কারখানায় কাজ করে চল্লিশ হাজার কর্মচারী। এরা তৈরী করে বড় বড় পাম্প, জাহাজের ইঞ্জিন, রেলের ইঞ্জিন ও চিনির কল। ভারতবর্ষে এরা অনেক চিনির কল বেচেছে। ফিলিপ্‌স্-এর কারখানায় কাজ করে বিশ হাজার কর্মচারী।

রটারডাম আর সেই রটারডাম নেই। রটারডাম পেয়েছে নবজীবন। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রটারডাম শহর ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কিন্তু এখন সেখানে গড়ে উঠেছে নতুন শহর। প্রায় সব অট্টালিকাই নতুন। বাক্স-প্যাটার্নের বাড়ি-ঘর। কতকগুলো বাড়ি তো দেখলে মনে হবে যেন কাঁচের বাড়ি। রটারডামে সবই আধুনিক।

রটারডাম বন্দরে একমাত্র ১৯৫৭ সালেই বাইশ হাজার সমুদ্রগামী জাহাজ যাওয়া-আসা করেছে। তা-ছাড়া রটারডাম থেকে রাইন নদীতে চলাচল করেছে বিশ হাজার স্টীমার। রটারডাম বন্দর থেকে সোজা মধ্য-ইউরোপের দেশগুলোতে যাওয়া-আসা করা যায় রাইন নদী দিয়ে। তাই ঐসব দেশের বাণিজ্যের একাংশ চলে রটারডাম বন্দর দিয়ে। এই কারণেই রটারডাম বন্দর এত বেশী ব্যস্ত।

হল্যাণ্ডের চাষবাস

জলাদেশ হল্যাণ্ড। হল্যাণ্ড দেশটার সর্বত্রই জল। খাল-বিল-নালা-নদীতে ভর্তি দেশটা। হল্যাণ্ডে জলে-মানুষে লড়াই চলছে যুগ যুগ ধরে। তাদের লড়াই এখনও থামে নি।

সমুদ্রপারের নিচে দেশের নিচু জমি। তাই আগে যখন-তখন সমুদ্র তার ইচ্ছামত দেশটার এক-এক অংশ দিত ভাসিয়ে। শুধু কি সমুদ্রই এদের সমস্যা? সমুদ্রের পার বাঁধলে ওদিকে নদীগুলো আনে বন্যা। তাই এদের বাঁধতে হয়েছে সমুদ্রের সঙ্গে সঙ্গে নদীগুলোকেও। এরা এতই পরিশ্রমী যে, শুধু সমুদ্রকে বেঁধেই খালাস নয়। সমুদ্রের এক-একটা অংশ বেঁধে তার জল বার করে সমুদ্রকে এরা রূপান্তরিত করেছে চাষ-আবাদের জমিতে। সে জমিতে এখন চাষ-আবাদ হচ্ছে দেখে এলাম।

হল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা এক কোটি। কিন্তু দেশের আয়তন মাত্র পনের হাজার চারশ পঞ্চাশ বর্গমাইল। তার মধ্যে দু হাজার দশ বর্গমাইল তো জলরাশি, অর্থাৎ দেশের এক চতুর্থাংশই জলা। এক মাইল প্রতি লোকসংখ্যা আটশ-র উপর, তার উপর যদি দেশের এক-চতুর্থাংশ হয় জলা, তাহলে সেখানে লোক-সমস্যা হবে না তো কী! ওই লোক-সমস্যা ও জলা-সমস্যার সমাধা নেই। ডাচ জনসাধারণ ও যান্ত্রিকেরা উঠে পড়ে লেগেছেন সমুদ্রকে বেঁধে তার জল বার করে নতুন জমি সৃষ্টি করতে। নতুন জমিতে হচ্ছে এখন চাষ-আবাদ, যার ফলে বাড়তি লোকের খাদ্যসমস্যা ঘুচবে। লোক-সমস্যার প্রধান সমস্যা হল খাদ্য। সুতরাং সে খাদ্য যোগাড় করতে হলে চাই ফসল ও তার অধিক উৎপাদন। হল্যাণ্ডের সরকার ও বৈজ্ঞানিকেরা সেই সমস্যার সমাধান করছেন নতুন উপায়ে। সে উপায় সোজা বা সামান্য নয়। এ কাজ আসুরিক। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্য-সমস্যা প্রকট হচ্ছে। ভারতবর্ষে সমস্যা ভিন্ন। ভারতে

জমি থাকতেও চাষ হয় না। অনাবাদী জমি চাষ করে তখনও যদি খাদ্য সমস্যা মেটান না যায়, তখন ভারতবর্ষেও সৃষ্টি করতে হবে নতুন পোল্ডার বা সমুদ্রের জল সেচে নতুন জমি।

পোল্ডার শব্দটি সম্পূর্ণ ডাচ। অর্থাৎ জল থেকে নতুন জমির সৃষ্টি। হল্যাণ্ডে পোল্ডার সৃষ্টি আজকের নয়। ওরা ষোড়শ শতাব্দীতে শুরু করে প্রথম পোল্ডার নির্মাণ। সেকালে পোল্ডার নির্মাণ ছিল সীমাবদ্ধ। ডাচরা হল্যাণ্ডের বিভিন্ন জায়গায়ই বাঁধ ও পোল্ডার তৈরীর কাজ শুরু করেছে পঞ্চাশ বছর ধরে; তার মধ্যে যেখানে তারা কৃতকার্য হয়েছে, সেই পোল্ডারগুলোর কথাই বলি প্রথমে।

হল্যাণ্ডের উত্তর-মধ্য প্রদেশের জলা জায়গাটাকে বলে জাইডারজী। ওই জলা জায়গাটা খাল বা বিল নয়। রীতিমত সমুদ্র। তাই তার নাম দক্ষিণ সমুদ্র। জাইডারজী অথবা দক্ষিণ সমুদ্রের ঠিক মুখে ওরা বাঁধ তৈরি করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে। জাইডারজীর মুখে বাঁধ দেওয়ায় দক্ষিণ সমুদ্র আর সমুদ্র থাকে না, হয়ে যায় বৃহৎ খাল। আগে জাইডারজী সমুদ্রের জল ছিল অব্যবহার্য, কারণ জল ছিল লোনা। বাঁধ দেওয়ার পরে সমুদ্রের লবণ থিতিয়ে ওই জল হয় সুমিষ্ট। যে জল আগে ছিল লোনা ও চাষ আবাদের অযোগ্য, সে জল হল চাষের যোগ্য। তাছাড়া মাছ ধরাও হল সহজ। আরও ইসেল নদীর জলই জাইডারজী অঞ্চলে প্রবেশ করে ওর জলকে করেছে মিষ্টি।

প্রথমে ওরা জাইডারজীর মুখে বাঁধ বেঁধে এক-এক করে ছোট ছোট বাঁধ দিয়ে জাইডারজী সমুদ্রাঞ্চলে ৫৪৬,০০০ একর জমি উদ্ধার করে বা পোল্ডার তৈরি করে। জাইডারজী বাঁধ আয়তনে বিশ মাইল লম্বা। শুধু বাঁধ বাঁধলেই হল না। জাইডারজী অঞ্চলে যখন জল উপচে পড়ে, তখন এরা সে জল পাম্প করে পাঠিয়ে দেয় সমুদ্রাঞ্চলে। এই জল পাম্প করার কাজে পঁচিশটি বিরাটকায়

পাম্প নিয়মিত কাজ করছে। আর পোল্ডার অঞ্চলে ওরা ওখানকার জল অনবরত পাম্প করে পাঠায় খালে। জল বেরিয়ে জমি উপরে উঠতে আরম্ভ করে। পরে অল্প জল ওই জমিতে আপনা-আপনি শুকিয়ে পরিণত হয় পোল্ডার।

যখন জাইডারজীর মুখে বাঁধের কাজ শেষ হয় ১৯৩২ সনে, তখন প্রথম পোল্ডার নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয় জাইডারজীর মধ্য-পশ্চিম কোণে। নতুন পোল্ডারের নাম ভিরিংগারমীয়ার পোল্ডার। এই নতুন পোল্ডারে এরা উদ্ধার করে ৫০,০০০ একর জমি। ভিরিংগারমীয়ার পোল্ডারের কাজ শেষ হতে ওরা আবার নতুন পোল্ডারে কাজ শুরু করে জাইডারজীর মধ্য পশ্চিম কোণে। ওর নাম নর্থউস্ট পোল্ডার বা উত্তর-পশ্চিম পোল্ডার। উত্তর-পশ্চিম পোল্ডারে এখন রীতিমত চাষবাস তো হচ্ছেই উপরন্তু নতুন গ্রামেরও পত্তন হয়েছে। এই নতুন জমির আয়তন ১১৯,০০০ একর। নর্থউস্ট পোল্ডার-এর কাজ শেষ হতে না হতেই ইস্টার্ণ ফ্লেবোল্যাণ্ড পোল্ডারের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে বছর কয়েক আগে। নতুন পোল্ডারের জমির আয়তন ১৩৩,০০০ একর। এই পোল্ডারের ধার দিয়ে গিয়েছে বাঁধ, বাঁধের উপর পথ, পথের দৈর্ঘ্য ষোল মাইল। ডাইকের পথে যেতে যেতে দেখলাম, নতুন পোল্ডারের জল এখনও সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায় নি। জল শুকোতে এখনও মাস দশেক লাগবে। হয় এ বছরের শেষে নয়ত সামনে বছরের গোড়ায় ওই পোল্ডারের কোন কোন জমিতে চাষ শুরু হবে। নতুন পোল্ডার ইস্টার্ণ ফ্লেবোল্যাণ্ড-এর পর আরও দুটো পোল্ডারে কাজ শিগগিরই শুরু হবে। তার ফলে দক্ষিণ-ফ্লেবোল্যাণ্ড-এ পাওয়া যাবে ১১১,০০০ একর জমি, আর মারকারভারড-এ পাওয়া যাবে ১৩৩,০০০ একর জমি। ডাচ সরকারের পরিকল্পনানুযায়ী জাইডারজী অঞ্চলের পোল্ডারের কাজ শেষ হবে ১৯৮০ সনে। তার ফলে ওরা পাবে ৫৪৬,০০০ একর নতুন জমি। নতুন পোল্ডার নির্মাণের ফলে

হল্যাণ্ডের পঁচিশ লক্ষ লোক পাবে জীবনধারণের পথ। সেখানে শুধু চাষ-আবাদই হবে না, যন্ত্রশিল্পের কাজও চলবে। তার ফলে যন্ত্রশিল্পে কাজ পাবে আরও অধিক সংখ্যক জনসাধারণ।

হল্যাণ্ডে বাঁধ দেওয়ার কাজ শুধু পোল্ডার নির্মাণের জন্যেই নয়। নিচু জমিতে সমুদ্রের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও বটে। ১৯৫৩ সনের ১লা ফেব্রুয়ারিতে হল্যাণ্ডে যে বন্যা হয়, তাতে হাজার হাজার নরনারী হয় গৃহহীন। প্রায় তিন শ মাইলব্যাপী জমি হয় জল-নিমগ্ন। হল্যাণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিমাংশ জীল্যাণ্ডে হয় এই বন্যা। বন্যার পরই ওখানে নতুন নতুন ডাইক বা বাঁধ তৈরী হতে থাকে। হল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগটি নিচু জমি তো বটেই, উপরন্তু ছোট ছোট দ্বীপের মত। তাই ওখানে ওদের বাঁধ দিতে হয়েছে অনেকগুলো। বাঁধ দেওয়ার কাজ সমাপ্ত হয়েছে, এখন চলছে ওখানে পোল্ডার নির্মাণ। ওদের বাঁধ দেওয়ার কাজও দেখলাম। ওখানে যেমন ঠাণ্ডা তেমনি প্রচণ্ড বাতাসের বেগ। তার মধ্যে কাজ করা যে কত কষ্টকর, তা না দেখলে বোঝার উপায় নেই। ওদের বাঁধ বাঁধার কাজ বেশ মজার। প্রথমে ওরা উইলো গাছের ডালপালা দিয়ে তৈরি করে মাচা। উইলো গাছ মাঝারি ও সরু। হল্যাণ্ডে ওগাছ জন্মে প্রচুর। ওই চারা গাছ ও তার ডালপালা নিয়ে মাচাগুলো ওরা ভাসিয়ে দেয় যেখানে বাঁধ হবে। তার উপর আস্তে আস্তে পাথরের চাঁই, বালি ও কাদামাটি ঢালতে থাকে। বালি ও কাদামাটি জমে হয়ে ওঠে কংক্রিটের মত শক্ত। এইভাবে গড়ে ওঠে ওদের বাঁধ।

জাইডারজী পোল্ডারে দেখলাম ওখানে চাষ হচ্ছে নিয়মিত। একটি চাষী-পরিবারে কাটালাম একদিন। তারা বলল যে, হল্যাণ্ডের সাধারণ জমি থেকে পোল্ডার-জমি অনেক বেশী উর্বর। এতে ফলন হয় অনেক বেশী। তাই চাষীরা সবাই বেশ ধনী। আমি তো দেখলাম, প্রায় প্রতিটি খামার-বাড়িতে রয়েছে একটি

করে মোটরগাড়ি। আর একটি বড় খামার বাড়িতে দেখলাম, তাদের আছে আটটি ঘোড়া। ঘোড়া ছাড়া ট্রাক্টরও রয়েছে। ইউরোপে সাধারণত ঘোড়ার সাহায্যে চাষ হয়ে থাকে। খামারের মালিক শুধু ঘোড়া দিয়ে চাষ করেন না, গ্রীষ্মকালে ওই ঘোড়ার ঘোড়দৌড়ও করেন।

জ্বাইডারজী পোল্ডারে আর একটি নতুন জিনিস দেখলাম, তা হল, সব চাষীই প্রায় বয়সে যুবা। তার কারণ জিজ্ঞাসা করায় একজন সরকারী কর্মচারী বলল যে, বৃদ্ধরা নতুন জমিতে চাষবাস করতে চায় না। তাই সরকার অল্পবয়স্কদের মধ্যে জমির বাঁটোয়ারা করে। আরও কারণ হল, নতুন জমির সঙ্গে মানুষের শুধু পরিচয়ই মুখ্য নয়, নতুন জমিতে গোড়া থেকে অভ্যস্ত হওয়া আরও প্রয়োজনীয়। অল্পবয়সী যে-সব চাষী প্রথমে নতুন পোল্ডারে আসে, তারা এখন ওই জমির সঙ্গে অভ্যস্ত হয়েছে।

নর্ডউস্ট পোল্ডারের এমলর্ড গ্রামে দেখলাম, অসংখ্য বালক চলেছে এমলর্ডের হোটেল-বাড়িতে। আমরাও যাচ্ছিলাম ওই হোটেলের রেস্তোরাঁয় ভোজন করতে। ওই হোটেলটি শুধু হোটেল নয়। ওখানে রয়েছে এক ধারে বিরাট দুটো হল ঘর ও অপর ধারে থিয়েটার ঘর। বড় হলঘরে চলে সাপ্তাহিক পাইকারি দরে কেনাবেচা, থিয়েটার-হলে চলে সিনেমা, নয়তো থিয়েটার। ওই সিনেমা-হলে শুধু আমোদ-প্রমোদই হয় না। দেখলাম, সিনেমা-হলে চলছে ছায়াছবির সাহায্যে কৃষি সম্বন্ধে বক্তৃতা। বক্তৃতা শুনছে চোদ্দ থেকে ষোল বছরের ছেলেরা। এরা আর কিছুদিন পরেই চাষের কাজে যোগদান করবে। নতুন জমি ও নতুন জীবনের সঙ্গে তাদের অভ্যস্ত করান হচ্ছে।

বলা বাহুল্য পোল্ডার নির্মাণে অসংখ্য পাম্প প্রত্যহ কাজ করে থাকে। বাঁধের কাজে লাগে ভাসমান কারখানা। এদের সব যন্ত্রপাতিই তৈরী হয় হল্যাণ্ডে। যান্ত্রিক তো হল্যাণ্ডেরই। ডাচ-

সরকারের একদল ইঞ্জিনীয়ার এখন ভারতবর্ষেও কাজ শুরু করেছেন। সৌরাষ্ট্রের লোনা ও জলা জমিকে তাঁরা উর্বর জমিতে শিগগিরই পরিণত করবেন। তাছাড়া কলকাতার কাছে লবণহ্রদেও তাঁরা কাজ শুরু করবেন। ডাচরা পরিশ্রমী ও উদ্যমশীলের জাত। ওদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।

বেলজিয়াম

হল্যাণ্ড সমতল ভূমির দেশ। বেলজিয়াম সমতল ও পাহাড়ে দেশ। বেলজিয়ামে প্রবেশ করে ঢেউ-খেলান উঁচু নিচু পথে চলেছি ব্রুসেলস্-এর পথে। ব্রুসেলস্ বেলজিয়ামের রাজধানী। ব্রুসেলস্-এর বাড়ি ঘর-দোর, রাস্তাঘাট দেখতে প্যারিসের মতন। প্যারিসের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে ব্রুসেলস্-এর পথে-ঘাটে, কিন্তু ব্রুসেলে নেই প্যারিসের প্রাণ।

ডাচরা যেমন তিনটে জাতের তিন মিশেলি তেমনি বেলজিয়ানরা দুই জাতের মিশেলি। ডাচ্ ও ফরাসীর মিশ্রণে উৎপন্ন বেলজিয়ান জাত। এরা ভাষায় ফরাসী কিন্তু চেহারায় ডাচ্। ডাচ্ রুক্ষতা পাওয়া যাবে এদের চেহারায়। বেলজিয়ামের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটি রেখা টানলে দেখা যাবে যে, উত্তর ভাগ ফ্লেমিশ জাতি অর্থাৎ ডাচ্ ভাষীর দেশ; দক্ষিণ ভাগ ফরাসী ভাষীর দেশ। ফরাসী ভাষীরা ঠিক পুরোপুরি ফরাসী যেমন ভাল করে উচ্চারণ করে না। তেমনি উত্তর ভাগের ডাচ্ ভাষীরা ডাচ্ ভাষা। বেলজিয়ামের দুই অঞ্চলের ভাষা বিশেষ ধরনের। সাধারণতঃ দক্ষিণাঞ্চলের ফরাসীরা ডাচ্ ভাষা জানে না এবং বলে না। কিন্তু উত্তরাঞ্চলের ডাচ্ ভাষীরা ডাচ্-ভাষার সঙ্গে ফরাসীও শেখে ও বলে। দুটো ভাষাই সরকারী ভাষা। ইউরোপের ছোট্ট দেশগুলোর মধ্যে বেলজিয়াম অন্যতম। এর আয়তন মাত্র ত্রিশ

হাজার পাঁচশো বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা নব্বুই লক্ষ। বেলজিয়াম রাজার দেশ। অর্থাৎ এদেশে রাজা রাজ্য চালান। রাজা থাকতেও রাজনৈতিক দলগুলোই মন্ত্রিসভা গঠন করে তারা আসলে রাজ্যশাসন পরিচালনা করেন। মধ্যযুগ থেকে বেলজিয়ামে রাজত্ব করেছে ফরাসী রাজবংশ, জার্মান রাজবংশ, স্প্যানিশ রাজবংশ, অস্ট্রিয় রাজবংশ ও ডাচ্ রাজবংশ। মাত্র বিগত শতাব্দী থেকে চলছে বেলজিয়ামে স্বাধীন বেলজিয়ান রাজবংশ। বর্তমান বেলজিয়ান রাজবংশ কিন্তু জার্মান বংশোদ্ভূত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে যখন জার্মানরা বেলজিয়াম দখল করে তখন তৎকালীন মন্ত্রিসভা বেলজিয়াম ছেড়ে চলে যায় লণ্ডনে কিন্তু রাজা লিওপোল্ড থেকে যান বেলজিয়ামে। তিনি বেলজিয়ামে থেকে তাঁর প্রজাদের সঙ্গেই বসবাস করেন কিন্তু যুদ্ধ থামার সঙ্গে সঙ্গেই যখন নির্বাসিত বেলজিয়ান মন্ত্রিসভা বেলজিয়ামে প্রবেশ করে তখন রাজা লিওপোল্ডকে সিংহাসন ছাড়তে হয়। তার জায়গায় তখন সিংহাসনে বসে তাঁর নাবালক পুত্র বদুয়াঁ। রাজকুমার বদুয়াঁ তখন বেলজিয়ামের সম্রাট। বয়স মাত্র বাইশ। তিনি সারা ইয়োরোপ খুঁজে বেড়িয়েছেন তাঁর মনের মতন একটি রাণী যোগাড় করতে। অনেক কষ্টে পেয়েছেন

বেলজিয়ান রাজনীতিতে তিনটে রাজনৈতিক দলই প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন। প্রথম হল রোমান ক্যাথলিক দল ক্রিশ্চান সোস্যাল, দ্বিতীয় দল সোস্যালিস্ট পার্টি ও তৃতীয় দল লিবারেল। কম্যুনিস্টদের অবস্থা বড়ই সঙ্গীন। তারা কোণঠাসা তবে কখনো হয় এদেশে কোয়ালিশন সরকার কখনো বা শুধু ক্যাথলিক দলের মন্ত্রিসভা। ক্যাথলিক দল ও সোস্যালিস্ট দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই দুই দলে চলে রেষারেষি।

বেলজিয়াম ছোট্ট দেশ হলে হবে কি। তাদেরও উপনিবেশ ছিল। আফ্রিকা কঙ্গো ও রুয়াণ্ডা উরাণ্ডি প্রদেশ এদের উপনিবেশ

ছিল। বেলজিয়ান কঙ্গোতে এই কিছুদিন আগে বেশ লড়াই হয়ে গেল। তার ফলে বেলজিয়ান মন্ত্রিসভা বিশেষ ভাবিত। বেলজিয়ামের বিজ্ঞ লোকেরা বলছেন যে, উপনিবেশ ছেড়ে দেওয়াই ভাল, বুদ্ধিমানের কাজ হবে। নইলে অনর্থক খরচ। একদল কিন্তু একগুঁয়ে। তারা নাছোড়বান্দা। উপনিবেশ আগলে বসে থাকবেন। বেলজিয়ান কঙ্গোতে যে মারামারি কাটাকাটি হয়ে গেল তা নাকি কঙ্গো প্রদেশের বিভিন্ন উপজাতিদের লড়াই। লড়াই হলেও কেউ কেউ মনে করেন তা নাকি বিদেশীদের উস্কানির ফলে হয়েছে।

এই সেদিন গিয়েছিলাম ব্রুসেল্‌স থেকে গাঁ ও ব্রুজ দেখতে। ইংরেজীতে গাঁকে বলে ঘেণ্ট। ব্রুজ ও গাঁ শহর দুটো বেলজিয়ামের দুই রত্ন। ইউরোপের অনেক শহর দেখেছি কিন্তু মধ্যযুগের স্মৃতি বহন করে এখনও বেঁচে আছে এমন শহর ইউরোপে বিরল। প্রায় ঐতিহাসিক শহরই অল্পবিস্তর অদলবদল হয়েছে তার চেহারায়। কিন্তু ব্রুজ? ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রুজ যা ছিল এখনও তাই আছে। গাঁ শহরের মধ্যভাগও তাই। এটা যে অতি আধুনিক যুগ তা ব্রুজের বাড়িঘর, পথঘাট দেখলে বোঝা যাবে না। যেন রোমাণ্টিক।

শুধুই কি রোমাণ্টিক। আর আর্ট! যেন আর্ট ছড়াছড়ি যাচ্ছে ব্রুজ শহরে আর গাঁ-র চার্চগুলোতে। ভাবলে অতি আশ্চর্য লাগে যে, যে সময়ে ইতালিতে এসেছিল রেনেসাঁ অর্থাৎ নবজন্ম পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীতে তখন ইউরোপের অনেক দেশ ও শহর সেই নবজন্ম থেকে ছিল বঞ্চিত কিন্তু বেলজিয়ামের ফ্লেমিশ অঞ্চল ব্রুজ, গাঁ ও আঁভ্যার শহর সে সময়ে উঠেছিল রেনেসাঁ যুগের চরম শিখরে। ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রুজ, গাঁ ও আঁভ্যার শহর ছিল ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের ব্যবসা কেন্দ্র ও ইউরোপের বন্দর। ব্যবসায়ীরা শুধু ব্যবসায়ীই করেন নি তাঁরা বানিয়েছিলেন

সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ও গীর্জা। সে-সব অট্টালিকা ও গীর্জার সন্ধান পাওয়া যাবে ব্রুজ ও গাঁ শহরে। খালের ধারে ঘুরনো অট্টালিকা বহন করে চলেছে মধ্যযুগের গৌরব।

রেনেসাঁ যুগের চিত্রকলার মধ্যে ফ্লেমিশ স্কুল যত পরিচিত তত নয় অন্য চিত্রকলা। এই ফ্লেমিশ স্কুলের চিত্রকরদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন ব্রুবেন্‌স্‌ ও রুগেল, হু ড্যাস, মেম্‌লিং, ভ্যান এক ও ভ্যান ডাইক। তাদের অধিকাংশ চিত্রকলাই দেখতে পাওয়া যাবে ব্রুজ, গাঁ ও অঁভ্যারস-এর গীর্জায়। ব্রুজ ও গাঁ-র গীর্জাগুলো যেন এক একটি মিউজিয়াম। এত প্রচুর তৈলচিত্র আর কোথাও দেখা যায় না ইউরোপে। গীর্জাগুলো ছিল আর্ট চর্চার কেন্দ্র। সেকালে বড় বড় ব্যবসায়ীরা তৈলচিত্র কিনে দান করত গীর্জায়। আর গীর্জাগুলোর আকার প্রকার গথিক। পুরোনো অথচ সুন্দর। ইউরোপের মধ্যযুগের সামন্তবাদের পরিচয় পাওয়া যাবে ব্রুজ ও গাঁ-এর পথেঘাটে। আর্ট যাঁরা ভালবাসেন তাঁরা বেলজিয়ামের এই শহরগুলো দেখে তৃপ্তি পাবেন। মধ্যযুগকে বহন করে এখনও বেঁচে আছে ব্রুজ ও গাঁ শহর।

ব্রুসেল শহরে অনেকেই দেখেছেন দোকানে দোকানে ছবি বা ধাতুর ভাস্কর্য, একটি ছোট্ট ছেলে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছে। এই ছোট ছেলের মূর্তিটি মেনকেন পিস নামে খ্যাত। ব্রুসেল শহরের ঠিক মাঝখানের রাস্তায় এক কোণায় রাখা এই পাথরের মূর্তিটি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাথরের মূর্তি পাঁচ ছয় বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছে। সেখান দিয়ে জলও পড়ছে। এই মূর্তি ব্রুসেলবাসীদের অতি প্রিয়। শুধুই কি প্রিয়! রাজপ্রাসাদে রাখা আছে তার জন্যে তুশ রকমের পোশাক। মূর্তিটি ঐতিহাসিক। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন স্পেনীয়রা আক্রমণ চালায় বেলজিয়ামে তখন ব্রুসেলস-এ একদল স্পেনীয় সৈনিক ব্রুসেল্‌স্‌-এর বুকে বোমা ফাটাবার জন্যে জ্বালায় বোমার সলতে।

কিন্তু ওই সলতে যখন জ্বলতে থাকে তখন একটি বাচ্চা ছেলে ওই সলতেতে প্রস্রাব করে দেয় জ্বলন্ত সলতে নিভিয়ে। সলতে নিভে যাওয়াই ব্রুসেলস শহর বোমা ফাটার হাত থেকে রক্ষা পায়। সেই সময়েই ওই ছেলেটির কথা দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। পরে প্রায় একশ বছর পরে একটি বাচ্চা ছেলের প্রতিমূর্তি গড়ে ওইখানেই স্থাপিত করে ব্রুসেলস্ শহরের কর্তৃপক্ষগণ। সেই থেকে ওই ছেলের মূর্তিটি জনসাধারণের আদর তো পেয়েই আসছে উপরন্তু রাজপরিবারের। তাই প্রতিদিনে তাকে এক-এক দেশের এক-এক সাজে সাজান হয়ে থাকে। দেশ-বিদেশের সরকার দান করছে ওই শিশুটির জন্যে বিভিন্ন রকমের পোশাক। বেলজিয়ানদের কাছে 'মেনকেন পিস' অমর। এ এক মজার জিনিস।

'বিলেত' বলতে আমরা কী বুঝি

বিলেত বলতে আমরা বুঝি সাত সমুদ্র তের নদীর পারের দেশ, সে দেশ ইংরাজদের দেশ। তার ওপর আমরা বুঝি সে হচ্ছে লণ্ডন। লণ্ডনই খাস বিলেত। কেউ বললেন হয়ত, "ওঁর ছেলে বিলেতে পড়তে গেছে।" বিলেতে পড়তে যাওয়া মানে, সে হয়ত লণ্ডনে, অক্সফোর্ডে বা কেম্ব্রিজে। বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার, বিলেত ফেরত ডাক্তার কি ইঞ্জিনীয়ার। ওরা সবাই ওই ইংরাজের দেশ ফেরত। এমন কি যাঁরা জার্মানী কি ফ্রান্সে গিয়েছেন, কিন্তু 'বিলেতে' যান নি তাঁরা কিন্তু বিলেত ফেরত নন। বিলেত বলতে আমরা ইংরেজের দেশকেই বুঝি। বিলেত একটি দ্বীপ। মহাদেশ নয়। ইউরোপ মহাদেশ। বিলেত সেই মহাদেশের সংলগ্ন দ্বীপ। কিন্তু আমরা কি ইউরোপকে কোন মূল্য দিই ?

সম্ভবত নয়। কারণ ইউরোপ বিলেত নয়। তাই মূল ইউরোপ মহাদেশ ফেরতরা বিলেত ফেরত নন। বিলেত আমাদের কাছে যত নিকটে ইউরোপ ততটা নিকটে নয়। যদিও এটা আমাদের

দৃষ্টিভ্রম। কিন্তু তাহলেও সত্যি কথা বলার জো নেই। বিলেতের মোহ আমাদের এখনও কাটে নি। কাটে নি বিলিতি মোহ। যে সময়ে আমরা বিলিতি ইংরেজদের পদানত ছিলাম, সে সময়ে না হয় তার যুক্তি ছিল, কিন্তু এখন? যখন আমরা স্বাধীন তখনও কেন এই মোহ?

বিলেত শব্দটা এসেছে পারস্য থেকে। ফার্সিতে শব্দটা হল বিলায়েৎ। অর্থাৎ বিদেশ। আবার প্রদেশও। কিন্তু মোগল বাদশার আমলে ইংরাজদের দেশকে বলা হত বিলায়ত। অর্থাৎ বিদেশ। সেই থেকে আমাদের ভাষায় বিলেত পরিচিত ইংরাজদের দেশ হিসেবে। তাই আমাদের কাছে যাই বিদেশী তাই হল বিলিতি। বিলিতি চাল, বিলিতি খাবার, বিলিতি তেল ইত্যাদি।

পরাধীনতার যুগে একদল খয়ের খাঁ, রায়বাহাদুর, রায়-সাহেবের দল বিলেত বলতে অজ্ঞান হতেন। তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের নাম দিতেন বিলিতি নাম। ওই সম্পর্কে 'পরশুরাম' তার 'গড্ডলিকা' ও 'কজ্জলি'তে গোটা কয়েক সরস রচনা আমাদের উপহার দিয়েছেন। সে যুগে ওই গল্পগুলো ছিল সুতীব্র ও সুতীক্ষ্ণ।

কিন্তু প্রশ্ন হল এই যে, স্বাধীনতার পর সেই বিলেতের মোহ যেন আরও বেশী পরিমাণে পেয়ে বসেছে আমাদের মনে। তার প্রতিক্রিয়া খুব বেশী করে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশের দরিদ্র জনগণের মধ্যে। এই তো সেদিন দু জাহাজ বোঝাই হয়ে এসেছিল পাঞ্জাব ও অন্য প্রদেশের দরিদ্র চাষীরা বিলেতে কাজ করতে। তাদের ছিল না ন্যায্য পাসপোর্ট। তারা কিনেছিল জাল পাসপোর্ট, তাদের সমস্ত জীবনের সঞ্চয়ের বিনিময়ে। তাদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে বসেছিল যে, বিলেতে একবার উঠতে পেলে হয়। সেখানে নাকি রাস্তায় সোনা ছড়ান। কুড়িয়ে নিলেই হয়। তার ওপর কাম ও কামিনী-কাঞ্চন। অর্থাৎ বিলেতে এলেই নাকি পাওয়া যায় থলে ভর্তি টাকা, মেমসাহেব ও মদ। এই ধারণার

বশবর্তী হয়ে শুধু পাঞ্জাবের দরিদ্র চাষীরা এখানে আসে নি—এসেছে অন্য প্রদেশের, তার চেয়েও বেশী এসেছে পাকিস্তান থেকে।

মানলাম এরা না হয় অশিক্ষিত ও অজ্ঞ। কিন্তু শিক্ষিত ও বিজ্ঞরা? তাঁরাও এসেছেন এখানে এবং এখনও আসছেন ওই একই ধারণা নিয়ে। শিক্ষিতদের মধ্যে যাঁরা আসেন তাঁদের বেশীর ভাগই ধরে নেন যে, এখানে এলে জীবিকার্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা একটা বিলিতি ডিগ্রিও নেবেন। কল্পনা করা যতটা সোজা, ততটা নয় বাস্তব ক্ষেত্রে। তা বুঝেছেন কয়েক সহস্র শিক্ষিত ভারতীয়ের দল। শেষ পর্যন্ত শিক্ষিত ছাত্রের দল দেশে ফিরতে বাধ্য হয়েছেন ডিগ্রী না নিয়ে বা ভুয়ো ডিগ্রী নিয়ে। কেন এমন হয়। সেই কারণটাই তা হলে বলি।

যে কয়েক সহস্র ভারতীয় বা পাকিস্তানী অশিক্ষিত মজুর বিলেতে এসেছে তাদের ভাগ্যান্বেষণে তারা সবাই কাজ করছে এখানে নিচু শ্রেণীর মজুর হিসেবে। অশিক্ষিত মজুরদের সাপ্তাহিক আয় পাঁচ থেকে সাত পাউণ্ড। তাতে ঘর ভাড়া ও দুবেলা খাওয়া চলে মাত্র। তার বেশী কিছু নয়। বাবুগিরি করার জো নেই। কিন্তু অশিক্ষিত মজুরের দল যেভাবে বসবাস করতে পারেন ঠিক সেইভাবে বসবাস করতে পারেন না শিক্ষিত ছাত্রের দল। শিক্ষিত ছাত্রের দল যখন এখানে তাদের বি. এ. কিংবা এম. এ. ডিগ্রী নিয়ে হাজির হয় তখন কিন্তু বিলেতের কর্তৃপক্ষ তাঁদের ভারতীয় বি. এ. বা এম. এ. ডিগ্রীকে আমলই দিতে চায় না। তাঁদের বলা হয় যে, তাঁরা যেন বিলেতে আবার নতুন করে বি. এ. বা এম. এ. পড়তে শুরু করে। নইলে তাঁরা বিলেতের ম্যাট্রিক পাশ বলে গণ্য হয়। সুতরাং তাঁদের চাকরী দেবার বেলায় বি. এ. বা এম. এ. পাশ হিসেবে দেওয়া হয় না, দেওয়া হয় ম্যাট্রিক পাশওয়ালা হিসেবে। দ্বিতীয়তঃ কোনো ভাল চাকুরির কাজ খালি থাকলে সর্বপ্রথমে নেওয়া হয় বিলেতের সাহেবদের. তারপর ইউরোপের সাহেবদের। তারপর

যদি কোনো পদ খালি থাকে তাহলে সে পদ পেতে পারে যে কোনো 'ব্ল্যাকি'র কাছে। ব্ল্যাকি মানে কালো আদমি। সাদারা সাহেবের জাত। সাদা বাদে আর যত জাত আছে তারা হল ব্ল্যাকি। সে আফ্রিকারই হোক বা ভারতেরই হোক। সাদা চামড়ার বিলিতি সাহেবরা সাধারণতঃ ছোট কাজ করতে চান না। কারণ তাঁরা অনায়াসে অপেক্ষাকৃত ভাল কাজ পান। কিন্তু কারখানা বা যে-কোন অফিস-আদালতে তো শুধু ভাল চাকুরীওয়ালাদের নিয়ে চলতে পারে না। চাই সাধারণ শ্রমিকের কাজ. কাপ-প্লেট ধোয়ার কাজ। এই সব কাজের সাপ্তাহিক মজুরী কম। তাই বিলেতের কর্তৃপক্ষরা ওই সব কাজের জন্য 'ব্ল্যাকি'দের নির্ধারিত করে রাখেন। 'ব্ল্যাকি'রা বিলেতে এসেই দ্বিতায় দিনে ছোটেন চাকরীর অন্বেষণে। তাঁদের চাই অন্নের সংস্থান। সে সংস্থানের একমাত্র পথ খোলা নিম্নস্তরের মজুরের কাজ। শেষ পর্যন্ত তাঁরা ওই কাজ নিতে বাধ্য হন। নইলে অন্য পথ নেই। ওই কাজ করতে কোনো ডিগ্রীর প্রয়োজন হয় না। তাই ওই কাজে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের বাদ-বিচার নেই। বিশেষভাবে ব্ল্যাকিদের বেলায়।

মুশকিল হয়েছে শিক্ষিত ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে। যাঁরা স্কলারশীপ নিয়ে বা ধনী পিতার অর্থ-সাহায্য নিয়ে বিলেতে পড়তে আসেন তাঁদের কথা তুলছি না। এদের সংখ্যা এখন বিলেতে বেশ কম। শিক্ষিত ভারতীয় ছাত্রের দল এখানে আসেন অনেক উচ্চাশা নিয়ে অনেক কল্পনা নিয়ে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এসে তাঁরা দেখেন নিরাশার ছবি। প্রথমতঃ অর্থাভাবে তাঁদের সর্বপ্রথম 'যে কোনও চাকরি' জুটিয়ে নিতে হয়। তারপর তাঁরা রাত্রির ক্লাশে যোগদান করেন। দিনের বেলায় যাঁরা পূর্ণ ছাত্র, তাঁদের তিন বছরে যদি ডিগ্রী কোর্স শেষ হয় তো রাত্রির ছাত্রদের সেই কোর্স শেষ করতে হয় চার বছরে। দিনের বেলায় যাঁরা পড়াশোনা করেন, তাঁরা দিতে পারেন তাঁদের সমস্ত দিন ও রাত পড়াশোনার কাজে। কিন্তু

রাত্রির ছাত্রেরা? আগেই বলেছি যে, যাঁরা ব্ল্যাকি তাঁরা শিক্ষিত ছাত্রই হোক আর অশিক্ষিত মজুর হোক, তাঁদের দেওয়া হয় একই ধরণের কাজ। অতি নিম্ন ধরণের কাজ। ওই কাজ আমাদের টেবিল-বেয়ারার কাজ নয়। সে কাজ কঠোর পরিশ্রমের। সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর কোনও মানুষই পূর্ণ মনোবল নিয়ে আবার ছ সাত ঘণ্টার ক্লাস বা লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে পারে না। এ অতি সাধারণ ব্যাপার। তাই রাত্রির ছাত্রেরা প্রথম কিছুদিন অতি উৎসাহ নিয়ে হয়তো পড়াশোনা আরম্ভ করেন, কিন্তু তার কিছুকালের মধ্যে আসে তাঁদের মানসিক বিপর্যয়। অত খাটুনি সহ্য করতে পারে হাজারে তিনজন কি পাঁচজন, সবাই নয়। এবং ওই কারণে হাজার হাজার ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করতে বাধ্য হয়। একবার কি দুবার ফেল করার পর তারা হারিয়ে ফেলে মনোবল। তখন তারা পড়াশোনায় ইস্তফা দিয়ে দিনের বাকি অংশটা কাটাতে বাধ্য হয় নিছক আমোদ-প্রমোদে। সেই আমোদ-প্রমোদের সংগী হয় মজুর শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরা। অবশেষে তারা বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এই হল বিলেতে শিক্ষিত ভারতীয় ছাত্রদের দুঃখের কাহিনী।

আর-একটা ছবি হল ভারতবর্ষে বিলিতি সাহেবদের। ভারতবর্ষে বিলেতের সাহেবরা রোজগার করেন কত? তারা কি একশ' বা দুশো টাকার চাকরি করেন? সাধারণতঃ বিলিতি সাহেবরা যারা ভারতবর্ষের বিলিতি ফার্মে কাজ করেন তাঁদের অনেকেই হয় কারখানার বড় সাহেব বা অফিসের বড় সাহেব। বড় সাহেবদের রোজগার হাজার-হাজার টাকার ব্যাপার। কিন্তু ওই সব বড় বা ছোট বিলিতি সাহেবরা অধিকাংশই উচ্চশিক্ষিত নন। তাঁদের অনেকেই ম্যাট্রিকের দরজাও কোনও দিন মাড়ান নি। কিন্তু তাঁরা ভারতবর্ষে ব্ল্যাকিদের দেশে এসে হয়ে যান বড় সাহেবের দল। তাঁরা ভারতবর্ষে পদার্পণ করার পূর্বে হয়তো বিলেতের কোনও

কারখানায় কাজ করতেন টেকনিশিয়ানের কাজ বা মিস্ত্রীর কাজ। সেখানে তাঁরা বড় বা ছোট সাহেবের কাজ করেন নি। সে কাজ করতে তাঁদের নেই এই দেশের 'ডিগ্রী', অর্থাৎ ডিগ্রীহীন বিলিতি সাহেবরা ভারতবর্ষে গিয়ে হন বড় বা ছোটসাহেব। আর শিক্ষিত ডিগ্রিধারী ভারতীয়রা বিলেতে এসে হন মজুর। এইখানেই হল তফাত। এখানেই বিলেতের মোহ।

কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হল ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ডিগ্রী। ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ডিগ্রীর দাম নেই বিলেতে। কিন্তু এককালে বৃটিশ রাজত্বকালে স্থাপিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচী ও কার্যক্রম পরিচালিত হত বিলিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে। বিলেতের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ধরণের নিয়ম-কানুন ও কার্যক্রম, ঠিক অনুরূপ কার্যক্রম করা হয়েছে ভারতবর্ষে। আগে পড়িয়েছেনও বিলিতি সাহেবরা, ডিগ্রীও দিয়েছেন বিলিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের মানদণ্ডে। কিন্তু ওই ডিগ্রীধারী ছাত্রেরা যখন বিলেতে আসেন, তখন তাঁদের ডিগ্রীর বিশেষ মূল্য দেওয়া হয় না।

শুধু কি তাই। বৃটেনে এসে বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে পাওয়া ডিগ্রীধারী ভারতীয় ছাত্রেরা উপযুক্ত চাকরি পান না। কিন্তু ওই ডিগ্রী পাওয়া বৃটিশ ছাত্রদের তৎক্ষণাৎ চাকরি দেওয়া হয়। সে খবর দিতে পারেন আমাদের লণ্ডনের ভারতীয় হাই-কমিশনারের অফিস। এই সেদিন ভারতীয় হাইকমিশনারের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারি দুঃখ করে বলছিলেন যে, আমাদের দেশের ছাত্রেরা বৃটেনের উচ্চ ডিগ্রী পেয়েও এখানে ভাল চাকরি পায় না, এবং তাদের দেওয়াও হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষে আবার আমরাই সাহেব বলতে অজ্ঞান। তাঁরা আমাদের কাছে দেবতা বিশেষ।

এবার লণ্ডনে ভারতীয় সমাজের কথাই বলা যাক। ভারতীয়দের সংখ্যাও যেমন বেশী, তেমনি তাদের দল। তবে এদের মধ্যে ইণ্ডিয়া

লীগ, ইণ্ডিয়া ক্লাব, লণ্ডন মজলিস ও বেঙ্গলী ইনস্টিট্যুট অন্যতম। বেঙ্গলি ইনস্টিট্যুটে এবার থেকে নতুন উদ্যমে কাজ চলছে দেখলাম। বাংলা-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা-চক্র খুলেছে। তাদের কয়েকটা বৈঠকেও উপস্থিত ছিলাম। বাঙালীদের দলে বা সমাজে আড্ডা মেরে এই মনে হয় যে, আমি যেন ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেই আছি। বিলেতে নয়। এখন প্রবাসী বাঙালীর জয়-জয়কার। সংখ্যায়ও এঁরা গরিষ্ঠ। তাই এঁদের লেগে আছে বার মাসে তের পার্বণ। তেমনি রয়েছে এঁদের মধ্যে দলাদলি। যা বাঙালী সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গ।

পারিসিয়ানের চোখে লণ্ডন

আমি পারির অধিবাসী তো নই, লণ্ডনেরও না। আমি খাস কলকাতার কিন্তু পারিসিয়ানদের কাছে তারাই পারিসিয়ান যারাই কিছুকাল বাস করেছেন পারি নগরীতে। লণ্ডনের বেলায়ও তাই। এই হিসেবে আমি পারিসিয়ান।

প্রথমেই বলতে হয় পারিসিয়ান কারা। অর্থাৎ বেশ কয়েক বছর ধরে যিনি পারিতে বাস করছেন, তিনি পারিসিয়ান। ফ্রান্সের অধিবাসী যে কোন ফরাসীই পারিসিয়ান হতে পারেন না. যিনি ফরাসী নন কিন্তু বিদেশী হয়েও পারির অধিবাসী, তিনিই পারিসিয়ান। তার ওপরে যিনি পারী নগরীতেই জন্মেছেন তিনি তো পুরো পারিসিয়ান। ওই কারণেই ফরাসীতে আর পারিসিয়ানের অনেক তফাত। পারিসিয়ানদের দেখেছি পারিসিয়ান বলে পরিচয় দেয় উচ্ছ্বাসভরে। তারা যেন ওতেই তৃপ্ত।

ঠিক একই কারণে লণ্ডনিয়ান হয়েছেন লণ্ডনের অধিবাসীরা। তা তিনি ইংরেজই হোন বা ভারতীয়। তাতে কিছু যায় আসে না। কত ভারতীয় সারা জীবন কাটাচ্ছেন এই লণ্ডন শহরে। তাঁদের

পরিচয়ও ওই লণ্ডনিয়ান বলে। বলা বাহুল্য, এই দুই মহানগরীর অধিবাসীরা জেলার বা ছোট শহরের অধিবাসীদের যেন একটু আড় চোখে দেখেন। যেন তাঁরা এক-একজন কেউকেটা।

লণ্ডন সম্বন্ধে যে কোন পারিসিয়ানের চোখে যা আঘাত দেবে তা হল লণ্ডন শহরের সৌন্দর্য। এক কথায় পারীর তুলনায় লণ্ডন যেন বিধবা বিধবা। তার নেই সৌন্দর্য, নেই কারুকার্য, নেই অলঙ্কার। অট্টালিকা নিয়েই নগরী। সেই অট্টালিকাগুলো লণ্ডনে যেন লেপাপোছা তার গায়ে নেই কোন কারুকার্য। নেই স্থাপত্যের চিহ্ন। পারীর দালান কোঠার অঙ্গে জড়িত রয়েছে কারুকার্য। এক কথায় যাকে বলা যায় আর্ট।

দ্বিতীয়তঃ পথঘাট, বাগ-বাগিচা। লণ্ডনের পথঘাট সব সরু সরু। পারীর পথ-ঘাট চওড়া। সাঁজে লিজের মতন বিরাট রাস্তার কথা ছেড়ে দিলেও সেখানে রয়েছে অসংখ্য চওড়া রাস্তা। তার ওপর যা আরও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে তা হল রাস্তার ধারে সার সার গাছপালা। লণ্ডনের রাস্তার ধারে সবুজের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

বাগ-বাগিচার কথা উঠলে অবশ্য লণ্ডনিয়ানরা বলবেন তাঁদের হাইড পার্ক বা গ্রীন পার্কের কথা। কিন্তু পারী নগরীতে দু দুটো এমনই বিরাট বাগান রয়েছে যার নাম হচ্ছে বুয়া দ্য বুলইন আর বুয়া দ্য ভ্যানসেন। অর্থাৎ বাগান দুটো এতোই বড যে তাকে আর বাগান বলা চলে না। তাই তাকে বলা হয় বন। কিন্তু শহরের মাঝে রয়েছে অসংখ্য ছোট-বড় বাগান। আর সেই বাগানে রয়েছে স্থপতির হাতে ছোঁয়া শিল্পের নিদর্শন। এদিক দিয়ে লণ্ডন সত্যি দরিদ্র।

কিন্তু লণ্ডনের যা বৈশিষ্ট্য তা হল ডিসিপ্লিন। এত সরু রাস্তায় অসংখ্য গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় নেই, নেই কোন বিকট শব্দ। নেই ভিড়ের চাপ। সবাই মেনে চলেছে নিয়মানুবর্তিতা। এই বিরাট শহরটাকে চালাচ্ছে বিরাট বিরাট যন্ত্রদানবেরা। যেই রাস্তার লাল বাতি

জললে অমনি থেমে গেল গাড়ি-ঘোড়া। পথ অতিক্রম করলে পথচারি। কিন্তু প্যারিসে অনেক সময়ই দেখা যায় তার নিয়ম লঙ্ঘন।

মাটির তলায় সুড়ঙ্গ পথে দুই নগরীতে চলছে যন্ত্রদানব। লণ্ডনে যেন যন্ত্রদানবের দাপট বড্ড বেশী। প্যারীতে তার দাপট একটু কম। এদিক দিয়ে ওরা পিছিয়ে আছে। লণ্ডনের দোকান পাট, স্টেশন, পোস্ট-অফিস সর্বত্রই যন্ত্রের যত প্রয়োগ তত নেই প্যারীতে।

তবে একটা জিনিস যা আড্ডাবাজ বাঙালীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য করবে তা হল লণ্ডনের চায়ের দোকান। লণ্ডনের চা কফির দোকান সন্ধ্যে বেলায় অনেক বন্ধ হয়ে যায়। তার ওপর স্ন্যাক্‌বার গোছের দোকানে সবাই ঢুকে গিলত। গিলেই দু মিনিটের মধ্যে যে-যার গন্তব্য স্থানে। স্ন্যাক্‌বারে আড্ডা মারার জো নেই, সবাই যেন ছুটছে। কিন্তু প্যারীতে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেন কলকাতার নীলকণ্ঠ কেবিন বা গৌরহরির কাফে।

এক পেয়ালা কফি নিয়ে আপনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মেরে যেতে পারেন। কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না। লণ্ডনে সেটি হবার জো নেই। প্যারিসিয়ানরা কলকাতাওয়ালাদের মতনই আড্ডাবাজ। তাই প্যারীর কাফে-বার খোলা থাকে রাত বারটা পর্যন্ত। সেখানে লণ্ডনে সন্ধ্যে পর্যন্ত। কে যেন বলেছিল যে আড্ডা মারাটাও একটা আর্ট। আড্ডা মারতে জানাও আর্ট। সে আর্ট জানে বাঙালীরা আর ফরাসীরা। ইংরেজরা নয়।

লণ্ডনে আমার এক বন্ধু বলছিলেন যে, তিনি পাঁচ সাত বছর আগে প্যারীতে দেখেছিলেন ঐ সময়ে প্যারীর সুন্দরীরা মুখে চোখে নানা রঙ মেখে সৌন্দর্য সৃষ্টি করত। সেই ফ্যাসন তিনি এখন লণ্ডনে দেখছেন লণ্ডন সুন্দরীদের প্রসাধনে। বলা বাহুল্য গত কয়েক বছরে প্যারীর সুন্দরীরা আর রঙচঙ মাখছেন না। তাঁরা বলছেন যে, কৃত্রিমতার প্রশ্রয় না নিয়ে স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলাই নাকি

আর্ট। তাই ইদানীং প্যারীতে স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফোটানই রেওয়াজ হয়েছে। কিন্তু লণ্ডনে দেখছি লণ্ডনের সুন্দরীরা মুখে-চোখে রঙচঙ মেখে সঙ সেজেছেন। সাজগোজের ব্যাপারে লণ্ডনের মেয়েরা পারিসিয়ানদের কাছে এখনও গেঁয়ো। পারিসিয়ানরা যা পাঁচ বছর আগে করেছেন তার অনুসরণ করছে এখন লণ্ডনিয়ানরা।

পোশাকের বেলাও তাই। পোশাক ছাড়া প্যারীর বা রোমের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও কাফে জীবন শুরু হয়েছে সবে মাত্র লণ্ডনে। তাই লণ্ডনে দেখা দিয়েছে প্যারী বা রোমের মতন অনুসরণ করে কাফে, তার পরিবেশ ও সঙ্গীত। বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী লণ্ডন, যার দাপটে এক কালে সারা মেদিনী কম্পিত হত সেই লণ্ডন কিনা এখন প্যারী ও রোমের নকল করছে। এ ভাবতেও গায়ে রোমাঞ্চ জাগে।

এত সত্ত্বেও যাঁরা লণ্ডনে বাস করে লণ্ডনিয়ান বনেছেন তাঁরা লণ্ডন বলতে পঞ্চমুখ। এঁদের মধ্যে অনেক ভারতীয় বছরের পর বছর লণ্ডনে থেকে লণ্ডনিয়ানদের মতন যন্ত্রচালিত হয়ে পড়েছে। এরা যন্ত্রদানবদের চালায়, না যন্ত্রদানব এদের চালায় তা বোঝা কঠিন। এটা যন্ত্রের যুগ তাই বোধ হয় লণ্ডনে যন্ত্রদানবের এত দাপট।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের পথে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন ২রা জুন ১৯৬৩ সাল, কয়েক ঘণ্টার জন্যে প্যারিস বিমান বন্দরে থেমেছিলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনি উপস্থিত ভারতীয়দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হবে এমন ভাবনা মনে উদয় হয় নি। তাই লণ্ডন যাবার তারবার্তা পেয়ে একটু চমকে গিয়েছিলাম। লণ্ডনে পৌঁছে দেখি বৃটিশ রাজনৈতিক আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। যুদ্ধমন্ত্রী মিঃ প্রফুমো ও তাঁর বান্ধবী মিস্ ক্রিশ্‌টিন্ কিলারকে নিয়ে ম্যাকমিলানের আসর বেশ জমে উঠেছে।

মার্কিন সফর শেষ করে আমাদের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন লণ্ডন এসে পৌঁছন ১০ই জুন সকালে। ১২ই ও ১৩ই জুন লণ্ডনে রাজকীয় অতিথি হিসেবে তাঁকে বিভিন্ন রাষ্ট্র দপ্তর ও পরিষৎ থেকে সংবর্ধনা জানান হয়। ১৩ই জুন রাত সাড়ে এগারটায় লণ্ডনের ইউস্টন স্টেশনে ট্রেন ছাড়ে, পরের দিন সকালে পৌঁছয় এডিনবরা। ট্রেনটা ছিল রাজকীয় ট্রেন। বসবার, শোবার ব্যবস্থা রাজকীয়। সকালে এডিনবরার হলিরুড হাউস প্রাসাদের আঙিনায় স্কট সেনা-বাহিনীর কুচকাওয়াজ ও রাষ্ট্রপতিকে সেলাম জানিয়ে 'জন গণ-মন-অধিনায়ক' সঙ্গীত স্কট-বাহিনীর বাদ্যযন্ত্রে হলিরুড প্রাসাদের আকাশ-বাতাস মুখর করে তুলেছিল। স্কট-সৈনিকদের ঘাগরার মতন পোশাক 'কিল্ট' ও তাদের মার্চ করার ভঙ্গী দেখবার মতন। হলিরুড হাউসের স্কট-সেনাবাহিনীর সেলাম গ্রহণ করে রাষ্ট্রপতি চললেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দিল ডক্টর অব ল্য উপাধি।

সেদিন দুপুরে বৃটিশ কাউন্সিলে ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করে রাষ্ট্রপতি সন্ধ্যেবেলা যান এডিনবরা কাসল-এ প্রীতি-ভোজে।

সাধ্য-সম্মেলনের আয়োজন করে মন্ত্রী সেক্রেটারী অব স্টেট ফর স্কটল্যাণ্ড। পরের দিন সকালে আমাদের যাত্রা সুরু হল পার্থশায়ারের ভেতর দিয়ে। এডিনবরার কাছে ক্লাইড নদীর ওপর বিরাটকায় সাঁকো নির্মিত হচ্ছে। তাই দেখলাম। তারপর স্কটল্যাণ্ডের উপত্যকা ভেদ করে চললাম পিটলখরি ড্যাম, ক্লুনি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র দেখতে। সেখান থেকে ফিরে ফেরি বোটযোগে নদী পার হয়ে আবার এডিনবরায়। রবিবার সকালে রাষ্ট্রপতি গেলেন বিমানযোগে চ্যাটসওয়ার্থে। সেখানে তিনি ডিউক অব ডিভনশায়ারের অতিথি। সেদিন তিনি পুরো বিশ্রাম নেন। আর আমরা সাংবাদিকের দল চললাম এডিনবরা ছেড়ে গ্লাসগো ছাড়িয়ে আরও উত্তর দিকে গুরকে। গুরকে পৌঁছে আমরা ছোট স্টীমার 'কাউন্টেস অব ব্রেড আলবেন' চড়ে ক্লাইড নদী পাড়ি দিলাম। স্কটল্যাণ্ডে হ্রদগুলো যেমন বড় তেমনি নদীগুলো। চারধারে পাহাড় তার সঙ্গে হ্রদ বা নদী। প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যি মনোরম। এখানে এখন টুরিস্টে ছেয়ে গেছে। সারাদিন ক্লাইড নদীর চার ধার ঘুরে বিকেলে এসে পৌঁছলাম বিখ্যাত হোলি লখ্ এ। হোলি লখ্-এ দেখলাম মার্কিনদের নিউক্লিয়ার সাবমেরিন দাঁড়িয়ে। ওই সাবমেরিন থেকে 'পোলারিস' রকেট ছোঁড়া হয়। বিকেলে গুরক ছেড়ে গ্লাসগো পৌঁছলাম। গ্লাসগোয় কাজ সেরে আবার রাতে রাজকীয় ট্রেনে চাপলাম। রাজকীয় ট্রেনে চড়ে পরের দিন সকালে এসে পৌঁছলাম ম্যাঞ্চেস্টারের কাছে জডরেল ব্যাঙ্ক-এ। জডরেল ব্যাঙ্কের রেডিও টেলিস্কোপ বিশ্ববিখ্যাত। ইউরোপের মধ্যে এদের রেডিও টেলিস্কোপ সবচেয়ে বড়। জডরেল ব্যাঙ্কের রেডিও টেলিস্কোপ তখন ভীষণ ব্যস্ত। মহাকাশে তখন বিচরণ করছে রুশ মহাকাশচারী শ্রীমতী ভ্যালেন্টিনা ও শ্রীবিকোভ্স্কি। তাদের কণ্ঠস্বর গ্রহণ করছে রেডিও টেলিস্কোপ। আমরা শুনলাম তাদের কণ্ঠস্বর। জডরেল ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর স্যর্ বার্নার্ড লভেল্

আমাদের ঘুরিয়ে দেখালেন। রাষ্ট্রপতি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন মহাকাশচারীদের খবরাদি। দুপুরে ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের অনেক উপদেশ দিলেন রাষ্ট্রপতি। বিকেলে ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে সন্ধ্যেবেলা গেলেন ম্যাঞ্চেস্টার পৌরসভার সংবর্ধনায়। ম্যাঞ্চেস্টার পৌরসভার বিরাট হলঘরে সান্ধ্যভোজনে দেখলাম ম্যাঞ্চেস্টারের গণ্যমান্যরা সবাই উপস্থিত। খাওয়া শেষ হতে-না-হতেই বক্তৃতা শুরু হল। ম্যাঞ্চেস্টার পৌরপিতা রাষ্ট্রপতিকে সম্বর্ধনা জানিয়ে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। তার উত্তরে ডক্টর রাধাকৃষ্ণন যে বক্তৃতা দেন সেটি ছিল ভারতীয় দর্শনের ব্যাখ্যা। ফলে হলঘর ছিল নিস্তব্ধ। দেখেছি সবাই নিবিষ্ট মনে তাঁর বক্তৃতা শ্রবণ করেছে। সান্ধ্যভোজ যখন শেষ হল তখন অনেক অল্ডারম্যান, কাউন্সিলর ও রাজনৈতিক নেতাদের মুখে শুনেছি যে, রাধাকৃষ্ণনের বক্তৃতা সত্যিকারের দর্শনের ব্যাখ্যা হয়েছে। সবাই সে-ব্যাখ্যা শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করেছে। সেদিন রাতে চললাম রাজকীয় ট্রেনযোগে বার্কলে অভিমুখে। পরের দিন সকালে বার্কলে পৌঁছে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে চললাম বার্কলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশন দেখতে। আণবিক শক্তি প্রয়োগে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা ইউরোপে এই প্রথম; তাই এটির গুরুত্ব এত বেশী। কারখানাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। মাত্র দু'শোজন কর্মচারী কাজ করে। এদের মধ্যে পঁয়ত্রিশজন হল বিজ্ঞানী আর বাদবাকি টেকনিশিয়ান। বার্কলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশন কাজ করছে গত এক বছর ধরে। এ বছরের জুন মাসে তার সত্যিকারের কাজ আরম্ভ হয়েছে। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন স্টেশন ডিরেক্টরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কোনও ভারতীয় বৈজ্ঞানিক কাজ করে কি না। উত্তরে ডিরেক্টর জানান যে, ফরাসী, জার্মান, নরওয়েজিয়ান, বেলজিয়ান বৈজ্ঞানিক এখানে শিক্ষা গ্রহণ করছে কিন্তু কোনও ভারতীয় আজ পর্যন্ত

এখানে আসে নি। এমন কি ভারতের অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর হোমিও ভাবাও না।

বার্কলের কাজ সেরে আমরা পৌঁছলাম অক্সফোর্ডে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অলসোলস্' কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন রাষ্ট্রপতি। তাই তাঁর সম্মানার্থে অলসোলস্ কলেজ আয়োজন করে সম্বর্ধনার. অলসোলস্ কলেজের লাইব্রেরী হলে প্রদর্শিত হয় ভারতের জন্যে বিশেষ করে ছাপান সস্তা দরের পাঠ্যপুস্তক। বিশ-ত্রিশ বছরের পুরোনো ইংরেজী টেক্সট বই ছাপান হয়েছে ভারতের ছাত্রদের জন্যে। সে-সব বই বৃটেনে আজকাল খুব জনপ্রিয় নয়। বিকেলবেলা অলসোলস্-এর আঙ্গিনায় জড় হন ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের সহকর্মী ও বর্তমান অধ্যাপকেরা। এঁদের মধ্যে গোটা তিন চার ভারতীয় লেকচারার দেখলাম। এঁদের মধ্যে একজনও বাঙালী নয়। এককালে বাঙালীরা অক্সফোর্ড-কেমব্রীজ নিয়ে গর্ব করত। এখন তার গর্ব করার কিছু নেই সে-রাত অক্সফোর্ডে কাটিয়ে আমরা তার পরের দিন পৌঁছলাম কল-কারখানার শহর কভেন্ট্রিতে। কভেন্ট্রির বোমাবিধ্বস্ত গীর্জার জায়গায় গড়ে তুলেছে নতুন অত্যাধুনিক গীর্জা এটি দেখবার মতন। গীর্জা পরিদর্শন করে রাষ্ট্রপতি যান কভেন্ট্রি পৌরসভার মধ্যাহ্নভোজনে। কভেন্ট্রি শহরে লেবার পার্টির আধিপত্য। তাদের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে বৃদ্ধদের আবাস। সেখানে পরিদর্শন করে রাষ্ট্রপতি চললেন মহাকবি সেক্সপিয়রের জন্মস্থান স্ট্রাটফোর্ড অন অ্যাভন শহরে। শহরটা সত্যি মনোরম। ছবির মত দেখতে। এই শহরে অবস্থিত রয়াল সেক্সপিয়র থিয়েটার। ওখানে এখনও বিরাজ করছে সেক্সপিয়রের বাড়ি। রয়েল সেক্সপিয়র থিয়েটার এখন পরিচালনা করছে দুই তরুণ নাট্যকার, পিটার হল ও পিটার ব্রুক। এদের পরিচালনায় অভিনীত হয় জুলিয়াস সিজার।

যতদিন রাষ্ট্রপতি বৃটেনে ছিলেন ততদিন কিন্তু বৃটিশ

জনসাধারণের কাছ থেকে তেমন কোনো ভিড়-ভাঙা কৌতূহলী জনতা দেখি নি। বৃটিশ সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় রাষ্ট্রপতির ছবি বা সংবাদ ছাপা হয় নি। হয়েছে তৃতীয় বা চতুর্থ পৃষ্ঠায় ছোট্ট করে। এ সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির দলের এক হোমরা-চোমরা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন যে, ইংরেজরা কাউকে পরোয়া করে না। তাই ভারতের রাষ্ট্রপতির প্রতি তার পার্থক্য নেই। এ সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কয়েকজন বন্ধুবান্ধব। উত্তরে বলেছিলাম যে, ভারতে রাণী এলিজাবেথ এসে যে সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন তার তুলনায় আমাদের রাষ্ট্রপতি বৃটেনে পেয়েছেন নগণ্য আতিথেয়তায় ভারতবর্ষ এখনও সব দেশের আগে যায়। বৃটেনের চেয়ে তো বটেই।

উন্নয়নের পথে দক্ষিণ ওয়েলস্

বৃটেনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অনেককালের। ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলস্‌কে নিয়ে যুক্তরাজ্য ইউনাইটেড কিংডাম। এই তিন দেশের ভৌগোলিক পরিচয় এক নয়। এই তিন জাতের মধ্যে অর্থাৎ ইংরেজ, স্কট ও ওয়েলস্-এর মধ্যে ফারাক অনেক। প্রথমতঃ তিন জাতের চরিত্র ও ভাষায় তফাত অনেকখানি। স্কট ও ওয়েলস্‌রা স্বভাবে ইংরেজবিদ্বেষী। ইংরেজরা এই দুই জাতকে সর্বদা দাবিয়ে রাখতে চায় বলে রাজনীতিতে যেমন ইংরেজরা এদের ওপর খবরদারি করে তেমনি অর্থনীতিতে। ওয়েলস্ এ ভ্রমণ করে বুঝলাম ইংলণ্ডের সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়। কৃষিতে ওয়েলস্ ও ইংলণ্ড বেশ দরিদ্র। কিন্তু ইংলণ্ড শিল্প-বাণিজ্যে ফেঁপে উঠেছে। ওয়েলস্ ইংলণ্ডের তুলনায় বেশ পিছিয়ে। অর্থাৎ বৃটিশ অর্থ-নীতিতে ওয়েলস্ এখনও 'অনুন্নত' প্রদেশ। কৃষিপ্রধান

ওয়েলস্ এখন শিল্পোন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। তারই দৃশ্য দেখে এলাম।

যেদিন রাত্রে লণ্ডন থেকে কার্ডিফে এসে পৌঁছলাম ট্রেনযোগে, তার কিছু পরেই আমার এক ওয়েলস্ বন্ধু সঙ্গে নিয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ার এক কাফেতে। সেখানে আলাপ এক ছোকরার সঙ্গে। কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। মাস-দুয়েক আগে গিয়েছিল ভারতে। তখন লড়াই চলছে। আরও কিছু ওয়েলস্ বন্ধু জুটল। তারা বলে, বিদেশীরা লণ্ডন থেকে অক্সফোর্ড কেম্‌ব্রিজ দেখে চলে যায়, আমাদের এই সুন্দর ওয়েলস্ দেখতে কেউ আসে না। তাদের অনুরোধে কার্ডিফের জাহাজঘাটা লাগাও মাঝি মাল্লাদের ক্যাবারেতে যেতে হল। যে-কোনো দেশের জাহাজঘাটা একই রকমের নানান রকমের খেলা দেখার পর এক তরুণীর শারীরিক কসরত দেখার সময় এক ওয়েলস্ তরুণ মন্তব্য করে বসল, ও মেয়েটা নিশ্চয়ই ইংরেজ। নইলে এত কুৎসিত হবে কেন ‘ওয়েলস্ মেয়েরা সুন্দরী মন্তব্য করল বাকি ওয়েলস্ বন্ধুরা। ইংরেজ ও ওয়েলসদের মধ্যে সম্পর্কটা এর থেকেই বোঝা যাবে।

মধ্য ওয়েলস্ এ গিয়েছিলাম ক্ষেত খামার দেখতে। ওয়েলসের দুই-তৃতীয়াংশ এখনও কৃষি অঞ্চল। পাহাড়ে জমিতে চড়ে বেড়ায় গোরু বাছুর আর মেষপাল। এর থেকেই এইসব অঞ্চলের আয়। বাকি জমিতে হয় চাষাবাদ। ব্রেকান থেকে আরও উত্তরে সেন্‌ব্রীজের কাছে আবারব্রান ফাক্ গ্রামে এক খামার বাড়িতে আলাপ হল মিঃ গইন্ জোন্স-এর সঙ্গে। মিঃ গইন্ জোন্স এবং তার স্ত্রী দুজনে মিলে সব কাজ করে থাকে। গোরু বাছুর পালা আর মেষ পালনই তাদের কাজ। তাদের বাড়িটা আটচালা নয়। কোঠা বাড়ি। শহরের সব সাজসরঞ্জাম আছে তাদের খামার বাড়িতে। মিঃ জোন্স বলছিলেন যে, তিনি এক জমিদারের কাছ থেকে ১২৬

একর জমি ভাড়া নিয়েছেন। বছরে একর প্রতি তিন পাউণ্ড অর্থাৎ সাড়ে তিন শত পাউণ্ড ভাড়া দিয়ে থাকেন। এই অঞ্চলে চাষবাস বেশী হয় না। জমির উর্বরা কম। তাই এই সব জমিতে চাষবাসের বা পশু পালনের উৎসাহদানের জন্য সরকার অনেক সুবিধে দিয়ে থাকে যেমন ধরুন মেষ পালনে আঠারো পাউণ্ড আর যন্ত্রপাতি কেনার জন্যে ২৫ পাউণ্ড দিয়ে থাকে সরকার। তার ওপর ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া যায় ঋণ। এই অঞ্চলে গমটম কম হয়। আলুর চাষ হয় তবে সব খামার বাড়িতেই শাকসজীর চাষ হচ্ছে দেখে এলাম। মিঃ জোন্স এর খামারে রয়েছে দুশো মেষ। মেষের লোম বিক্রী ছাড়াও মাংস বিক্রী করে থাকে। মেষগুলোর হাটে বেচার দৃশ্য দেখলাম। হাটে অকশনে বিক্রী হয় এইসব মেষ। দর হেঁকে চলেছে হাঁকদার। আর ক্রেতা বিক্রেতা দাঁড়িয়ে দর শুনছে। একদিন গিয়েছিলাম ব্রাক্সএণ্ডে। সেখানকার ছোট শহরের এক হোটেলে দুপুরবেলা বসেছিল 'সিরিয়াল একাডেমি'র বৈঠক অর্থাৎ কৃষকদের বৈঠক। কৃষকদের বৈঠকে দেখলাম সরকারী কর্মচারী আর কৃষি-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ কৃষি উৎপাদন সম্বন্ধে কৃষকদের বক্তব্য শুনছে। চাষাবাদে ও পশুপালনে যত রকমের সমস্যা কৃষকরা ভোগে তার সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। প্রতিটি কৃষক তাদের বক্তব্য ও সমাধানের কথা আলোচনা করছিল। এই ধরণের আলোচনার ফলে কৃষকরা তাদের সমস্যার হাত থেকে যেমন মুক্ত হয় তেমনি কৃষি উন্নয়নও হতে বাধ্য। ইউরোপীয়দের পক্ষে যা সম্ভব আমাদের পক্ষে কি তা সম্ভব নয়। আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে এমন তাজ্জব ব্যাপার বোধ হয় নেতাদের কাছে চিন্তা করাও অকল্পনীয়। খাদ্যোৎপাদনের পথে অন্তরায় আমাদের দেশে অনেক। কিন্তু খাদ্যোৎপাদনের পথে যে সব প্রতিবন্ধক রয়েছে সেগুলো দূর করার সিদ্ধান্ত আমাদের ভাবতে হবে। ইউরোপীয় কৃষকদের কর্মপদ্ধতি আমাদের অগ্রগতির পথে সহায় হবে বলেই মনে করি।

কৃষিপ্রধান ওয়েলস্ প্রদেশের আর্থিক উন্নতি কল্পে বৃটিশ সরকার শিল্পোন্নয়নের দিকে দৃষ্টিপাত করে প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ওয়েলস্ ছিল দরিদ্র। একদিকে জনসাধারণ কাজ করত জমিতে, আরেক ধারে তারা কাজ করত কয়লাখনিতে। এদের শ্রম যোগাত ইংলণ্ডের কল-কারখানার ধন বৃদ্ধিতে। তাই এই অঞ্চলে লেবার পার্টির আধিপত্য। বেভান-এর মত বামপন্থী নেতার আবির্ভাব ওই সব কারণেই। ১৯৩০ সাল থেকে বৃটিশ সরকার দক্ষিণ ওয়েলস্ এ শিল্পোন্নয়নের দিকে বিশেষ জোর দিতে থাকে। ওই সময়ে অনেক কয়লাখনি বন্ধ হতে থাকে। বেকার সংখ্যা বাড়তে থাকে। প্রথম দিকে ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তারা তেমন নজর দেয় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ায় অর্থাৎ ১৯৩৬-৩৭ সালে সরকার নিজের গরজে কার্ডিফের কাছে কয়লা খনির লাগাও জমি কিনে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্রোজেক্ট গড়তে সুরু করে। বোর্ড অব ট্রেড নতুন সংস্থা সৃষ্টি করে বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে লোভ দেখান যে, এই সব অঞ্চলে কারখানা স্থাপন করলে প্রথমতঃ জমির দাম দিতে হবে না, দ্বিতীয়তঃ কারখানা নির্মাণের শতকরা ২৫ ভাগ দেবে সরকার, তার ওপর যন্ত্রপাতি বসানর খরচের শতকরা ১০ টাকাও সরকার দেবে। এ নিয়ম বা লোভ এখনও দেখান হচ্ছে। তাই ওই সময় হতে ছোটখাট কারখানা সমরাস্ত্রের কারখানা স্থাপন সুরু হয়েছে। তার ওপর প্রথম পাঁচ বছর সরকার আয়করের ওপর তেমন বেশী চাপ দেয় না। বরং বলা চলে, সরকার কর নীতিতে বেশ উদার।

১৯৩০-৩৮ সালের মধ্যে হাজার হাজার ইহুদি উদ্বাস্তু আসতে থাকে জার্মানী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও পোল্যাণ্ড থেকে। তাদের মধ্যে অনেকে ছিল বিত্তবান, অনেকে ছিল ইঞ্জিনীয়ার, বৈজ্ঞানিক ও কারিগর। বৃটিশ-সরকার এদের সমস্ত সুযোগ দিয়ে এনে বসায় দক্ষিণ ওয়েলস্-এর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্রোজেক্ট অঞ্চলে। তারা প্রথমে

নানান রকমের কারখানা বসাতে সুরু করে। তারপর যুদ্ধ লাগতেই সমরাস্ত্রের কারখানা বসায় সরকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ট্রি ফরেস্ট অঞ্চলে একটিও কারখানা ছিল না। যুদ্ধের সময় ছিল আড়াই হাজার শ্রমিক আর এখন সেখানে বার হাজার। আর দক্ষিণ ওয়েলস্-এর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্রজেক্টে বোর্ড অব ট্রেডের অধীনে যে-সব নতুন কারখানা বসেছে, সেখানে আজ কাজ করছে সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক। যেখানে ছিল বেকার সমস্যা, সেখানে এখন লোকের অভাব। সবশুদ্ধ কারখানার সংখ্যা দুশো। ছোট-খাট যন্ত্রপাতি—যেমন টাইপরাইটার, টেলিপ্রিণ্টার, ইলেকট্রনিক, মাপার যন্ত্র, পোশাক ও জুতোর কারখানা বেশী। তারপর রয়েছে কয়লা থেকে গ্যাস ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য তৈরীর কারখানা।

ওয়েলস্ প্রদেশকে শিল্পোন্নয়নের পথে এগিয়ে দেবার জন্যে শুধু সরকারই সচেষ্ট নয়, ওখানকার পৌরসভাগুলোও। কার্ডিফ থেকে ত্রিশ মাইল দূরে কাফিলি নামে ছোট শহরের পৌরসভা তাজ্জব ব্যাপার ঘটিয়েছে। কাফিলি আর্বান ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের পৌর-পিতারা প্রায় সবাই লেবার পার্টির সদস্য। এদের সেক্রেটারী মিঃ বাণ্ডেল-এর সঙ্গে আলাপ হল। এই অঞ্চলে বেকার সংখ্যা বেড়ে চলেছিল। কোনো কল-কারখানা ছিল না। কয়লাখনিও বন্ধ। তাই এরা বোর্ড অব ট্রেডের সঙ্গে পরামর্শ করে পৌরসভার বিভিন্ন শিল্পপতিদের লোভ দেখিয়ে এনে এখানে কারখানা স্থাপন করে। এরা জমি দেয় বিনামূল্যে। তার ওপর কারখানা বসালে লাগবে না প্রথম পাঁচ বছর জমির খাজনা। বোর্ড অব ট্রেড দেবে শতকরা ৩৫ ভাগ, ব্যাঙ্ক ও পৌরসভাও দেয় ঋণ। রেলের পুরোনো কারখানা কিনে নিয়ে পৌরসভা নিজেরাই নতুন কারখানা চালাতে সুরু করে। পৌরসভা সরকারের কাছ থেকে অর্থ-সাহায্য নিয়ে রাস্তাঘাট, জল ও বিদ্যুৎ দেওয়ার সব রকমের ব্যবস্থা করেছে। তার ওপর তারা বাড়ি-ঘর নির্মাণ করে বাসস্থানের অভাবও মিটিয়েছে।

ফলে শ্রমিকরা তিন ঘরের একটি ফ্ল্যাট ভাড়া দেয় সপ্তাহে ষাট টাকা। শ্রমিকের রোজগার সপ্তাহে দুশো থেকে আড়াইশো টাকা। পৌরসভার লোভে পরে অনেক শিল্পপতি ছোট-খাট কারখানা স্থাপন করেছে কাফিলি গ্রামে। যেখানে একটিও কারখানা ছিল না, সেখানে এখন গড়ে উঠেছে কুড়িটি কারখানা আর আড়াই হাজার শ্রমিক পেয়েছে কাজ। পৌরসভার সভাপতি আমায় বলেছিলেন যে, তিনি কখনো ভাবতেও পারেন নি যে, পৌরসভা চালাতে এসে তাঁকে ব্যবসায়ে নামতে হবে। পৌরসভার এই ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ হবে বলে তাঁদের আয় যেমন বেড়েছে তেমনি তাঁদের দায়িত্ব। এখন ওয়েলস্-এর অনেক পৌরসভা তাঁদের পদাঙ্কানুসরণ করতে সুরু করেছে

বৃটেনের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে ওয়েলস্ ছিল অপেক্ষাকৃত দরিদ্র। তাই গত একশ বছর ধরে ওয়েলস্ থেকে লাখ লাখ লোক গেছে অষ্ট্রেলিয়ায় ভাগ্যান্বেষণে। অষ্ট্রেলিয়ার মোট লোকসংখ্যার অর্ধেক হল ওয়েলস্ আগত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে সেখানে যেত ওয়েলস্বাসীরা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ওয়েলস্-এর শিল্পোন্নয়নে লোকের ভাগ্য ফিরতে সুরু করেছে। আর্থিক অবস্থা ভাল হলে কে আর বিদেশে যেতে চায়। গত পাঁচ বছর যাবৎ ওয়েলস্ থেকে অতি অল্প সংখ্যক গেছে অষ্ট্রেলিয়ায়।

'ব্রান্তোম' একটি ফরাসী গ্রাম

একালের ধনবিজ্ঞান চর্চায় জগৎটাকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। উন্নত ও অনুন্নত রাষ্ট্র হিসেবে। অধিকাংশ ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকার রাষ্ট্রগুলো যন্ত্র শিল্পে উন্নত। এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ রাষ্ট্রই অর্থনীতিতে অনুন্নত। যন্ত্র-শিল্প, কল-কারখানা যে দেশে যত বেশী সে দেশে 'অজ-পাড়াগাঁ' তত কম গ্রাম বলতে আমরা যা বুঝি তেমন ধরনের গণ্ডগ্রাম ইউরোপে খুঁজলে পাওয়া যাবে না। এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ-আমেরিকায় যন্ত্র-শিল্পের প্রসার তেমন হয় নি বলে এইসব দেশে গণ্ড গ্রামের সংখ্যা বেশী। শহরের সংখ্যা কম। সুতরাং ইউরোপের গ্রামের সঙ্গে ভারতবর্ষের গ্রামের তুলনা করা উচিত হবে না। আমাদের দেশের কোন গ্রামবাসী যদি হঠাৎ বিমান যোগে এসে উপস্থিত হন জার্মানী, ফ্রান্স বা ইংলণ্ডের গামে তাহলে তিনি হকচকিয়ে যেতে বাধ্য হবেন। কারণ গ্রাম বলতে আমরা যা বুঝি তেমনি ধরনের গ্রাম এই সব দেশে একালে আর দেখা যাবে না।

ফ্রান্স, জার্মানী, হল্যাণ্ড বা ইংলণ্ডের গ্রামগুলোও গ্রাম আর আমাদের গ্রামগুলোও গ্রাম। আমাদের কাছে গ্রাম মানে যেখানে আছে কুঁড়েঘর। বৈদ্যুতিক আলো বা পাখা, পাকা রাস্তা, কলের জল, কেউ কল্পনা করতে পারে না। আমাদের গ্রামের চাষীরা আধপেটা খেয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, বিলাসিতা তাদের কাছে স্বপ্ন। ইউরোপের যে কোন গ্রামে গেলে দেখা যাবে কৃষকের বাড়ি ঘর সবই পাকা দালান বা কাঠের মজবুত বাড়ি, ঘরে জ্বলন্ত বৈদ্যুতিক আলো, রেডিও টেলিভিসন, রেফ্রিজারেটার অথবা কাপড় কাচা মেশিন, রাস্তাঘাট পাকা। কৃষক তার কাজ সেরে বাজার করতে গেছে তার নিজের মোটর গাড়ি চালিয়ে। এগুলো

গল্প কথা নয়, সত্য। আমাদের কাছে এখনও স্বপ্ন। একটি গ্রামের উদাহরণ দিচ্ছি।

দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের পেরিগো জেলার একটি গ্রাম ব্রান্তোম। এটি পুরোপুরি গ্রামও নয় আবার শহরও নয়। ব্রান্তোমকে ঘিরে রয়েছে তিনটি ছোট ছোট গ্রাম। ব্রান্তোম-এর লোকসংখ্যা তিন হাজার। অর্ধেক রাস্তাঘাট পাকা; অর্ধেক কাঁচা। এটাকে বলা চলে বর্ধিষ্ণু গ্রাম। দুটো ডাক্তারখানা। ছোটখাট একটি হাসপাতাল, একটি দমকল, পৌর-অফিস, একটি সিনেমাঘর। দ্রোণ নামে একটি নদী বয়ে গেছে গ্রামের মাঝখান দিয়ে। এটিকে নদী না বলে বরং বলব নালা বা খাল। এরা বলে নদী। এখানে রয়েছে পৌরসভা। একটি ঐতিহাসিক গীর্জা। গীর্জা বাড়িতে রয়েছে ছোট্ট একটি মিউজিয়ম এই সংগ্রহশালায় স্থানীয় বাসিন্দারা দিয়েছে নানান উপঢৌকন। এই সংগ্রহশালায় দেখলাম অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় কারুকার্য। কোন এক বাসিন্দা গিয়েছিলেন ভারতে। তিনি অনেক জিনিস সংগ্রহ করে এনেছিলেন ভারতবর্ষ থেকে। সেগুলো এখানে সযত্নে সাজান হয়েছে।

ব্রান্তোমে রয়েছে একটি উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খেলার মাঠ। গ্রীষ্মকালে সাঁতার কাটার জন্যে ছেলে-মেয়েদের জন্যে ব্যবস্থা করা হয় নদীতে নির্দিষ্ট স্থান। সেখানে ভিড় লেগেই আছে। ক্লাব-লাইব্রেরী তো আছেই। তার ওপর গোটা দশেক কাফে-রেস্তোরাঁ রয়েছে। সেগুলো টুরিস্টদের জন্যে। এখানে দেশী-বিদেশী টুরিস্টের আনাগোনা লেগেই আছে। এই অঞ্চলটা ফ্রান্সে বেশ জনপ্রিয়। কারণ আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত উষ্ণ এবং খাবারদাবার-এর প্রাচুর্য আছে বলে টুরিস্টদের এত ভিড়। টুরিস্টদের আনাগোনা থেকেও এদের বেশ আয় হয়। এটাও এক ধরণের বাণিজ্য।

ফ্রান্সে গ্রামে দুর্ভিক্ষ বা অনটন নেই। এদের এখন সমস্যা হল অধিক খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন। কারণ, অধিক উৎপাদন করলে

সেগুলো চাহিদার চেয়ে বেশী হয়। তাই সেগুলো বাজারে বেচা এক সমস্যা। আমাদের হচ্ছে উল্টোটা। আমাদের চাহিদা আছে কিন্তু পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য নেই। সুতরাং ফ্রান্সের গ্রামের সঙ্গে আমদের গ্রামের তুলনা চলে না। গ্রামের কৃষকরা দিনরাত খেটে চলেছে। তারই সঙ্গে তারা বিজ্ঞান-সম্মত সার যেমন ব্যবহার করে তেমনি বীজ। ট্রাক্টর তো এদের নিত্য সঙ্গী। ট্রাক্টর দিয়ে যেমন তারা জমি চষে তেমনি বীজ বপন ও ফসল কাটে। ফলে অল্প লোকে বেশী খাটতে পারে। তাই এদের এত প্রাচুর্য।

ভারতে লোকসংখ্যা পঞ্চাশ কোটি। কিন্তু ভারতে গম উৎপাদন হয় বছরে মাত্র ৯,৮৯০ মিলিয়ন টন। ফ্রান্সের লোকসংখ্যা পাঁচ কোটি কিন্তু ফ্রান্সে গম উৎপাদন হয় বছরে ১০,৮৮২ মিলিয়ন টন। অর্থাৎ আমাদের দেশে লোকসংখ্যার তুলনায় আমাদের খাদ্যোৎপাদন নগণ্য বললেই হয়, সে ক্ষেত্রে ফ্রান্সে লোকসংখ্যার তুলনায় তাদের খাদ্যোৎপাদন অত্যন্ত বেশী। এর থেকেই প্রমাণিত হবে ফ্রান্সের গ্রামের অবস্থা কত উন্নত। এই ব্রান্তোম গ্রামের কথাই ধরা যাক না কেন। এই গ্রামে দেখেছি বিস্তৃত জমিতে চাষ হচ্ছে। একাধারে গম, বীট, ভুট্টা, আঙুর আরও কত কী। এদের গ্রামে অনেক জিনিসের চাষ হয় যা মানুষে খায় না। সেগুলোর গৃহপালিত জন্তুদের দেওয়া হয়। যেমন গোরু, শুয়োর, মেষ, মুর্গী ও হাঁসদের। এদের খাইয়ে মোটা করা হয়। আবার তাদের মাংস খাওয়া হয় তৃপ্তি সহকারে।

ব্রান্তোম গ্রামের মানুষদের কথাই বলি এবার। মঁঃ বস্তিয়ে এ গ্রামের নামজাদা কৃষক। এর জমিতে চাষ হয় গম, ভুট্টা, বীট্, আঙুর ও নানান ধরনের ফলমূল। এর গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে আছে কুড়িটা গোরু, দেড়শো মেষ, বিশটা শূকর, শ' খানেক হাঁস-মুরগি। বস্তিয়ের পরিবারের সংখ্যা সাত। খামারে কর্মচারির সংখ্যা পাঁচ। আছে ট্রাক্টর ও মোটরগাড়ি। এই পারিবারের মাসিক আয় দুই হাজার টাকা। কিন্তু খরচ অনেক। কর্মচারিদের

মাইনে ও খোরাকি। বাড়ি আর পাকা দালান। ঘরে বৈদ্যুতিক আলো, রেডিও, টেলিভিসন, গ্যাসকুকার, ইত্যাদি। এরা খায়-দায় ভাল। কারণ, বাজার থেকে শুধু মাঝে মাঝে কিছু মাংস আর তেল-নুন কিনতে হয়। বাকিটা এরা উৎপাদন করে। সুতরাং ব্যাঙ্কে টাকা জমে। এরা রাত দশটার মধ্যে ঘুমোয়। কিন্তু ওঠে সকাল সাড়ে ছটায়। সাতটায় এরা মাঠে যায় জমি দেখতে। গোরু-বাছুরদের খাওয়ান ইত্যাদি তো আছেই। এরা যে আঙুরের চাষ করে তার থেকে তৈরী হয় মদ। সুতরাং এদের মদ কিনতে হয় না। মঁঃ বাস্তয়ে পরিবারের কাছেই বাস করে এক ধনী পরিবার, তাদের খামারে কাজ করে মঁঃ জিরারদো। সে জমির মালিক নয়, শ্রমিক। এর পরিবারে আছে স্ত্রী ও তিন ছেলে। মাসে মাইনে পায় তিন শো টাকা। রুটি মদ শাক-সব্জী ও ফল তাকে কিনতে হয় না। এগুলো সে পায় তার জমির মালিকের কাছ থেকে। অসুখ করলে তাকে ভাবতে হয় না। কারণ ফরাসী সরকারের সমাজ-বীমা আইনানুযায়ী সে খরচা পেয়ে থাকে চিকিৎসার। এর জন্যে তার প্রভু এবং সে নিজে মাসে কুড়ি টাকা করে জমা দিয়ে থাকে। তার পরিবারের কারুর অসুখ হলে সে প্রায় বিনা খরচে ডাক্তার দেখায়। তার বাড়িতে রয়েছে বৈদ্যুতিক আলো, রেডিও, রান্না করার সরঞ্জাম, রেফ্রিজারেটার ও কাপড় কাচার মেশিন। আর জিরারদোর নিজের রয়েছে একটি ছোট পুরোনো গাড়ি। তাছাড়া সে মোটর সাইকেলও ব্যবহার করে নিয়মিত। পোশাক পরিচ্ছদে সে প্যারিসিয়ানদের মত নয় বটে কিন্তু ভাল খায় দায়।

ফ্রান্সের গ্রামে এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আজকাল ছেলেমেয়েরা আর গ্রামে থাকতে চায় না। তারা একটু সুযোগ সুবিধা পেলেই চলে যায় বড় শহরে। যদিও বড় শহরে তাদের বৈষয়িক অবস্থা ভাল নয় তাহলেও তারা গ্রামে বসে থাকতে চায় না। এখানে হল সমস্যা। সবাই এখন নগরমুখী। এটা একটা রোগ বটে।

পেরিগো

এক ফরাসী বন্ধুর আমন্ত্রণ ঝুলছিল বছর খানেক ধরে। ইস্টারের ছুটিতে পশ্চিম ফ্রান্সের পেরিগো অঞ্চল ঘুরে এলাম। ফ্রান্সের এই মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলটা অন্য জেলাগুলো থেকে পৃথক. এই অঞ্চলকে বলে পেরিগো। এ-অঞ্চলের অধিবাসীদের বলে পেরিগোর্দা। ফরাসী ভাষায় পুং ও স্ত্রী লিঙ্গের ভেদ আছে। তাই পেরিগোর অধিবাসিনীদের বলা হয় পেরিগোরদিন।

কোন ফরাসীকে যদি বলা হয় যে, আমি পেরিগো ঘুরে এলাম, তা হলেই সে ভদ্রলোক বলবেন. ও! আপনি তাহলে খুব ফোয়াগ্রা আর ক্রুফ্ খেয়ে এলেন বলুন। ওই কটি কথা থেকে বোঝা যায় যে, অঞ্চলটি কৃষিপ্রধান।

ফ্রান্স কলকারখানায় উন্নত দেশ। কিন্তু এই অঞ্চলটা, যার নাম পেরিগো, এখানে কলকারখানার নামগন্ধটি পর্যন্ত নেই। কলকারখানা যা আছে তা অতি ছোট ছোট। সে-সব কারখানায় তৈরী হয় জুতো ইত্যাদি। এই পেরিগো অঞ্চলের খ্যাতি তার ফোয়াগ্রা ও ক্রুফ্-এর জন্যেই। ফোয়াগ্রা ও ক্রুফ্ বস্তু দুটি শুধু ফ্রান্সেই পরিচিত নয়. পরিচিত সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা জুড়ে। ফোয়াগ্রা ও ক্রুফ্ বস্তুটি কী তাই বলি। ফোয়াগ্রা হল বড় রাজহাঁসের লিভার বা যকৃতের চর্বি। সেই চর্বি রুটিতে মাখিয়ে মুখে পুরলেই হল। এমন সুস্বাদু খাদ্য কোন ইউরোপীয়ানই অবহেলা করবেন না। এ জিনিসটি সহজপ্রাপ্য নয়, তাই দুর্মূল্য। ফোয়াগ্রা কিভাবে তৈরী হয় জানেন? বড় বড় রাজহাঁসকে এরা খুব করে খাওয়ায়। খেয়ে খেয়ে এদের হয় যকৃতের ব্যারাম। তাতে যকৃতটি বড হতে হতে এমনই হয় যে সে বেচারি প্রাণ হারাবার পর্যায়ে পৌঁছয়। সেই সময়ে তাকে জবাই করে যকৃতটি শুধু বের করে তার চর্বি টিনের

কৌটয় ভর্তি করা হয়। তার পরই সে কৌটো চলে যায় বিশ্বের বাজারে।

এবার ত্রুফ্ বস্তুটি কী বলি। ব্যাঙের ছাতা নিশ্চয়ই দেখেছেন। এগুলো ইউরোপীয়ানরা খায়। খেতে ভালই লাগে। ব্যাঙের ছাতার শ্রেণী বিভাগ অনেক, প্রায় শ খানেক। অবশ্য সবগুলোই খাওয়া চলে না। এর মধ্যেও ভাল মন্দ আছে। ওগুলো সাধারণতঃ তিন কি পাঁচ ইঞ্চির মত বড় হয়। তার রঙও প্রায় একই ধরণের। কিন্তু ত্রুফ্ ব্যাঙের ছাতা গোষ্ঠির মধ্যে হলেও তার আয়তন রঙ ও স্বাদ এক নয়। ত্রুফ্ সাধারণতঃ ব্যাঙের ছাতার মতন গজায় না। এগুলোর রঙ কালো এবং আয়তন খুবই ছোট এগুলোর সন্ধান জানে একমাত্র শুয়োর-এর দল। জঙ্গলে বা নদীর ধারে ঝোপ-ঝাড়ের অন্তরালে সাধারণ্য পুরু মাটির তলায় এগুলো গজায়। এবং একমাত্র শুয়োরের দল তার গন্ধ শুঁকে শুঁকে সেগুলোর সন্ধান বাতলে দেয় সংগ্রহকারীকে তারপর সংগ্রহকারী সেগুলো খুঁড়ে বার করে। এগুলো খেতে সত্যি ভাল কিন্তু দামের কথা তুললেই খাওয়া বন্ধ করতে হয়। কেউ যদি বলে যে, সে রোজই ত্রুফ্ খায়, তাহলে তাকে হয় বলতে হবে পাগল, নয়তো রাজা-উজির মানুষ।

পেরিগো জেলাটার বৈশিষ্ট্য হল ফোয়াগ্রা ও ত্রুফ চাষাবাদের মধ্যে গম, যব, তামাক পাতা, নানান ধরণের ফল, আঙ্গুর, আঙ্গুরের রস থেকে মদ। গাজর, গাজর থেকে চিনি তারপরই আসে গবাদি পশুর কথা। এখানে এত ভেড়ার পাল যে অন্যখানে এত দেখা যায় না। ভেড়ার পাল থেকে এরা সংগ্রহ করে পশম, তাছাড়া মাংস তো রয়েছেই। এ-অঞ্চলে দেখছি এখনও বলদের সাহায্যে চাষ হয়। ঘোড়ার সাহায্যে তো বটেই। তবে অধিকাংশ চাষীই আজকাল ট্রাক্টর চালায়।

সে অঞ্চলে চাষবাসই প্রধান, সেখানকার সমাজও এই ধরণের।

অর্থাৎ এখানকার সমাজ বা দৈনিক জীবনে কলকারখানার প্রভাব অনেকটা কম। কলকারখানা অঞ্চলের সমাজ ও দৈনন্দিন জীবন চলে ভিন্ন ভাবে। সবাই যেন যন্ত্রের তালে চলে। আমি যাদের আতিথ্য গ্রহণ করেছি, তারা প্যারিসের লোক। এই পরিবারটি কয়েকটি কারখানার সঙ্গে যুক্ত। মোটর গাড়ি ও টায়ার কোম্পানীর ডিরেক্টর। এঁরা কারখানা ও যন্ত্রের সঙ্গে থেকে এতই বিরক্ত হয়েছেন যে, এঁরা এই পেরিগো অঞ্চলে জমি-জমা কিনে চাষবাস করছেন অবশ্য সখের চাষ। প্রায় পঞ্চাশ বিঘে জমি রয়েছে এঁদের। খামারে রয়েছে ট্রাক্টর, একপাল গোরু, একপাল ভেড়া, খরগোস, মুরগী ও হাঁস। এঁদের গ্রাম আমাদের গ্রাম নয়। গ্রামের চাষীর বাড়িতে রয়েছে কলকাতা শহরের সব উপকরণ। কলের জল থেকে বিজলি বাতি, মায় সিনেমা। তার ওপর প্রত্যেকটি খামার বাড়িতে একটি করে মোটরগাড়ি। চাষী তার কাজকর্ম সেরে চলল বাজারে বা শহরে মোটরগাড়ি নিয়ে

এ অঞ্চলের আরও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। তাদের মধ্যে একটি হল জল কল অর্থাৎ নদীর জল চালিত চাকা। হল্যাণ্ড বা উত্তর ফ্রান্সে চলে হাওয়ার চাকা। এখানে ছোট ছোট নদীকে আমরা বলব নালা খাল। সেগুলো কেটে উঁচু-নিচু করে জলের স্রোত বইয়ে দিয়েছে। সেই জলের স্রোতের জোরে চলে কাঠের চাকা। কাঠের চাকার ঘূর্ণনে এঁরা চালান তাঁদের ছোট্ট কারখানা। কেউ কেউ উৎপাদন করে বিদ্যুৎ তবে এখন আর বেশী কেউ ব্যবহার করে না জলের চাকা কারণ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি অনেক সস্তায় পাওয়া যায়।

প্রতিটি গ্রামে রয়েছে পৌর-প্রতিষ্ঠান। পৌর-প্রতিষ্ঠানের মেয়র ও সদস্য যাঁরা তাঁদের বাড়িতে ছাদের ওপর ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে একটি বিশেষ ধরণের চারা গাছ। ওই গাছ ছাদের ওপর দেখলেই বুঝতে হবে যে গৃহস্বামী গ্রামের পৌরসভার সদস্য।

এ রীতি আর কোথাও দেখা যায় না ফ্রান্সের জেলায়। আমি যাঁদের বাড়িতে অতিথি, তাঁরা ওই গ্রামের জমিদারগোছের। বাড়ির বড় ছেলে ফিলিপ্‌ আমায় তার মোটরে করে নিয়ে চলল, গ্রামের বিভিন্ন পরিবারের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিল। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আমি ফ্রান্সে গ্রামে। কারণ প্যারিসে সবাই এতই ব্যস্ত থাকে যে, একই বাড়ির বাসিন্দার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় পর্যন্ত হয় না। এখানে সে রকম নয়। গ্রামের প্রতিটি পরিবার একে অপরকে চেনে। শুধু চেনে বললে ভুল বলা হবে। এ তার বাড়িতে হানা দিচ্ছে সময়-অসময়ে। প্যারিসে তা কল্পনা করাও অসম্ভব। শুধু কি তাই। যাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠলেন, তিনি অমনি জমিয়ে দেবেন গাল-গল্প। তার পরই শুরু হবে আদর আপ্যায়ন। অবশ্য খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে। অনেকগুলো খামারবাড়ি ঘোরা গেল। সব পরিবারেই দেখছি বিবাহযোগ্য ছেলেমেয়ের দল। যে-সব চাষী পরিবার একটু অবস্থাপন্ন তাঁরাই পাঠিয়েছেন তাঁদের ছেলে-মেয়েদের হয় বর্দো নয়তো পোয়াতিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে। এদের মধ্যে অনেকে আবার প্যারিসেও গেছে পড়াশোনা করতে। তবে উল্লেখযোগ্য হল মেয়ের দল। প্রতি পরিবারেই এক সমস্যা। মায়েরা বলছে যে, মেয়েগুলোর বিয়ে হলে বাঁচি। অবশ্য ভাল বিয়ে। এবং ওই কারণেই তাঁরা পাঠিয়েছেন প্যারিসে বা বর্দোতে পড়াতে। কারণ ওখানে তারা জুটিয়ে নিতে পারবে সুপ্রতিষ্ঠিত বরের দল। আমার বন্ধুটি বিবাহযোগ্য। পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে। উপরন্তু প্যারিসে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ব্রস্তোম গ্রামের মেয়েদের দলের সঙ্গে বন্ধুবর ফিলিপের বেজায় খাতির। সেই খাতিরে ওই সব পরিবারে আমারই বা খাতির কম নাকি। যখন তখন গেলেই ভাল মন্দটা জোটে। মাঝখান থেকে আমাকে ঘটকালি করতে হল। এ অঞ্চলটায় দেখছি সমাজ ব্যবস্থায় অনেকটা গেঁয়ো ভাব। ছেলে ও মেয়ের পছন্দই শেষ নয়। বাড়ির লোকেরও বেশ হাত রয়েছে। তাদের মতামত

পছন্দ-অপছন্দের প্রভাবও অনেকখানি বিস্তার করে বিবাহের ব্যাপারে। ক্লান্সিন নামে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। মেয়েটির শিশুসুলভ স্বভাব এখনও কাটে নি। মেয়েটিকে পছন্দ করেছে ফিলিপের বাড়ির সবাই। বাদ সেধেছে ফিলিপ। সে বলে, মেয়েটি ভাল, কিন্তু···ইত্যাদি। এ ধরণের সমস্যা গ্রামাঞ্চলে যতখানি শহরে ততটা নয়। সব দেশেই দেখছি প্রায় একই ব্যাপার। কোথাও উনিশ কোথাও বিশ। এই যা তফাত

এই অঞ্চলটায় বিবাহের ব্যাপারে যতখানি সামাজিক-সমস্যা তার চেয়ে অনেক বেশী হল সমাজে শ্রেণী-বিভাগ. কৃষিপ্রধান অঞ্চলে অবস্থাপন্ন চাষী খামারবাড়ির মালিকের সমস্যা কম নয়। কারণ এঁরা চাষী হলে হবে কি, বেশ ধনী। কিন্তু টাকা থাকলেই সমাজে ম.তব্বরি করা যায় না এখানেই হল তাদের সমস্যা। তাই এরা পাঠাচ্ছে এদের ছেলে-মেয়েদের, বিশেষ করে মেয়েদের বড় শহরের বড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে। ওই সব বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে বা বড শহরে থাকার দরুণ এরা গ্রামে এসে একটু সম্মান ও খাতির পায়। তার ফলে এই সব পরিবার জাতে উঠছে। তা সত্ত্বেও দেখছি এই সব পরিবার এখনও বেশ পিছিয়ে আছে। তার ফলে এদের ছেলে মেয়েরা শহুরে বাবুদের কাছে অন্ততঃ মনে মনে নিজেদের নিচু মনে করে সে এক সামাজিক সমস্যা। সে সমস্যা সব দেশেই সমান

ইতিহাসের চোখে পেরিগো অঞ্চল বেশ প্রসিদ্ধ এই অঞ্চলেই ছড়িয়ে রয়েছে অনেকগুলো প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহা। গুহাগুলোর বয়স হাজার দশেক. তাদের মধ্যে অন্যতম হল লাসকো ও ভিলার। লাসকো বিখ্যাত এখানে গুহার অভ্যন্তরে দেখলাম প্রাগৈতিহাসিক চিত্রকলা। গুহাগুলোর আবিষ্কারক হলেন ঐতিহাসিক ধর্মযাজক ব্রই। গুহাগুলো শুধু গুহা নয়, হিমশীতল গুহা। কোনোটার তলা দিয়ে বয়ে গেছে স্রোতস্বিনী, বরফগলা জল

গড়িয়ে বালির সঙ্গে মিশে অনেক শিখরের আবির্ভাব ঘটিয়েছে। গুহাগুলো দেখবার মতন। কত হাজার বছর যে লেগেছে এই প্রাকৃতিক পরিবর্তনে তার নির্দেশ এখনও পুরোপুরি নির্ধারিত হয় নি। এই সব গুহাতেই এককালে বাস করত ক্রোমানিয়ন শ্রেণীর মানব। ক্রোমানিয়ন মানবের কালে ওই অঞ্চলটা ছিল হিমশীতল। এ গেল প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঘটনা।

মধ্যযুগে এখানে কিছুদিন ইংরেজ-রাজের উপনিবেশ ছিল। যে সময়ে গ্যাশকনি অঞ্চল ছিল ইংরেজ রাজত্বের অধানে সে সময়ে এখানে প্রবল প্রভাব ইংরেজদের। তার ছিটেফোঁটার চিহ্ন মিলবে এখনও। তবে সেসব এখন ঐতিহাসিক। মধ্যযুগের আগে এখানে রোমানরাও তাদের উপনিবেশ গড়েছিল। তার ঐতিহাসিক স্মৃতি সব জায়গায়ই বিজড়িত।

আলজাস্

ফ্রান্সের এক-একটি প্রদেশ এক-এক রকমের। আলজাস্ তার এক বিশেষ রূপ। বিশেষ রূপ এই জন্যে যে, আলজাস্ ফ্রান্সের এক প্রদেশ হয়েও যেন সে পৃথক। তার কারণ তার ভাষা ও সংস্কৃতি। এটি জার্মান ভাষাভাষীর প্রদেশ। আলজাস্ নিয়ে জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে বহুবার কুরুক্ষেত্র হয়ে গেছে। গত একশ বছরে আলজাস্ প্রদেশটি শাসিত হয়েছে কয়েক বার জার্মান কর্তৃক, এদের বিরোধ এখনও শেষ হয় নি।

আলজাস্ এর অধিবাসীদের বলা হয় আলজাস্সিয়ান। এরা জাতিতে ফরাসী, কিন্তু ভাষায়, খাদ্যে ও সংস্কৃতিতে জার্মান। এদের অবস্থা ত্রিশঙ্কুর মতন জার্মানরা বলে, আলজাস্সিয়ানরা ভাল জার্মান ভাষা বলতে পারে না। আবার ফরাসীরা অভিযোগ করে, এরা পরিষ্কার করে ফরাসী ভাষা উচ্চারণ করতে পারে না। এরা তাই নিরুপায় হয়ে বলে, এরা আলজাস্সিয়ান রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে এরা কখনও বনে যায় জার্মান, কখনও ফরাসী।

আলজাস্ প্রদেশের বৈশিষ্ট্য হল তার অর্থনীতি ও শিল্প। এটি ধনী প্রদেশ। এর যেমন প্রাচুর্য কৃষিজদ্রব্যে তেমনি খনিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যে। এক কথায় আলজাস্ প্রাচুর্যের প্রদেশ। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সীসা, মলিবডেম, লৌহ, তামা, পটাশ ইত্যাদি স্ত্রাসবুর্গের চার ধারে কলকারখানা আর কলকারখানা। ভারী লৌহশিল্পের কারখানাগুলোও এই আলজাস্ প্রদেশে।

স্ত্রাসবুর্গের এক বন্ধু বলছিলেন যে, জার্মানীর ও ফ্রান্সের সীমারেখায় অনেক চাষী পরিবার আছেন যাঁদের খেত-খামার রয়েছে উভয় সীমানার মধ্যেই। কখনো গিয়ে চাষবাস করে জার্মান সীমানায়, কখনো বা ফরাসী সীমানায়। তার ওপর রয়েছে শুল্ক

ফাঁকি দেওয়ার ব্যবসা। এক দেশের জিনিস নিয়ে বেচছে আর এক সীমানা পেরিয়ে শুল্ক বিভাগকে ফাঁকি দিয়ে। এই সব চোরাই কারবারে যেসব জিনিসের লেনদেন হয় তা হল সিগারেট আর মদ। এই ধরণের ব্যবসা ফ্রান্স ও ইতালীর সীমান্তেও নিয়মিতভাবে চলে।

স্ত্রাসবুর্গের কাছেই সেভের্ন শহর। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে এখনও টিকে আছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বাড়ি-ঘরগুলো দেখতে সত্যি সুন্দর। একটা সুন্দর সপ্তদশ শতাব্দীর বাড়িকে দেখি এরা পুলিসের আস্তানা বানিয়েছে।

এদের এখানে সারস পাখি পোষা এক সখের ব্যাপার। অনেক বাড়ির ছাদের ওপর এদের জন্যে খুপরি তৈরী করে রাখা হয়েছে। স্ত্রাসবুর্গের তো কথাই নেই। সেখানে বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে পুকুরে নালায় তো ছড়াছড়ি।

সেভেন শহরের বাড়ি-ঘরগুলোর ভেতরে গিয়ে দেখি সবই জার্মান ঢঙ এ। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তো কথাই নেই। ফরাসীরা এখানে আছে রাজত্ব করতে, সংস্কৃতিতে নয়। রাস্তায় দেখছি ছেলেমেয়েগুলো কখনো বলছে জার্মান, কখনো ফরাসী। বুড়োগুলো সবই প্রায় জার্মান ভাষায়ই নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চালায়। অবশ্য অল্প-বিস্তর ফরাসীও চলে। তবে সে ফরাসী জার্মানভাষীর মুখে ফরাসী। যেন রাজস্থানীর মুখে বাংলা।

খনিজ ও শিল্পদ্রব্যে ধনী এই প্রদেশটি যেমন তেমনি কৃষিতে। হোর্ড নামে এক গ্রামে গেছি। গ্রামের জনসংখ্যা প্রায় তিন হাজার। খামার-বাড়িতে দেখি চারধারে ভুট্টা আর তামাক-পাতা ঝোলান রয়েছে। গ্রামের বাড়িঘরগুলো সবই কাঠের। বাড়ির দরজাগুলো খুবই ছোট্ট। গ্রামের পথে দেখছি বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো রাস্তায় গড়াগড়ি দিয়ে খেলছে।

আর-একটা গ্রাম ঘোরা গেল। গ্রামটার নাম কোৎজেনহাইম। এক খামার-বাড়িতে উঠেছি। খামারের মালিক পরিশ্রমী। ইনি

২০ হেক্টর জমির মালিক। ২০ হেক্টর জমিতে খাটেন ওরা পাঁচজনে। একটি ট্রাক্টরই কাজ চালায়। যে-পাঁচজন জমিতে খাটে তারা সবাই পরিবারের লোক। কিন্তু খামার-বাড়িটা সত্যি দেখবার মতন। বাড়িটা তো কাঠের। কিন্তু বাড়ির ভেতরে রয়েছে গোটা-বিশেক শুয়োর, গোটা দশেক গোরু আর অসংখ্য হাঁস মুরগী। শস্যের কথা নাই-বা বললাম।

আলজাস্ ছেড়ে যখন প্যারিসের পথে চলেছি তখন দেখি লোরেইন জেলার গ্রামের বাড়িগুলোর সামনে কাঠ জড়ো করে রাখা হয়েছে। কাঠের অন্য কোথাও এ দৃশ্য দেখা যায় না; বরং গ্রামের বাড়ির পেছন দিকে আটচালার তলায় কাঠ জড়ো করে রাখা হয়। লোরেইন-এ তা ভিন্ন। এরা বাড়ির সামনে প্রায় দরজার কাছেই কাঠ, এমন কি খড়-কুটোও জড়ো করে রাখে। অবশ্য এগুলো শীতকালে জ্বালায় ঘর গরম করার জন্যেই।

আলজাস্ প্রদেশের রাজধানী স্ট্রাসবুর্গ। স্ট্রাসবুর্গের হস্তান্তরে হয়েছে আলজাসের পটপরিবর্তন। ষোড়শ শতকে ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর সাম্রাজ্যের অঙ্গরূপে চলে আসে স্ট্রাসবুর্গ। সেই থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত স্ট্রাসবুর্গ সমেত আলজাস্ ছিল ফ্রান্সেরই প্রদেশ। এই সময়ের মধ্যেই ঘটে ফরাসী বিপ্লব ১৭৯০ সালে। ফরাসী বিপ্লবের প্রসিদ্ধ সঙ্গীত যা পরে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে প্রচলিত হয়েছে সেই 'লা মার্সাইয়েস' গানটি রচনা করেছেন মঁ: রুজে দ্য লিল্। মঁ: রুজে দ্য লিল স্ট্রাসবুর্গের অধিবাসী। তাই স্ট্রাসবুর্গের জনগণ এখনও গৌরবান্বিত যে, তাদের এক সন্তান রচনা করেছে ফরাসী জাতীয় সঙ্গীত।

১৮৭০ সালে ঘটে ফ্রাঙ্কো প্রুসিয়ান যুদ্ধ। সে যুদ্ধে প্রুস বা জার্মানরা জেতে: তার ফলে তারা আবার আলজাস্‌কে কেড়ে নেয় ফরাসীদের হাত থেকে, সেই সঙ্গে স্ট্রাসবুর্গ। প্রুসিয়ান-সাম্রাজ্যের অঙ্গরূপে স্ট্রাসবুর্গ অবস্থান করে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত,

অর্থাৎ ১৯১৮। প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজয়ের পর জার্মানী আলজাস্ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। আবার চলে আসে আলজাস্ প্রদেশ ফরাসীদের আয়ত্তে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হল। জার্মানরা ফ্রান্স দখল করল। কেড়ে নিল আলজাস্। ১৯৪০-১৯৪৪ সাল পর্যন্ত আবার আলজাস্ হয়ে রইল জার্মান সাম্রাজ্যের অংশ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থামল। জার্মানরা হারল। আলজাস্ আবার চলে এল ফরাসী সরকারের আয়ত্তে। এমনি ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়েই চলেছে আলজাসের ইতিহাস। আলজাস্ ইতিহাসের প্রধান সাক্ষী হল স্ত্রাসবুর্গ শহরের বড ক্যাথেড্রাল। স্ত্রাসবুর্গের বড় ক্যাথেড্রাল দেখেছে ইতিহাসের উত্থান-পতন। সংবর্ধনা জানিয়েছে বহু নৃপতিকে, মায চতুর্দশ লুই ও নেপোলিয়ন। স্ত্রাসবুর্গ যেমন ভেঙেছে বহুবার তেমনি গড়েছেও। ঠিক অমনিভাবে গঠিত হয়েছে স্ত্রাসবুর্গের ক্যাথেড্রাল। একাদশ শতকে সর্বপ্রথম নির্মিত হলেও, চতুর্দশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ক্যাথেড্রাল বার বার পুনর্নির্মিত হয়েছে।

ছাপাখানার প্রবর্তক গুটেনবার্গ এই স্ত্রাসবুর্গ শহরে বসবাস করেছিলেন অনেককাল, সেটা ছিল পঞ্চদশ শতকে। তারপর জার্মান কবিবর গ্যয়টে। গ্যয়টে স্ত্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। স্ত্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় বেশ খ্যাতনামা। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই মধ্য ইউরোপে সর্বপ্রথম সংস্কৃত-ভাষা চর্চা সুরু হয়। তার জের এখনও চলেছে।

আধুনিক স্ত্রাসবুর্গ এখন ইউরোপের রাজধানী। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউরোপিয়ান এসেম্বলি, ইউরোপিয়ান কোল এ্যাণ্ড স্টীল পুলের কার্যালয় এই স্ত্রাসবুর্গ শহরে। তাই ইউরোপীয় রাজনৈতিক নেতা ও শিল্পপতিরা এখানে অবিরত পায়ের ধুলো দিয়ে স্ত্রাসবুর্গের সম্মান বাড়িয়ে দিচ্ছে। ইউরোপীয় দেশগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সভা-সম্মেলন এখানে রোজই লেগে আছে।

মধ্য ইউরোপের বিখ্যাত রাইন নদী এই স্ত্রাসবুর্গ শহরের মাঝ

দিয়ে বয়ে গেছে। স্ত্রাসবুর্গের বন্দরও বেশ বড় বন্দর। দক্ষিণ ফ্রান্সের মার্সাই বন্দর হতে এমন সোজাসুজি ছোট জাহাজ বা বজরা স্ত্রাসবুর্গ পর্যন্ত অনায়াসে চলে আসতে পারে। তার কারণ এরা নতুন খাল খনন করে রাইন নদীর সঙ্গে রোন নদীর যোগাযোগ করেছে। তার ফলে মার্সাই বন্দরের মাল জাহাজযোগে শুধু স্ত্রাসবুর্গেই আসে না সেগুলো যায় মধ্য ইউরোপেও।

স্ত্রাসবুর্গ শহরের উপকণ্ঠে উঠেছে বিরাট বিরাট নতুন অট্টালিকা। এরা একে বলছে নিউইয়র্ক। উচ্চতায় এক-একটা অট্টালিকা প্রায় বিশ-পঁচিশ তলা। আলজাস-এর রাজধানী স্ত্রাসবুর্গ এখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চলেছে জয়যাত্রার পথে।

মার্শাই থেকে লিয়ঁ

ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে ফ্রান্স যতখানি ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সুবিধা ভোগ করে ঠিক ততখানি সুবিধে ভোগ করে না অন্য দেশগুলো। ভৌগোলিক দৃষ্টিতে দেখা যাবে ফ্রান্সের উত্তরে রয়েছে অতলান্তিক সাগর ও দক্ষিণে ভূমধ্য সাগর। উত্তরে যেমন কনকনে ঠাণ্ডা তেমনি দক্ষিণে ভূমধ্য সাগরের মৃদুমন্দ আবহাওয়া। আবার পূর্বদিকে রয়েছে আল্পস পর্বত। পাহাড়ে অঞ্চলে আবহাওয়া শুকনো ও ঠাণ্ডা।

ফ্রান্সের এই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের জন্যেই এর এক-একটি প্রদেশ এক-এক রকমের। উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের আবহাওয়া যেমন ঠাণ্ডা তেমনি মানুষগুলোর চেহারা তাদের কাজ-কর্মের উদ্যম সম্পূর্ণ ভিন্ন দক্ষিণাঞ্চলের থেকে।

ফ্রান্স আর্থিক সম্পদে উন্নত। ইউরোপের ধনী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু ফ্রান্সের সব প্রদেশ বা জেলাই আর্থিক সম্পদে উন্নত নয়। এটা ভাল করে দেখলাম গত দশ দিন ভ্রমণ করে দক্ষিণ ফ্রান্সের মার্শাই শহর থেকে মধ্য ফ্রান্সের লিয়ঁ শহর পর্যন্ত।

উত্তর ফ্রান্সের নরমন্দি ও পূর্ব ফ্রান্সের আলজাস্ প্রদেশ যেমন কৃষি ও যন্ত্রশিল্পে উন্নত তেমনি উন্নত নয় দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রভসঁ ও তার আশে-পাশের প্রদেশগুলো। উত্তর ফ্রান্সের নরমন্দি ও আলজাস্ প্রদেশের শহরগুলো সত্যিকারের প্রথম শ্রেণীর শহর। লোকগুলোর বেশ-ভূষায় নেই দারিদ্র্য। কিন্তু মার্শাই থেকে আভিনিয় শহর পর্যন্ত সমস্ত জেলাগুলোই যেন পর্তুগাল বা দক্ষিণ ইতালির মতন। মার্শাইয়ের কাছে মার্তিগ নামে সপ্তদশ শতাব্দীর এক পুরোনো শহরে গেছি। সেখানে দেখি জনসাধারণের চেহারা বেশভূষা যেন দরিদ্র ইতালীয় চাষীর মতন। মার্তিগ শহরে পাওয়া যাবে ইতালীয় ও

স্পেনীয় সংস্কৃতির ছাপ। সেখানকার কথ্যভাষা প্রভসাল, ফরাসী নয়। আর তারা যখন ফরাসী বলে তাও ভিন্ন সুরে।

মার্শাই থেকে আভিনিয় পর্যন্ত জেলাগুলো এমন কি শহরগুলোও এক রকমের। বাড়ি-ঘরদোর খুব উঁচুও নয় আবার বড়ও নয়। নিম্, জঁ দুগার, লুনেল শহরে ঘুরে দেখেছি, দেখে মনে হল যেন আমি ফ্রান্সে নেই। প্যারিসের আশে-পাশে দুশ কিলোমিটারের মধ্যে অমন শহর দেখা যাবে না। এই দুই প্রদেশের সঙ্গে যে পার্থক্য তা হল দারিদ্র্য। প্রভস্ প্রদেশে যেমন নেই যন্ত্রশিল্প তেমনি চাষাবাদও অনুন্নত। চাষাবাদের অন্তরায় হল জল।

একদিন সেভেন্ পাহাড় থেকে আভিনিয় শহরের পথে যাচ্ছি, দেখি একটি গ্রামে বলদ সাহায্যে চাষ হচ্ছে। ফ্রান্সে অবশ্য ঘোড়ার সাহায্যে চাষ হয় দেখেছি কিন্তু বলদ সাহায্যে চাষ এই প্রথম দেখলাম। দক্ষিণ ফ্রান্সে যে অঞ্চলগুলো জল সেচের অভাবে অনাবাদী হয়ে আছে, তার উন্নতির জন্যে মদারার্গ নামে জেলায় দেখলাম বিরাট খাল নির্মাণ হচ্ছে। শুধু খালই নয়। এই অঞ্চলগুলো নদীপৃষ্ঠ হতে অনেক ওপরে। সেখানে শুধু খাল কেটে নিচে থেকে জল তো ওপরে তোলা যায় না। তাই উচ্চ অঞ্চলে যেমন খাল কাটা হচ্ছে তেমনি নিচু অঞ্চলেও। এরই মাঝামাঝি অঞ্চল হল মদারার্গ। এইখানে ফরাসী সরকার বিরাটকায় পাম্পিং স্টেশন তৈরী করেছে। রোন নদীর জল পাম্প করে একশ গজ ওপরে উঁচু অঞ্চলের খালে জল ঢালার ব্যবস্থা করেছে। তার ফলে নিম ও প্রভসঁ অঞ্চলে যাবে চাষের জন্য জল। এই যে বিরাটকায় জল পাম্প করার স্টেশন তৈরী হচ্ছে এটা শুধু ফরাসী সরকারই করছেন না। ওই অঞ্চলের বণিক সমিতি ও চাষীরা মিলে আর্থিক সাহায্য করেছেন। এই বিরাট কাজ সম্পূর্ণ হলে দক্ষিণ ফ্রান্সে হবে ও ধরণের চাষাবাদ।

প্রভসঁ প্রদেশ অনুন্নত বলে এখানে অনেক যৌথখামার গড়ে

উঠছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই এই অঞ্চলে যৌথখামার-এর আবির্ভাব হয়েছে। এমনি একটি যৌথখামার দেখলাম এ্যাস্‌বায় গ্রামে। যৌথখামারের কর্মকর্তা বললেন যে, যৌথখামার গড়তে তাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল প্রথমে। প্রথম প্রথম দু'চারজন চাষী ছাড়া কেউই এগিয়ে আসে নি। কিন্তু এখন চাষীরাই দলে দলে আসছে তাদের জমি বিলি করতে। কারণ যৌথ খামারে তারা যে অংশ জমি দান করে তার থেকে অনেক বেশী লাভবান হয় আর্থিক দিক থেকে। কেনাবেচার হাঙ্গামা তাদের পোহাতে হয় না মোটেই। তার দায়িত্ব নেয় যৌথখামার। এই ভাবে ওই অঞ্চলে যৌথখামার-এর সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমস্ত প্রভেন্স ও দক্ষিণ ফ্রান্স ছিল এককালে রোমসাম্রাজ্যের অধীনে। তাই আজ দেখা যাবে সেখানে রোম-সংস্কৃতির স্মৃতিচিহ্ন। এখনও দেখা যাবে রোমান এরেনা, এম্পিথিয়েটার ও ধ্বংসাবশেষ। উত্তর ফ্রান্সের সঙ্গে এখানে আর একটি পার্থক্য, সেটা হল স্পেনের মতন ষাঁড়ে মানুষে লড়াই।

রোম-সাম্রাজ্যের এখানে এতই আধিপত্য ছিল যে, আভিনিয় ছিল সে যুগে ইউরোপের ভ্যাটিকান। রোমান ক্যাথলিকদের বড় আড্ডা যেমন ছিল আভিনিয় তেমনি সে-যুগের রোমান ক্যাথলিকদের ছিল তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্র। ভ্যাটিক্যান আভিনিয় শহরকে শত্রু আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে নির্মিত হয় শহরের চার পাশে উঁচু দেওয়াল। আভিনিয় শহরে পোপের প্রাসাদ এখনও অটুটভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রেম ও বিবাহ সম্বন্ধে ফরাসী মহিলাদের জনমত

প্রেম ও বিবাহ-কথা কোন দেশেই নতুন নয়, নতুন নয় তেমনি সমস্যাটাও। সব দেশেই রয়েছে এই চিরন্তন সমস্যা। কোথাও বেশী কোথাও বা কম; কিন্তু এক এক দেশে প্রেম ও বিবাহ নিয়ে জনমতের পার্থক্য দেখা দেয়, বিশেষ করে মহিলাদের বেলায়। প্রেম ও বিবাহ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন ও তার উত্তর সংগ্রহ করেছেন ফরাসী মহিলাদের কাছ থেকে ফরাসী জনমত পরিষদ। তাঁদের প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা গেল যে, তাঁরা প্রায় কয়েক সহস্র ফরাসী মহিলার মতামত সংগ্রহ করেছেন। তার মধ্যে একশত মহিলার, যাদের বয়স ১৪ থেকে ৫০ বছর, তাদের তিন থেকে চার ঘণ্টা করে প্রশ্ন করে এমন অনেক তথ্য বার করেছেন ওই প্রতিষ্ঠান যা সত্যি উল্লেখযোগ্য।

ফরাসী জনমত পরিষদ বলছেন যে, তাঁদের অনুসন্ধান থেকে এটা জানা গেছে যে, ফ্রান্সে দশটি মেয়ের মধ্যে ন'জনই বিয়ে করে ত্রিশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে এবং স্বামী পছন্দ করার সময় স্বামীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের জোর দেয়। শুধু মাত্র শতকরা পাঁচজন চায় তাদের স্বামীরা যেন উচ্চপদস্থ হন। ফরাসী মেয়েরা কি ধরণের স্বামী বা স্বামীর কোন্ ধরণের গুণ পছন্দ করে তার একটা তালিকা দেওয়া গেল।

শতকরা ৫৫ জন ফরাসী মেয়ে মনে করে যে, তাদের স্বামী হবার উপযুক্ত পাত্রের গুণ হবে চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব। শতকরা ৩৯ জন মেয়ে মনে করে তাদের স্বামীদের প্রধান গুণ হবে স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও দেখতে শুনতে ভাল। শতকরা ৬ জন মেয়ে মনে করে যে, তাদের স্বামীদের প্রধান গুণ হবে যে, তারা যেন শুধু তাদেরই ভালবাসে। শতকরা ৫ জন মেয়ে মনে করে যে, তাদের স্বামীরা হবে ভাল রোজগেরে, উচ্চপদস্থ ও সমাজের উঁচুতলার জীব। শতকরা ৩ জন

মনে করে যে, তাদের স্বামীরা তাদের জয় করে নেবে। শতকরা ২ জন মনে করে যে, তাদের স্বামীরা হবে সুরুচিপূর্ণ। শতকরা ৮ জন মনে করে যে, তাদের স্বামীদের সব রকমের গুণ থাকবে।

এদেশে বিয়ে বেশি যেমন হয় তেমনি ভাঙেও। তবে এখানে বিয়ে ভাঙাটা অপরাধ বা দোষণীয় নয়। বরং বিবাহ না ভেঙে অশান্তির মধ্যে দিন যাপন করাটাই এখানে অপরাধ। বিবাহ ও বিবাহ-ভঙ্গ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পরিষদ বলেছেন যে, ফ্রান্সে আশী লক্ষ মেয়ের মধ্যে পঁয়ষট্টি লক্ষ মেয়েই বিবাহিত। বাকি পনর লক্ষ মেয়েদের মধ্যে দু লক্ষ ত্রিশ হাজার বিবাহ ভেঙেছে অর্থাৎ ডিভোর্স, দু'লক্ষ ত্রিশ হাজার বিধবা, সাত লক্ষ ষাট হাজার মেয়ে অবিবাহিত এবং যাদের বয়স একুশ থেকে চব্বিশ বছর; পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার অবিবাহিত—যাদের বয়স পঁচিশ থেকে চৌত্রিশ, চার লক্ষ অবিবাহিতের বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ।

ফরাসী জনমত পরিষদ বলেছেন যে, ফ্রান্সে দশটি বিবাহিতা মহিলার মধ্যে একজন হল ডিভোর্স অর্থাৎ বিবাহ ভেঙেছেন এবং তাঁদের বয়স সাধারণত: পঁচিশ থেকে চৌত্রিশের মধ্যে। ডিভোর্স-এর কারণ বলতে গিয়ে বলেছেন যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অসদ্ভাব, মাতলামি, নৃশংসতা—কখনো স্বামীর তরফ থেকে, কখনো সমগ্র পরিবারের কাছ থেকে, চরিত্রহীনতা, অলস বা জুয়াখোর এবং শেষ কারণটি হল পারিবারিক নোংরা পরিবেশে সন্তানদের অনিষ্ট হতে পারে, এই সবই হল ডিভোর্সের কারণ।

ডিভোর্সের আগে এরা বিবাহ করে, বিবাহের আগে করে প্রেম। প্রেম করলে বা প্রেমে পড়লেই বিয়ে হয় না, প্রেমের সময়ে চলে বাছাবাছি। এমন অনেক দেখা গেছে যে, একটি মেয়ে হয়তো সাতটা ছেলের সঙ্গে প্রেম করেছে বলে বিয়ে করেছে একজনকেই, সাতজনের সঙ্গে প্রেম করেছে বলে মেয়েটা তো আর সাতজনকেই বিয়ে করতে পারে না? প্রেম করার আগে এরা চোদ্দ থেকে

ষোলবছর বয়সেই অনেক ছেলের সঙ্গে পরিচিত হয়। ওটা প্রেম নয় শুধু পরিচয়।

ফরাসী জনমত-পরিষদ তাদের উত্তরদাতাদের প্রশ্ন করেছেন যে, আপনারা যখন তরুণী ছিলেন তখন যদি আপনাদের পিতা-মাতা জীবনের প্রশ্ন নিয়ে সাবধান করতেন বা উপদেশ দিতেন তাহলে কি সেটা ভাল হত? তার উত্তরে শতকরা ৭৮ জন বলেছে যে, হ্যাঁ, তাহলে ভাল হত, ১৬জন বলেছে যে, না তার কোন প্রয়োজন নেই। ছ'জন কোন উত্তরই দেয় নি।

আগেই বলেছি যে, এখানে চোদ্দ থেকে ষোলবছরের মেয়েরা তাদের ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে হয় পরিচিত ও তারপর তারা বেড়াতে বেরোয়। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে বিভিন্ন বয়েসের মহিলারা যা উত্তর দিয়েছেন তার তালিকা দেওয়া গেল উপরন্তু তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কত বছর বয়সে সাধারণতঃ একটি মেয়ে তার ছেলে-বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারে। তার উত্তরে এই পাওয়া গেছে :—

শতকরা ৫জন মহিলা বলেছে যে, ১৪ থেকে ১৭ বছরের মেয়ে তার ছেলে-বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে পারে। শতকরা ৩৯জন বলেছে ১৬ থেকে ১৮ বছরের হলে ভাল হয়. শতকরা ৩৫জন বলেছে ১৯ থেকে ২০ বছরের হলে ভাল, শতকরা ৭জন ২১ বছরের পক্ষে, শতকরা ১০জন বলেছে যে, মেয়েরা যেন কেবলমাত্র তাদের ভাবী স্বামীদের সঙ্গেই একা বেরোয় শতকরা ৪ জন কোন উত্তরই দেয় নি।

কিন্তু সবচেয়ে মজার হল এই যে, এই সব মহিলাদের মধ্যে যাদের বয়স ২১ থেকে ২৫ তাদের শতকরা ৫০ জনই বলেছে যে, ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সেই মেয়েদের তাদের ছেলে বন্ধুর সঙ্গে বেড়ান ভাল। এবং এরা বেশী বয়সে ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াবার বিপক্ষে। আর যে-সব মহিলাদের বয়স ২৫ থেকে

২৯-এর মধ্যে তাদের শতকরা ৪৩ জন ১৬ থেকে ১৮ বছরের ও ৩১ জন ১৯ থেকে ২০ বছরের মেয়েদের ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াবার পক্ষে। কিন্তু যাদের বয়স চল্লিশের ওপরে এবং পঞ্চাশের মধ্যে, তাদের মধ্যে শতকরা ২ জন মাত্র ১৪ থেকে ১৫ বছরের মেয়েরা ছেলে-বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াবার পক্ষে, শতকরা ২৭ জন শুধু ১৬—১৮ বছরের মেয়ের বেড়াবার পক্ষে, তবে শতকরা ৪০ জন ১৯ থেকে ২০ বছরের মেয়েদের একলা বেড়াবার অনুমতি দিতে রাজী। আর এদের মধ্যে শতকরা ২০ জন কেবলমাত্র ভাবী স্বামীদের সঙ্গে বেড়াতে পরামর্শ দেয়, অন্যদের সঙ্গে নয়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের যতই বয়স বাড়ে, ততই তাঁরা হন সংরক্ষণশীলা। তাঁরা অল্প বয়সের মেয়েদের স্বাধীনতার বিপক্ষে। কিন্তু অল্প বয়সের মহিলারা, অল্প বয়সের মেয়েদের স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত।

প্রেম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ফরাসী জনমত-পরিষদ বলেছেন যে, তাঁরা সবাইকে প্রশ্ন করেন—সত্যিকারের গাঢ় প্রেম কি সম্ভব? তার উত্তরে ৪৪ জন মহিলা বলেছে যে, তা সম্ভব। শতকরা ৩৩ জন মহিলা বলেছে, 'হয়ত সম্ভব'; শতকরা ১৬ জন মহিলা বলেছে যে, না, তা সম্ভব নয়, শতকরা ৭ জন কোন উত্তর দেয় নি। প্রশ্নকর্তারা নাছোড়বান্দা, তাঁরা আবার প্রশ্ন করেছেন যে, "অটুট প্রেম যদি সম্ভব হয়, তাহলে আপনি কি অটুট প্রেম সত্যি ভোগ করেছেন?" তার উত্তরে শতকরা ২৯ জন মহিলা বলেছেন, "হ্যাঁ।"

উপরের প্রশ্ন সম্পর্কে অবিবাহিতা কুমারীদের মধ্যে যাঁদের বয়স পঁচিশের নিচে, তাঁদের মধ্যে শতকরা ৬১ জন অটুট প্রেমে বিশ্বাসী, শতকরা ২৯ জন বলেছে হয়ত সম্ভব, শতকরা ৭ জন বলেছে, না। কিন্তু এই সব অবিবাহিতা কুমারীদের মধ্যে যাঁদের বয়স পঁয়ত্রিশের ওপরে, তাঁরা কিন্তু শতকরা ৩৮ জন অটুট প্রেমে বিশ্বাসী, শতকরা ৩৪ জন বলেছে, 'হয়ত সম্ভব' এবং শতকরা ২৩

জন বলেছে, না, সম্ভব নয়। কিন্তু বিবাহিতা মহিলাদের মধ্যে যাঁদের বয়স পঁয়ত্রিশ বছরের নিচে, তাঁদের মধ্যে শতকরা ৪৭ জন অটুট প্রেমে বিশ্বাস রাখে, শতকরা ৩৩ জন বলে, 'হয়ত সম্ভব' আর শতকরা ১৬ জন বলেছে যে, তা সম্ভব নয়। আর যাদের বয়স পঁয়ত্রিশের ওপর, তাদের মধ্যে শতকরা ৩৮ জন অটুট প্রেমে বিশ্বাসী, শতকরা ৩৩ জন বলে. 'হয়তো সম্ভব', শতকরা ২১ জন বলছে, সম্ভব নয়। প্রেমটা মনের ব্যাপার, সুতরাং মনের এই বিচিত্র গতি উপলব্ধি করা সোজা নয়, বিশেষ করে মেয়েদের বেলায়। তা ফরাসীই হোক আর বাঙালীই হোক—সবাই একই প্রায়।

ফ্রাঙ্কোর রাজধানী মাদ্রিদ

সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণে ইউরোপকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা চলে। জাতি ভাষা সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণে একটি অপরটি হতে বেশ ভিন্ন। যেমন এ্যাংলো স্যাক্‌শন দল, জার্মানির দল, স্লাভগোষ্ঠি ও ল্যাতিন দল। ল্যাতিন দলকে দু ভাগে বিভক্ত করা উচিত। কারণ, ইতালি ফ্রান্সে একটা দল আর একটা স্বতন্ত্র দল স্পেনের। স্পেন ল্যাতিন দলের মধ্যে পড়লেও তার স্বাতন্ত্র্য সে বজায় রেখে চলেছে।

এ্যাংলো স্যাকশন দলেরা এককালে পৃথিবীর অর্ধেক দখল করেছিল। তাদেরই সৃষ্টি উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান সমাজ। তাছাড়া এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত সমাজে ছড়িয়ে আছে আফ্রিকায়। যেমন দক্ষিণ-আফ্রিকায় রোডেশিয়া। এই দলের সঙ্গে পৌঁছয় ফরাসী দল। তাদের চিহ্ন এখনও দেখা যাবে কানাডার মধ্যে আমেরিকায়। এই দুই দলের উপনিবেশবাদের কথা আমি ছেড়েই দিলাম। সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে স্পেনের দৌরাত্ম্য কম ছিল না। একালের দক্ষিণ আমেরিকায় ছোট বড়

রাষ্ট্রগুলো তাদেরই উপনিবেশ ছিল। দক্ষিণ মধ্য আমেরিকায় এখনও চলেছে স্প্যানিশ সংস্কৃতির দিগ্‌বিজয়। রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে ব্যবহৃত সরকারি চারটে ভাষার মধ্যে স্প্যানিশ অন্যতম।

স্পেনের বর্তমান হাল খুব আশাপ্রদ নয়। কিন্তু দক্ষিণ ও মধ্য আফ্রিকার মতো তিনশ বছরের ইতিহাস সে স্পেনেরই ইতিহাস। একালের দুর্বল স্পেনকে একেবারে অবহেলা করা চলে না। একশ বছর আগেও ইউরোপের ইতিহাসে ছিল স্পেনের জ্বলন্ত স্বাক্ষর। একালের স্পেন যেন বনেদি জমিদারবাড়ির পড়ে যাওয়া চেহারা। দুর্বল স্পেনের এখনও রয়েছে আফ্রিকায় উপনিবেশ। যদিও তার দেশের লোক কাজের অভাবে বেকারের দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে কাজের সন্ধানে গৃহ ত্যাগ করে চলে যায় ফ্রান্সে, জার্মানীতে আর ইংলণ্ডে। প্রায় পনর লাখ স্প্যানিশ শ্রমিক চাকরী করছে এই তিন দেশে। এর থেকেই বোঝা যাবে একালের স্পেনের হাল।

এককালে পূর্ব ইউরোপে চলে তুর্কীদের উপনিবেশবাদ। আর পশ্চিম ইউরোপে চলে আরবদের। ষোড়শ হতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝখান পর্যন্ত তুর্কীরা রাশিয়া হতে হাঙ্গারি চেকোশ্লোভাকিয়া পর্যন্ত রাজত্ব চালিয়েছিল। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে আরব আর মুররা গোটা স্পেনই দখল করে রাজত্ব চালায়। তারাই আবার দক্ষিণ পশ্চিম ফ্রান্সের কয়েকটা জেলাও দখল করে।

পূর্ব-ইউরোপে এখনও তুর্কীদের স্মৃতিচিহ্ন দেখা যাবে। তাদের খানাপিনায় রয়েছে তুর্কীদের ছাপ। কোপ্তা কাবাব তুর্কীদেরই দান। তেমনি আরব-সংস্কৃতির দান এখনও দেখা যাবে স্পেনে। গ্রানাডার মসজিদ আর তার স্থাপত্য আরব-সংস্কৃতিরই ছাপ। রবদের খানাপিনার প্রভাব এখনও রয়েছে স্পেনে। পোলাও-এর স্পেনীয় সংস্করণ পায়েলা। স্পেনের জনসাধারণের মধ্যেও রয়েছে আরবী ছাপ। তিনশ বছরের আরব রাজত্বে রক্তের সংমিশ্রণও

হয়েছে প্রচুর। তার ছাপ দেখা যাবে তাদের চেহারায়। তাদের মেজাজে।

আরবী মেজাজের সঙ্গে স্প্যানিশ মেজাজের বেশ মিল আছে। রেগে গেলে চণ্ডাল মূর্তি। ঝগড়াঝাঁটি হলে বা প্রেম সংক্রান্ত ব্যাপারে এরা ছুরি চালাতে কসুর করে না। স্প্যানিশরা ইউরোপীয় হলেও এখানেই তাদের সঙ্গে অন্য ইউরোপীয়দের তফাৎ। এরা একটু বেশী আবেগি। সম্ভবত ভৌগোলিক প্রভাবের জন্যেই হয়েছে। উত্তর আফ্রিকার আরব রাষ্ট্রগুলোর মতনই লাল মাটি, সবুজ গাছপালার অভাব, অভাব জলের। প্রকৃতির রুক্ষ মনোভাবের জন্যেই স্পেনের ও স্প্যানিশদের সাদৃশ্য মেলে উত্তর আফ্রিকার সঙ্গে। ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বলেই আজ দলে দলে ইউরোপীয় টুরিস্টরা স্পেন ছেয়ে ফেলেছে। সেখানে তারা যায় রোদ পোহাতে, ছুটি কাটাতে। স্পেন অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো থেকে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও কৃষিপ্রধান রাষ্ট্র বলেই খাবারদাবারের দাম সস্তা। তাই বিদেশী টুরিস্টদের স্পেন আকর্ষণও এর অন্যতম কারণ। বিদেশী টুরিস্টদের কাছ থেকে একালের স্প্যানিশ সরকার দুহাতে টাকা লুটছে। অন্যান্য ব্যবসা বাণিজ্যের মতন টুরিস্ট ব্যবসাও ফেঁপে উঠেছে সেখানে।

স্প্যানিশদের ষাঁড়ের লড়াই স্প্যানিশ চরিত্রের একটি দিক বলতে হয়। ষাঁড়ের লড়াই স্প্যানিশদের জাতীয় ক্রীড়া তো বটেই 'হবি'ও বটে। স্পেনের ছোট বড় শহরে ষাঁড়ের লড়াইএর স্টেডিয়াম রয়েছে ছড়ান। তবে মাদ্রিদ, বার্সেলোনা আর কর্দোবায় রয়েছে কটি বিখ্যাত স্টেডিয়াম। টিকিট কেটে হাজার হাজার দর্শকের ভিড় নতুন কিছু নয়। কিন্তু আগস্ট মাসে প্রতি বছরে হয় মাদ্রিদে দেমোক্রাটিক ষাঁড়ের লড়াই। এক স্টেডিয়াম থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় একদল ষাঁড়েদের। তারা রাস্তা পরিক্রমা করে যদি পৌঁছতে পারে স্টেডিয়ামে তাহলে সেখানে হয় আবার

বহু খেলোয়াড়দের সঙ্গে লড়াই। তবে রাস্তায় পোষে ষাড়েরা রাখে কাতারে কাতারে জনতা। জনতার মাঝ দিয়ে যাবার সময় বীরপুঙ্গবরা ষাঁড়ের শিং ধরে লড়াই সুরু করে দেয়। ফলে অনেক অর্বাচীন ওখানেই ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় হাসপাতালে আশ্রয় নেয়। কেউ নেয় চিরকালের জন্যে বিশ্রাম।

ষাঁড়ের লড়াইএ যারা খ্যাতনামা যোদ্ধা তাদের প্রায় সবাই জিপসী সম্প্রদায়ের। নাম করা 'মাতাদর', 'পিকাদর' সবাই জিপসী সম্প্রদায়ের বলে তারা বেশ কুসংস্কারাচ্ছন্ন। নানান রকম তুকতাকে বিশ্বাসী।

অনেক বিদেশী টুরিস্ট বলেছে যে স্পেনের একমাত্র পরিচয় হওয়া উচিত ষাঁড়ের লড়াইএর দেশ বলে। এককালে স্পেনের দাপটে সমগ্র ইউরোপ তটস্থ ছিল। উত্তর ইউরোপের অনেকখানি অংশ তারা দখল করে রাজত্ব চালায় আর গোটা আমেরিকাটাই ছিল তার কব্জার মধ্যে। সেই প্রভাবশালী স্পেন এখন বদলে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হতে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত স্পেন চলত অন্যদের হুকুমে। তাই দেখা দেয় অরাজকতা। অরাজকতা ও গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ফ্রাঙ্কোর ফাসিস্ত সরকার। ত্রিশ বছরেরও বেশী ফ্রাঙ্কো চালিয়ে যাচ্ছে স্পেনে ফাসিস্ত সরকার তবে যতদিন ফ্রাঙ্কো বেঁচে থাকবে ততদিন তার ফাসিস্ত সরকার ও একনায়কত্ব কেউ ঘোচাতে পারবে না কিন্তু ফ্রাঙ্কো মারা গেলে সেখানে দেখা দেবে নতুন রাজনৈতিক আন্দোলন যার দানা বাঁধা সুরু হয়েছে গত কয়েক বছর ধরে। সেখানে চলেছে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অসন্তোষ বিক্ষোভ দেখা দেয় ছাত্রমহলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক অধ্যাপক ও ছাত্রগণ ফ্রাঙ্কোর জেলে পচছে।

ফ্রাঙ্কোর ফাসিস্ত দলেও তেমনি অসন্তোষ। সবাই চায় মুক্ত ও স্বাধীন নির্বাচন। কিন্তু ফ্রাঙ্কো তা চায় না। সে চায় স্পেনে চলে একনায়কত্ব। স্পেনের রাজতন্ত্র শেষ গৃহযুদ্ধের সঙ্গেই। কিন্তু

ফ্রাঙ্কো তার দলের মধ্যেও একজন ডিকটেটর খুঁজে পায় নি বলেই সে চায় এখন রাজতন্ত্রের আবির্ভাব। ডিক্টেটরের জায়গায় বসবে হয়ত একদিন সিংহাসন হতে বিতাড়িত সম্রাট। স্পেনের সিংহাসন দাবী করেছে তিন জন হবু রাজকুমার, হুয়ান কার্লোস, বুর্ব রাজকুমার ও সালাফোঁস। ফ্রাঙ্কো নির্বাচন করেছে এক বুড়ো রাজকুমারকে। ফ্রাঙ্কো যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন হয়ত চলবে তার মর্জিমতন শাসন ব্যবস্থা কিন্তু তার মৃত্যুর পরে যে কী ঘটবে তা কেউ হলপ করে বলতে পারে না। তবে অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতারা মনে করে যে সেখানে দেখা দেবে নতুন আন্দোলন। প্রতিষ্ঠিত হবে নতুন শাসন ব্যবস্থা।

স্পেনে চলেছে ইউরোপীয় রাজনীতিতে অনেক রাজনৈতিক খেলা। ফ্রাঙ্কোর ফাসিস্ত সরকার চালু আছে বলেই স্পেনকে ইউরোপীয় সামরিক জোট 'নেটো'তে নেওয়া হয় নি। তেমনি নেওয়া হয় নি কমন মার্কেটে। কিন্তু আমেরিকানরা স্পেনে বসিয়েছে সামরিক ছাউনি। ফ্রান্স তোয়াজ করছে স্পেনকে তার বাণিজ্যের সহযোগী হবার জন্যে। পশ্চিম জার্মানী স্পেনকে দিচ্ছে আর্থিক সাহায্য যাতে সে তার দলে আসে। পশ্চিম ইউরোপের সব কটি বড় রাষ্ট্র আজ স্পেনকে তোয়াজ করছে তাকে দলে টানবার জন্যে। স্পেনের সঙ্গে বৃটেনের লেগেছে সম্মুখ লড়াই। জিব্রালটা ছিল এককালে স্পেনের উপদ্বীপ। অনেক শত বছর জিব্রালটাতে বৃটেন বসিয়ে রাখায় তার উপনিবেশ ও সামরিক ছাউনি। স্পেন দাবী করেছে জিব্রালটার। বৃটেন জিব্রালটার না ছাড়লে সেখানে স্প্যানিশ কামানের শব্দ গর্জে উঠবে বলে জানিয়েছে স্প্যানিশ সরকার। সম্ভবত একটা রফা হবে দুই দেশের মধ্যে এই নিয়ে।